বিশেষ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৪১৮



# সন্দেশ

সম্পাদক
সন্দীপ রায়

বিশেষ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা

তৃতীয় পর্যায় বর্ষ ৫১

মে-আগস্ট—২০১১ বৈশাখ-- শ্রাবণ ১৪১৮

**সন্দেশ-৫০**

মন্দ্রিত মন-দেশ স্পন্দিত সন্দেশ/
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৩
সন্দেশ ও শিশু সাহিত্য / নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫
হাফ সেঞ্চুরি / দীপ মুখোপাধ্যায় ৬
সন্দেশ পত্রিকা এবং আমি/ মহাশ্বেতা দেবী ৭
আমার লেখা ছাপা হত না/ প্রচেত গুপ্ত ৮
সন্দেশের সেরা সম্পদ নলিনীদি/ রাহুল মজুমদার ১০
যখন গ্রাহক ছিলাম/ দেবাশীষ দেব ৪৪
পাঁচ দশকের পাঁচালি/ জীবন সর্দার ৪৬
সবার চেয়ে আলাদা/দেবাশিস সেন ৪৯
আমার স্মৃতিতে 'সন্দেশ' ও সত্যজিৎ /
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৫৪

**ধারাবাহিক উপন্যাস**

বুরুন্ডির সবুজ মানুষ / হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত ৬২

**প্রবন্ধ /রম্যরচনা**

'তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ' / শুভদীপ অধিকারী ১৩
লীলাদির একখানি অপ্রকাশিত চিঠি ১৮
অনেকটা পথ পেরিয়ে / অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯
আলোক যাত্রা/ কেতকী গোস্বামী(বাগচী) ২০
রঙমহলের রাজা / নীতিশ মুখোপাধ্যায় ৫৫
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সরণি/আশীষ লাহিড়ী ৭৪
লুপ্ত পাখিদের কথা / ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪

**গল্প**

সুন্দরবনের আতঙ্ক / অসিত দলপতি ২৪
কেন যুদ্ধ চাই না / রমেন গাঙ্গুলী ২৮
যে ছেলেটি উড়তে চেয়েছিল/
শিবানী রায়চৌধুরী ২৯
পাখিদের খোঁজা /মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪
তিন দৈত্য ও এক দয়ালু মানুষ/
অরুণ চট্টোপাধ্যায় ৩৫
নামের খেলার কারসাজি/অনন্যা দাশ ৪০
দুই নৌকোর গল্প/অরুণিমা রায় চৌধুরী ৫৯
টেররিস্টের ডাইরি/দীপঙ্কর বিশ্বাস ৭৮

নির্জন দ্বীপের রহস্য/অনিন্দ্য অধিকারী ৮৮

## ছড়া/কবিতা

মেঘাবরোধ / সমীরণ বিশ্বাস ২৭
বাড়ি বিপাক/ অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
ভূতের বাসা / ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় ২৭
সজনে ফুলের আলপনা / কনক ঠাকুর ২৭
জয়-ধোনি / অমিতাভ চৌধুরি ৩৩
/ অপূর্ব দত্ত ৩৩
বাউল কবি /সুদীপ আচার্য ৫৮
বাড়ি থেকে / সোমনাথ ভট্টাচার্য ৫৮
লজ্জা/রজতশুভ্র মজুমদার ৭৭
রাত দুপুরে /দেবাশিস্ বসু ৭৭
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা/ শৈলশেখর মিত্র ৭৭
**নববর্ষের চিঠি** ৪

---

**ছবি এঁকেছেন**

সত্যজিৎ রায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, রাহুল মজুমদার, সুদীপ্ত দত্ত, সৌকর্য্য ঘোষাল

**প্রচ্ছদ**

সত্যজিৎ রায়

**সম্পাদক**

সন্দীপ রায়

**সহ-সম্পাদক**

প্রণব মুখোপাধ্যায়

**২০টাকা**

---

সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কোলকাতা ৭০০ ০২৯, থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
কালী প্রিন্টার্স এন্ড বাইন্ডার্স ১০৯বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত
**স্বত্বাধিকারী - সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড**
ফোন : ২৪৬৬ ৪৯১৯

# মন্দ্রিত মন-দেশ
# স্পন্দিত সন্দেশ

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

আয় ছুটে ভাইবোন ভুলে গিয়ে র‍্যাট-রেস
হাতছানি দেয় জানি সন্দেশ...সন্দেশ।
উল্লাসে ফুল হাসে, কুল ভাসে চিত্তে
প্রতি প্রাণে গতি আনে কে শিশুসাহিত্যে?
রাশি রাশি খুশি-হাসি কবিতা ও গল্পে
অন্তরে-মন্তরে শুভ সংকল্পে।
দোস্তিতে মোস্তিতে স্বস্তিতে মন-দেশ
সন্দেশ...সন্দেশ...সন্দেশ...সন্দেশ
হাসি আঁকা...খুশিমাখা...পত্রিকা...সন্দেশ।

আয় ছুটে ভাইবোন সাহিত্যবাসরে
বাজিমাত করি 'হাত পাকাবার আসর'-এ।
হাতে খড়ি লিখি-পড়ি চিত্র-বিচিত্র
হুল্লোড়ে দুললো-রে কতশত মিত্র।
হিল্লোলে দিল দোলে খিল খোলে সুখেতে
আলো-আশা ভালোবাসা বাঁধে বাসা বুকেতে।
নন্দিত...ছন্দিত...যন্ত্রিত...মন -দেশ
সন্দেশ...সন্দেশ...পঞ্চাশে...সন্দেশ
হাসি আঁকা...খুশি মাখা...পত্রিকা...সন্দেশ।

আয় ছুটে ভাইবোন আগামীর আশ্বাস
সুন্দর পরিবেশে যারা নিতে চাস্ শ্বাস।
স্বপ্নের দেশে হেসে মেশে কলা-কৃষ্টি
জীবনের ব্রতে-স্রোতে সৃষ্টির বৃষ্টি।
খুশি-রব কুশীলব সন্দেশী সৈনিক
স্বপ্ন দেখাস তোরা সবাইকে দৈনিক।
তৃপ্তিতে...দৃপ্তিতে...দীপ্তিতে মন-দেশ
সন্দেশ...সন্দেশ...সন্দেশ...সন্দেশ
হাসি আঁকা...খুশিমাখা...পত্রিকা...সন্দেশ।

# নববর্ষের চিঠি

আবার একটা বাংলা নববর্ষ এসে গেল। সন্দেশ পঞ্চাশ পূর্ণ করে একান্ন বছরে পা দিল। তাই আমরা সন্দেশ নিয়ে কিছু বিশেষ লেখা প্রকাশ করছি। গত পঞ্চাশ বছরের নানা স্মৃতিচারণা আর কি! তোমরা তো আর সন্দেশের চলার পথের সব পুরনো কথা জানো না। তাই পুরনো মানুষজনের কথায় সেগুলো জানতে পারবে। কেমন লাগে জানিও। সঙ্গে রইল গল্প, কবিতাও। তোমরা 'হাত পাকাবার আসর'-এ লেখা, আঁকা পাঠাও। আর যারা সতেরো বছর পেরিয়ে গেছ, তারা সাধারণ বিভাগের জন্য লেখা পাঠাও।

সন্দেশের পুরনোরাও একদিন নতুন লেখক ছিল। তোমরা যারা লেখালেখি কর, তারা তৈরি করো নিজেদের। সন্দেশ তোমাদের পাশে আছে। নতুন বছরে এইটাই হোক আমাদের নতুন উদ্দীপনা।

শুভেচ্ছা জানাই।

ইতি

সঃ সঃ

# সন্দেশ ও শিশুসাহিত্য

## নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমার ছেলেবেলা ছিল শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগ। ছোটদের পত্রিকার কতরকম বৈচিত্র্য। মৌচাক, রামধনু, পাঠশালা, মাসপয়লা ইত্যাদি। সন্দেশের সুনাম শুনলেও পত্রিকাটি হাতে পাইনি। ৬১-তে সন্দেশ যখন নতুন করে বেরোল সুভাষদা ও মানিকদার সম্পাদনায় সে এক বিরাট বিস্ময়। এক স্বতন্ত্র স্বাদের চমৎকার পত্রিকা। এর প্রায় বছর পনের পর যখন আমি মাসিক আনন্দমেলার সম্পাদনা শুরু করি তখন আমার রোল মডেল ছিল ৬১-র সেই নতুন সন্দেশ।

সেই সন্দেশের সত্যজিতের পাপাঙ্গুল আমার দারুণ লেগেছিল। কী নিপুন ছন্দজ্ঞান ভদ্রলোকের! নন্‌সেন্স রাইমের এত সুন্দর ভাষান্তর যে করা যায় তা ভাবতেই পারিনি। আমার একটাই আক্ষেপ পরবর্তী সময়ে মানিকদা ছড়া চর্চায় আর সেভাবে সময় দিলেন না। তবে 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটি যেভাবে উনি ছড়া দিয়ে গড়েছেন তা সত্যিই অনবদ্য। সন্দেশে মানিকদার 'অনাথবাবুর ভয়' পড়ে আমার একটা অদ্ভুত গা ছম্ ছম্ অনুভূতি তৈরি হয়েছিল। ওই সময়ে আমার বাড়ির একতলার একটা ঘরে লেখালেখি করতাম কিন্তু শুতে যেতে হ'ত দো-তলায়। গল্পটা পড়ার পর বেশ কিছুদিন রাত্রে একতলা থেকে দোতলায় যেতে আমার খুবই ভয় করত। পরে একবার ফোনে মানিকদাকে আমার এই অনুভূতির কথা জানিয়েছিলাম।

সন্দেশেই প্রথম পড়লাম 'ফেলুদা' ও 'শঙ্কু'। দুটো চরিত্রই আমার ভালো লাগে। তবে শঙ্কু এমনিতেই আমার প্রিয় চরিত্র। সন্দেশের মাধ্যমে যে সব প্রতিভাবান সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন যেমন গৌরী ধর্মপাল, অজেয় রায়, শিশিরকুমার মজুমদার—এদের প্রত্যেকের লেখাই আমার যথেষ্ট ভালো লেগেছিল। অজেয় রায় আনন্দমেলায় 'ভূতো' বলে একটা চমৎকার ভূতের গল্প লিখেছিল।

নতুন পর্যায়ের সন্দেশে পুরানো সন্দেশের ধাঁধাগুলো মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত। সেগুলো ছিল আমার খুবই আকর্ষণীয়-- যেমন একটার প্রথম দুই পংক্তি ছিল --

'হারুবাবু কাজ নিয়ে গেছেন জাপান
টাকাকড়ি এনে দেন যখন যা পান...'

অন্য প্রতিযোগিতাগুলিও খুব বুদ্ধি খাটিয়ে করা হত। সেই ধাঁধার কিছু কিছু সন্দেশে পুনরায় প্রকাশ ঘটলে বেশ ভালোই হবে এবং ব্যাপারটা আকর্ষণীয় হবে।

সন্দেশে আমার প্রথম প্রকাশিত ছড়া 'সাদা বাঘ'। ছড়াটির সঙ্গে মানিকদা একটা মজার ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবিটি পরে 'সাদা বাঘ' যখন বই হয়ে প্রকাশিত হল তখন টাইটেল পেজে ছাপা হয়। পরবর্তী কালে নিয়মিত সন্দেশে লিখেছি। কখনও বা 'মুস্তাক আলি' বা সেই দুই ভাই 'কার্তিক-গণেশ' বা লীলাদির ৯০-বছর পূর্তিতে।

মানিকদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই অন্তরঙ্গ। সেই সুবাদে আমার অনেক আবদারও সস্নেহে পূরণ করেছেন। 'শঙ্কু', 'ফেলুদা' বৃত্তের বাইরে এসে উনি 'ফটিকচাঁদ' নামে একটি অন্য স্বাদের লেখা লিখেছেন আমার তাগাদায়। ওই গল্পে হারুণ বানানে উনি 'ন' লিখেছিলেন, কিন্তু আমি ওঁকে বলেছিলাম 'ণ' হবে। এব্যাপারে মতবিরোধ হয় ওঁর সঙ্গে আমার। শেষমেষ আমার সিদ্ধান্তই বহাল থাকে--ওটা 'ণ' করে দিলাম আমি। এরপর ওঁর দুটো ইংরাজিতে লেখা ছোট গল্পের অনুবাদ আমিই করি।

সন্দেশের ৫০-বছরে রইল আমার অফুরন্ত শুভেচ্ছা। সন্দেশ সম্পাদনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বাঙালী শ্রেষ্ঠ মণীষীরা। চাই সন্দেশ নিয়মিত সুন্দর অবয়বে প্রকাশিত হোক। একটা ছোট্ট ইচ্ছা—ছাপার ভুল না থাকলেই উত্তম।

*(অনুলিখন : সুগত রায়)*

# হাফ সেঞ্চুরি

দীপ মুখোপাধ্যায়

রামধনু রঙে সজীব চেতনা আলোময় মেঘমালারা
কীটপতঙ্গ লতাপাতা পাখি ঝলমলে গাছপালারা
সুকুমার রায় সত্যজিতের নির্মল স্মৃতিচিহ্ন
বাজার চলতি পত্রিকা থেকে এক্কেবারেই ভিন্ন।

এই পত্রিকা মনে জাগিয়েছে খেয়ালরসের অঙ্কুর
এখানে পেয়েছি ফেলুদার খোঁজ আর প্রোফেসর শঙ্কুর
আনন্দময় ননসেন্স লেখা বড় বিদ্‌ঘুটে কাজ যে
সন্দেশী হয়ে নাক গলিয়েছি এই আজগুবি রাজ্যে।

রেখায় লেখায় অভিনবত্ব এনেছে চেহারাটিকে রে
ভাসিয়েছিল যে ফল্গুধারায় লীলাদিকে নিনিদিকে রে
কখনও হয়েছি প্রকৃতি পড়ুয়া লুটোপুটি ধূলিকণাতে
হাত পাকাবার আসরে মেতেছি গল্পে ও আলোচনাতে।

শিশু-কিশোরের কল্পনাগুলো এগিয়েছে দ্রুতগতিতে
সেরকমই আছে এই সন্দেশ যেরকম ছিল অতীতে
খেয়ালখুশির সেই ধারা থেকে অ্যাত্তোটুকুও নড়েনি
পঞ্চাশ হবে কিন্তু এখনও বয়সের ছাপ পড়েনি।

# সন্দেশ পত্রিকা এবং আমি

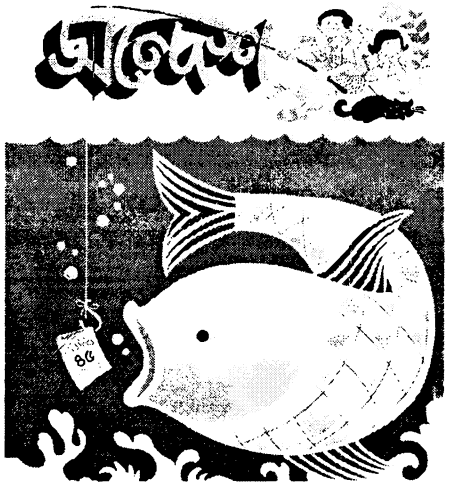


মহাশ্বেতা দেবী

'সন্দেশ'-এর আড্ডা নিয়ে লিখতে বলেছ। 'সন্দেশ' কাগজের প্রথম দিকের পাঠক আমি। রাক্ষুসে পাঠের খিদে ছিল আমার আট বছর বয়স থেকে সেদিন অবধি। সেই আমিই একদিন লেখক হলাম। লেখেন যাঁরা, তাঁদের লেখকই বলি। মেয়েরা লিখলে 'লেখিকা', ছেলেরা লিখলে 'লেখক' বলি না।

সে একদিন ছিল, যখন সাহিত্যপত্রিকা ঘিরে আড্ডা হোত, তাই সত্যজিৎ রায়ের ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় আমি 'সন্দেশ' কাগজে লিখেছি। এই পত্রিকা ঘিরে লেখকরা আড্ডা দিতেন কি না জানি না। আমি জানি না, অন্যদের কথা বলতে পারব না।

আমি জন্মাই ১৯২৬-এর জানুয়ারিতে। আর আমার ছোটবেলাতেই 'সন্দেশ' পড়েছি। আমার বাবা ঁমনীশ ঘটক আমার বই পড়ার রাক্ষুসে খিদে দেখে তাঁর বিচার মতো বইপত্র কিনে দিতেন।

ছোটবেলায় 'সন্দেশ'-এ যা পড়েছি, তার মধ্যে 'বনের খবর' খুবই ভালো লাগত। 'সন্দেশ'-এর লেখক হয়ে তবে জানলাম প্রমদারঞ্জন রায় লীলা মজুমদারের বাবা। মনে হচ্ছে এই পর্বের 'সন্দেশ'-এ লীলা মজুমদারও সম্ভবত যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তবে তা ভুল হতে পারে। বয়স ৮৬ চলছে, ভুল হয়ে যায়।

না, আড্ডা আমি দিইনি, কারা দিতেন তা-ও জানি না। তবে লিখেছিলাম, আর 'ন্যাদোশ' লিখে যথেষ্ট তারিফ পেয়েছিলাম। সেটাও মনে পড়ে।

'সন্দেশ' এখনও খুব প্রিয় কাগজ। পেলেই পড়ি। তবে লেখালেখি নিয়ে আড্ডা তো কোনওদিন দিইনি। যা যখন লিখেছি তা মনের তাগিদে।

# আমার লেখা ছাপা হত না

প্রচেত গুপ্ত

আমরা ছুটছি। ছুটছি দুজনে পাগলের মতো।

বন্ধুরা 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' সিনেমার রাজার ঢঙে চিৎকার করে বলছে 'অ্যাই, তোদের কি? ছুটিস ক্যানে?'

আমরা উত্তর দিচ্ছি না। আমরা ছুটছি। কেউ এগিয়ে এসে জাপটে ধরতে চাইছে। কেউ বাড়িয়ে দিচ্ছে পা, যাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। আমরা এঁকেবেঁকে ফসকে যাচ্ছি, পিছলে যাচ্ছি। থমকালে চলবে না। উত্তর দেওয়ার সময় নেই। দম ফেললেই বিপদ। দুজনেই চাইছি জিততে।

ছুটছি আমি আর আমার ভাই পুষ্কর। ছুটছি পড়িমরি করে। আমাদের পিঠে স্কুলের ব্যাগ। সাদা জামায় কালি, কালো হাফ প্যান্টে ধুলো। যত্ন করে গোঁজা জামা কখন গেছে খুলে। পায়ের জুতো থেকে ফিতে ঝুলছে। সেদিকে তাকানোর সময় কই? তাকাচ্ছিও না। আমাদের স্কুল থেকে বাড়ি হাঁটা পথে এগারো মিনিট। ছোটা পথে ছয় থেকে সাড়ে ছয়। তখন পাড়ায় অনেক মাঠ ছিল। একতলা বাড়ি ছিল অনেক। তাদের ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগান। রাস্তাই যে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল এমনটা নয়। মাঠ দিয়ে কোণাকুনি দৌড় দেওয়া যেত। পাঁচিল টপকালে তো কথাই নেই। আরও শটকার্ট। পুষ্করের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিতে গিয়ে কখনও আমি মাঠ দিয়ে কোণাকুনি দৌড়েছি, কখনও সে পাঁচিল টপকেছে।

আমরা ছুটছি কেন? ছুটছি আগে বাড়ি পৌঁছতে। যে আগে পৌঁছবে সেই পাবে সন্দেশের দখল।

আমরা যেহেতু সন্দেশের গ্রাহক ছিলাম পত্রিকা আসত দুপুরের ডাকে। তখন আমরা স্কুলে। কখনও আবার স্কুল যাবার মুখে দেখে যেতাম পিওনবাবু গুটিগুটি ঢুকছেন। মোটামুটি তারিখটা হিসেবের মধ্যেই থাকত। বাড়িতে ছোটদের প্রায় সব রকম পত্রিকা আসত। মাঝখানের ঘরে বেঁটে আলমারি ছিল। আলমারিতে তালার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু চাবি গিয়েছিল হারিয়ে। ফলে যে কেউ যখন তখন আলমারি ঘাঁটতে পারত। দুটো তাকে পত্রিকারা থাকত গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে। এদের মধ্যে সন্দেশ ছিল একটা পাগল পাগল ব্যাপার। নইলে আমরা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার জন্য পাগলের মতো দৌড়াব কেন। আমার ভাইয়ের মাথার জোর ছিল বেশি ও স্বাস্থ্যে আমার তুলনায় ছিল কমজোরী। ফলে ফিনিশিং-এ এসে আমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জামায় টান মেরে কসুইয়ে গুঁতো মেরে জিতে যেতাম। এখন মনে হয় দৌড়ে আগে যে বাড়ি যাবে সেই প্রথম সন্দেশ পড়বার সুযোগ পাবে এই শরীর প্রধান নিয়ম চালু করার পরিকল্পনা আমারই ছিল। এর বদলে যদি পাঁচটা অঙ্ক কষা দশটা ট্রান্সলেশন করার কম্পিটিশন চালু হত তাহলে আর আমার কোনওদিনই আগে সন্দেশ পড়ার সুযোগ হত না।

সন্দেশ ব্যাগে নিয়ে সত্যজিৎ রায় থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র , লীলা মজুমদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ে মহাশ্বেতা দেবী, নলিনী দাশ, অজেয় রায়, অজয় হোম, গৌরী ধর্মপাল, শিশিরকুমার মজুমদার, জীবন সর্দার, মঞ্জিল সেন শেষ করতাম হুড়মুড়িয়ে।

তখন একটা পত্রিকা এক এক রকম কায়দায় পড়তে হত। কোনওটা উপুড় হয়ে পড়ে আরাম, কোনওটা পাশ ফিরে, কোনওটা আবার বালিশে হেলান দিয়ে, আধশোওয়া অবস্থায় পড়তে হত। যে পত্রিকা উপুড় হয়ে পড়ার নিয়ম সেটা যদি পিঠ সোজা করে পড়া হয় তাহলে পুরো জমবে না। আজকাল এই নিয়ম মানা হয় না, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগে আমরা এসব খুব মানতাম। সন্দেশ ছিল চিৎ হয়ে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে পড়ার পত্রিকা। পড়ার সময় নিজেকে একটা 'কেউকেটা মনে হত'। সবই গিলতাম গোগ্রাসে, গোলমাল হত ধাঁধার পাতায় এসে। পড়তাম অথৈ জলে। কিছুতেই আর উত্তর খুঁজে পাইনা। মাথা চুলকে, নাক খিমচে কপাল টিপেও লাভ হত না। তখন একমাত্র পুষ্করই ছিল ভরসা। যদিও দৌড়ের সময়ে নিয়ম কানুন ভাঙার কারণে সে আমার সঙ্গে কথা দিয়েছে বন্ধ করে। তাহলে ধাঁধার কী হবে?

বুড়ো, কিন্তু বুড়ো নয়
বয়সে সমান হয়
কিন্তু সবে বৃদ্ধ কয়
জানও তার পরিচয়।

গায়ের জোরে দৌড়ে জেতা যায় না। বাধ্য হয়ে পুষ্করের

গায়ের জোরে দৌড়ে জেতা যায় না। বাধ্য হয়ে পুষ্করের শরণাপন্ন হতাম। কথা দিতাম পরের সন্দেশ নিয়ে দৌড়ো-দৌড়ির কম্পিটিশন স্টপ। বুদ্ধিমান ছেলেরা সাধারণত বোকা হয়। সে আমার কথা বিশ্বাস করে ঝটপট ধাঁধা সলভ্ করতে বসত। পরের মাসে আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আবার স্কুল ছুটির পর দৌড় দিতাম। পুষ্করও দৌড়ত। সন্দেশই দৌড় করাত। বন্ধুরা আবার চিৎকার করে উঠত—অ্যাই, তোদের হল কী? ছুটিস ক্যানে?

আগেই আমাদের বইয়ের আলমারির কথা বলেছি। তালা ছিল, চাবি ছিল না। সবাই বই নেড়ে চেড়ে দেখতে পারত। তবে আমরা যে কাউকে অ্যালাও করতাম না। শুধু বন্ধুরাই সুযোগ পেত। দেদার সন্দেশ চুরি হত। আমাদের প্রাণের বন্ধুরাই চুরি করত। জামার তলায় নিয়ে যেত। দু-মাসে যখন একটা করে সন্দেশ বেরোত তখন সাইজ ছিল ডবল। আমার এক বন্ধু ছিল তন্ময়। এখন পুলিশে আছে। একদিন গরমের ছুটিতে গায়ে চাদর দিয়ে হাজির হয়েছে। বাবা কাকাদের নস্যি রঙের চাদর। ছেলেমানুষরা এই ধরণের চাদর গায়ে দিলে কান ধরে থাপ্পড় দিতে ইচ্ছে হয়।

'আমরা বললাম, 'কিরে, গায়ে চাদর দিয়েছিস কেন?'

তন্ময় গম্ভীর মুখে বলল, 'জ্বর হয়েছে।'

কপালে হাত দিয়ে দেখলাম গা ঠাণ্ডা। অবাক হয়ে বললাম, 'জ্বর কই? গা তো বরফ?'

তন্ময় আরও গম্ভীর মুখে বলল, 'তাহলে বোধহয় জ্বর আসবে।'

'যখন আসবে তখন গায়ে চাদর দিবি।'

তন্ময় গেল রেগে। বলল, 'মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না। অতবড় সন্দেশটা কোথায় লুকিয়ে নোব। জামার তলায় ঢুকবে? কথা যখন বলছিস ভেবে চিন্তে বলবি তো?'

এরপরই আমরা সব সন্দেশ বাঁধিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাবা পরাণ বলে একজনকে ডেকে আনল। সে ছিল ওস্তাদ বই বাঁধিয়ে। ধপাধপ্ সন্দেশ বাঁধিয়ে দিল। ছ'মাস ধরে এক একটা বই। বাবা স্পাইনে তারিখ লিখে দিল। আমরা খুব খুশি। অত মোটা বই কে চুরি করবে? সব সন্দেশ চিরকাল আমাদের থাকবে।

খুবই দুঃখের কথা, এর পরেও সন্দেশ চুরি অব্যাহত ছিল। আমার প্রাণের বন্ধুরা চাদরের বদলে ব্যাগ নিয়ে আসত। আমরা দুঃখ করলে মা বলত, 'যাক, সন্দেশের মত পত্রিকা পড়ে বলেই তো ওরা তোমাদের প্রাণের বন্ধু। এটা নিয়ে অত দুঃখ করার কি আছে?'

শেষ করব সন্দেশ বিষয়ে একটা সুখ স্মৃতি দিয়ে। আমাদের ছেলেবেলায় সন্দেশ পত্রিকার 'হাত পাকাবার আসর'টি ছিল মারকাটারি। আমার ধারণা জগৎ বিখ্যাত। গ্রাহকরাও লেখার সুযোগ পেত। সুন্দর সুন্দর সব লেখা, ছবি ছাপা হত। ছেলেমেয়েদের নাম ছাপা হত, বয়েস ছাপা হত। আমার যে কি লোভ আর হিংসে হত কী বলব। নিশ্চিত ছিলাম এরা একদিন সব বড় বড় লেখক হবে। এদের বই ছাপা হবে। হাত পাকাবার আসরের লেখকরা সব কুঁড়ির মতো। ফুল ফুটবেই ফুটবে। আমি ঠিক করলাম আমার লেখাও ছাপা হবে। লিখলাম এবং লেখা পাঠাতে শুরু করলাম। প্রথমে বাবাকে দিয়ে পাঠাতাম। আমার বাবার আবার ঘন ঘন কলেজ স্ট্রিট যাবার অভ্যেস ছিল। বাবাকে বললাম, 'তুমি কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে নিউ স্ক্রিপ্ট-এ সন্দেশের কাউন্টারে দিয়ে আসবে।'

বাবা এসে বলত, 'দিয়ে এসেছি।'

লেখা কিন্তু ছাপা হত না। আমার সন্দেহ হল—বাবা ভুলে যায় না তো? মনে হয় ফেলে দেয়। তাই আমি পোস্টে লেখা পাঠানো শুরু করলাম। তাও লেখা ছাপা হয় না। আবার পাঠালাম, আরও পাঠালাম! ছাপা হল না। এক সময় হাল ছেড়ে দিলাম। বুঝলাম, আর যাই হোক সন্দেশের হাত পাকাবার আসরে আমার লেখা ছাপা হচ্ছে না, সুতরাং আমার লেখক হওয়া হবে না।

কী আর করা যাবে, সবাই তো লেখক হতে পারে না।

এসব তোমরা বিশ্বাস করতে পার আবার নাও করতে পার। তোমাদের যা-খুশি। তবে ঘটনা সত্যি। যেমন তেমন সত্যি নয় চমৎকার সত্যি। চমৎকার সত্যির নিয়মই হল এক ধরণের মায়া তৈরি করে। আমার বেলাতেও করেছে। সন্দেশ পত্রিকা ফিরিয়ে দিচ্ছে আমার হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছু। চমৎকার ছোটবেলা, চমৎকার বন্ধুদের আর আমার চমৎকার ভাইকে। বড় মায়া তৈরি হচ্ছে। বেশির ভাগ চমৎকার জিনিসই তাই। বিশ্বাস করা যায় না। তবু মায়া তৈরি হয়। তখন মানুষ বারবার জিজ্ঞেস করে—সত্যি সত্যি এরকম ছিল?

আমিও তাই করছি। একটা পত্রিকা এর বেশি কী করতে পারে?

# সন্দেশের সেরা সম্পাদ নলিনী দাশ

রাহুল মজুমদার

২৬শে মার্চ ১৯৯৩। শেষ বেলায় উঠল প্রলয়ংকর ঝড়। সেই ঝড়ে উপড়ে গেল ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর সবথেকে নির্ভরযোগ্য বটগাছটা। 'সন্দেশ' সম্পাদক নলিনী দাশ, ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলেন। আক্ষরিক অর্থে ইন্দ্রপতন ঘটল সন্দেশ পত্রিকায়।

নলিনীদির সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৭৮ সালের বইমেলায় সন্দেশের স্টলে। মুহূর্তে কাউকে আপন করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। এক সন্ধ্যায় সন্দেশী হয়ে গেলাম তাঁর সিগ্ধ স্নেহময় ব্যবহারে এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি উনি একজন এত নামী মানী মানুষ। একফোঁটা অহঙ্কার ছিল না তাঁর। আট্টি (থুড়ি, এক) থেকে আশি সকলের সমবয়সী বন্ধু ছিলেন তিনি।

একজন পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব যে শুধুমাত্র পত্রিকার লেখা সম্পাদনায় সীমাবদ্ধ থাকে না, সেটা নলিনীদিকে দেখে শিখতে হয়। পরবর্তীকালে অনেক দিন সন্দেশ সম্পাদনা আর প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তখন তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। পত্রিকার প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ সম্পাদক আমি আর কোথাও দেখিনি। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে শুতে যাবার সময় পর্যন্ত তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে থাকত 'সন্দেশ'। শুধুমাত্র সম্পাদনাই নয়, সন্দেশের প্রশাসনিক দিকটাও সামলাতেন তিনি।

লেখা জমা পড়লে, সেটাকে নথিভুক্ত করার পর সব লেখা প্রথম পড়তেন নলিনীদি। উনি দেখতেন লেখাটা সন্দেশের আদর্শ আর মানের উপযুক্ত কিনা। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর সেই লেখাগুলো বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে পাঠিয়ে দিতেন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ সন্দেশীর কাছে। তাঁরা মন্তব্য আর প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখে ফেরৎ পাঠাতেন নলিনীদির কাছে। এরপর উনি বাছাই করা লেখাগুলো পাঠিয়ে দিতেন লীলাদির কাছে। লীলাদি মূলতঃ বিচার করতেন লেখার রস। দ্বিতীয় বাছাইয়ের পর লেখাগুলো আবার আসত নলিনীদির কাছে। এবার ভরতদা বা অশোকের হাত দিয়ে সেগুলো চলে যেত নলিনীদির ভাষায় বড় সম্পাদক অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের কাছে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য। তিনি মান, রস ছাড়াও দেখতেন লেখার কারিগরি বা টেকনিক্যাল দিকটাও। এতগুলো ছাঁকনির ভিতর দিয়ে ছেঁকে বেরিয়ে আসা লেখাগুলোর গুণগত মান সম্পর্কে কারও আর কোনও সন্দেহ থাকত না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাথমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নলিনীদিকে সাহায্য করতেন প্রণব মুখোপাধ্যায়, জীবন সর্দার প্রমুখ বিদগ্ধজনেরা।

চূড়ান্ত মনোনয়নের পর লেখাগুলো বিভিন্ন শিল্পীর কাছে অলঙ্করণের জন্য পাঠানো বা ফোটোগ্রাফ যোগাড় করা, তারপর তাগাদা দিয়ে ছবিগুলো আদায় করা (কে না জানে শিল্পীরা ভারি খেয়ালি আর আল্‌সে হয়), সেই ছবিগুলো চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সত্যজিৎ রায়ের কাছে পাঠানো, অমনোনীত ছবি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী নতুন করে আঁকানো, এরপর পত্রিকার লে-আউট করানো (এটা সত্যজিৎ রায়ের হাত দিয়ে পাস হ'ত), কাগজ কিনে প্রেসে পাঠানো, পত্রিকা ছাপার পর ডাকযোগে গ্রাহক এবং দূরের

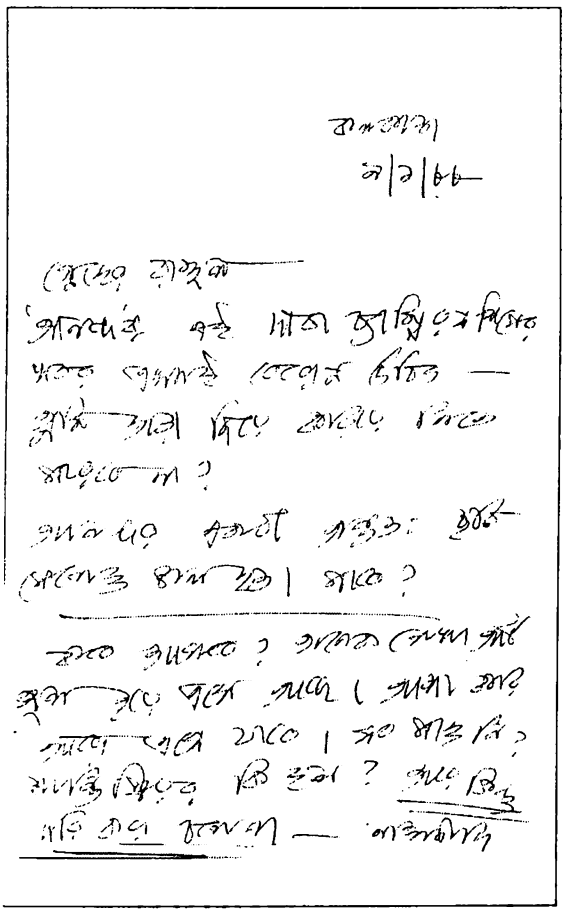

এজেন্টদের কাছে বই পাঠানো, স্থানীয় এজেন্টদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া সবই করতেন নলিনীদি, একরকম একা হাতেই। এর মধ্যই তিনি সামলাতেন বিজ্ঞাপন সংগ্রহকদের, হাত পাকাবার আসরের লেখা ছবি নির্বাচন, ধাঁধা তৈরি বা নির্বাচন, চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া (হাতে কলমে এবং পত্রিকার কলমেও) আরও অনেক হাঙ্গামা। নিয়মিত হাজিরা দিতেন 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'-এর সভায় [illegible] লেখাপাঠের আসরে। এ ছাড়া দিনভর নানান মানুষের (গ্রাহক, পাঠক, অপাঠক সব) সঙ্গে সহাস্যে সকৌতুকে আলাপ করা তো আছেই। তাঁর কাছে আসার কোনও নির্দিষ্ট সময় বাঁধা ছিল না। যে কেউ, যে কোনও সময়ে, যে কোনও বিষয় নিয়ে বা বিষয় ছাড়াই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারত। তাঁর বাড়িতেই সন্দেশের অফিস ছিল, সেখানে আসা যে কোনও মানুষই ছিল তাঁর কাছে 'সন্দেশী', অতএব আপনজন। স্নেহ ছিল তাঁর মজ্জাগত। এই স্নেহ বর্ষিত হত অকাতরে। অথচ তাঁর ব্যক্তিত্ব তাতে একটুও ক্ষুন্ন হত না। একেবারে ছোটরা এই সম্পাদিকাকে মনে করত তাদের প্রিয়তম বন্ধু। অন্যরা তাঁর প্রতি অনুভব করত শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা।

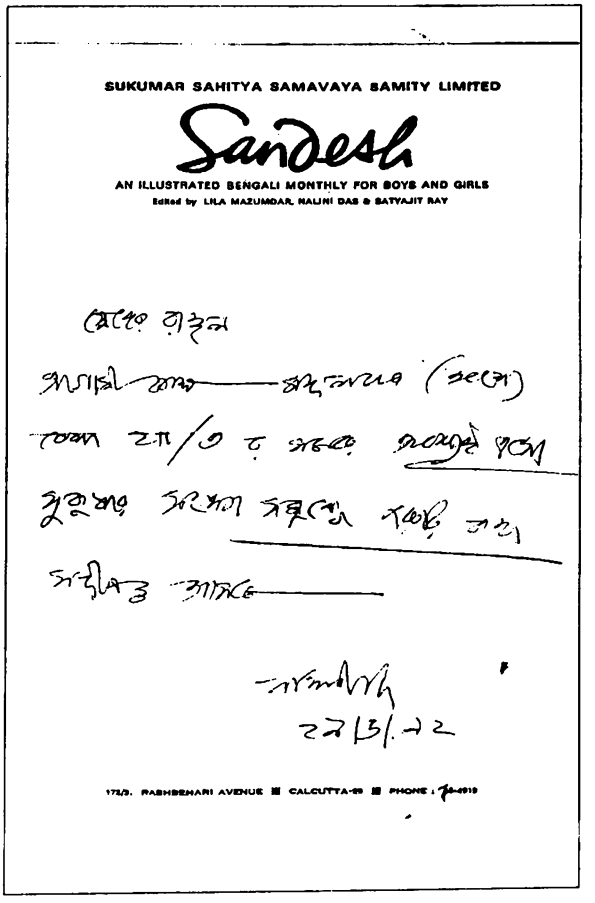

একজন সম্পাদক একটা পত্রিকার জন্য কতটা ঝক্কি সামলাতে পারেন, কতটা দায়িত্ব নিতে পারেন নিজের কাঁধে, তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ নলিনীদি। অসম্ভব নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা ছিল তাঁর জীবন। কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি চোখে পড়েনি কখনও। সমস্তটাই থাকত আশ্চর্যরকম স্নেহসিক্ত। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে মানের দিক দিয়ে কোনও ক্ষেত্রেই এতটুকু সমঝোতায় রাজি ছিলেন না তিনি। খ্যাতি, পরিচিতি বা আত্মীয়তা, কোনও কিছুই তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। আমি তাঁকে সত্যজিৎ রায়ের পুজো সংখ্যার লেখাও ফেরত পাঠাতে দেখেছি। পত্রিকার মান বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠোর। কঠোর কিন্তু রূঢ় নয়। রূঢ়তা ছিল তাঁর


SUKUMAR SAHITYA SAMAVAYA SAMITY LIMITED

Sandesh

AN ILLUSTRATED BENGALI MONTHLY FOR BOYS AND GIRLS

Edited by LILA MAZUMDAR, NALINI DAS & SATYAJIT RAY

172/3, RASHBEHARI AVENUE ■ CALCUTTA-29 ■ PHONE

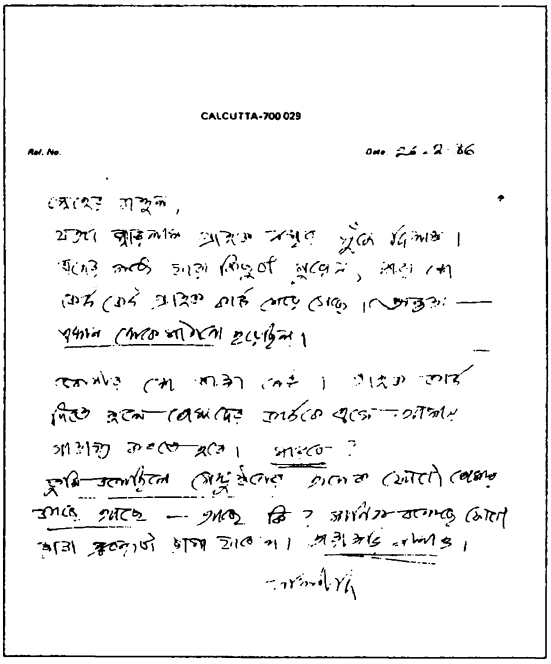

CALCUTTA-700 029

Ref. No. Date 26.2.86

স্বভাববিরোধী। তাঁর প্রত্যাখানও ছিল বিনীত, বিনম্র, স্নেহমাখা।

আশ্চর্য, এমন কর্মব্যস্ত জীবনেও তিনি সাংসারিক ও সামাজিক কর্তব্যেও কখনও হেলা করেননি। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর এই নিরলস কর্মব্যস্ততা তাঁর সাহিত্যসৃজনকে বেশ খানিকটা ব্যাহত করেছে। তাঁর প্রতিভার তুলনায় তাঁর রচনার সংখ্যা অতি নগন্য।

পরপর স্বামী অশোকানন্দ দাশ (কবি জীবনানন্দ দাশের ভাই) ভাসুরপো সমরানন্দ দাশ (তাঁর প্রিয় রঞ্জু), অতি প্রিয় ভাই মানিক (সত্যজিৎ রায়)-কে হারিয়ে ভয়ানক মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর অন্তর পুড়ে খাক হয়ে গেলেও সন্দেশের কাজ করে গেছেন সমান মসৃণতায়। এত বড় দু-দুটো ধাক্কা (অশোকানন্দ দাশ ছিলেন সন্দেশের প্রকাশক)সন্দেশীদের এতটুকুও বুঝতে দেননি। শেষ দিন পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। সে দিন ছিল ২৬শে মার্চ, ১৯৯৩। সকালে তাঁর সঙ্গে বসে সন্দেশের কাজ করে বাড়ি ফিরেছি দুপুরে। সন্ধ্যাবেলা ঝড়জলের সঙ্গে এল সবথেকে বড় ধাক্কাটা, আর সবথেকে অবিশ্বাসের কথা, ধাক্কাটা দিলেন নলিনীদি! সন্দেশীদের কাঁদিয়ে দিয়ে চলে গেলেন সন্দেশের সবথেকে পরিশ্রমী আর প্রচারবিমুখ সম্পাদক নলিনী দাশ, আমাদের নলিনীদি।

## অভিনন্দন

'সন্দেশ'-এর নিয়মিত লেখক শ্রী আশীষ লাহিড়ী তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের বইয়ের জন্য এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য আমরা গর্বিত। তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

# ‘তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ’

## শুভদীপ অধিকারী

সত্যজিতের সৃষ্টি হিসাবে ফেলুদা, শঙ্কু এমনকি আমাদের লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ুকে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হলেও তাঁর সৃষ্ট আরও একটি চরিত্র তারিণীখুড়ো থেকে গেছেন প্রায় ব্রাত্য। চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক হলেও তারিণীখুড়োর আত্মপ্রকাশ বাকিদের থেকে অনেক পরে। তারিণীখুড়োর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৩৮৮-র পৌষ সংখ্যার আনন্দমেলায়। তারিণীখুড়োর গল্প মাত্র ১৫টি। তারিণীখুড়োর সম্পর্কে আমাদের জানা তথ্যগুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

* ভালো নাম : তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ডাক নাম: তারিণীখুড়ো, সবার কাছেই খুড়ো। ন্যাপলা একবার ‘দাদু’ বলে ডাকায় রেগে গিয়ে উনি বলেছিলেন, ‘এখনও বাস না পেলে অক্লেশে হেঁটে বেনেটোলা টু বালিগঞ্জ—দাদু আবার কি? খুড়ো বলবি।’

ডুমনিগড় নেটিভ স্টেটের রাজা ভূদেব সিং ‘ট্যারি’ বলে ডাকতেন।

ন্যাপলাকে একবার মিস্টার শর্মা বলে সম্বোধন করতে দেখা গেছে।

লেখক একবার বুড়ো বলে গল্পে লিখেছেন।

* জন্মরাশি ও তিথি: কর্কট রাশি, পঞ্চমী তিথিতে তারিণীখুড়োর জন্ম।

* পারিবারিক পরিচিতি: একসময় ঢাকায় থাকতেন। লেখকের জন্মের আগে যখন তাঁর বাবা ঢাকায় ছিলেন, সেই সময় তারিণীখুড়ো ছিলেন ওঁদের পড়শি। আত্মীয়দের মধ্যে জানা যায়, তাঁর বাবার মাসতুতো ভাই ধরণীকাকার কথা। তিনি জয়পুরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন।

খুড়োর মেজমামা আছেন, আর এক ভাইপো চা কোম্পানিতে ভালো চাকরী করেন। বিয়ে করেননি তাই সংসার চিন্তা কোনওদিনই ছিল না।

* বর্তমান কর্মসংস্থান : ৬৪ বছর বয়সে চরকিবাজী থামিয়ে বেনিয়াটোলা (বেনেটোলা) লেন-এর এক ফ্ল্যাটে এসে রয়েছেন।

* কাজ : বর্তমানে অখণ্ড অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। চাকরির ধান্দায় ৪০-৪৫ বছর ধরে দেশে বিদেশে ঘুরেছেন। ভারতের তেত্রিশটি শহরে ৫৬ রকমের কাজ করেছেন। অফুরন্ত অভিজ্ঞতার স্টক থেকে গল্প শোনান। শ্রোতা বলতে মাত্র পাঁচ জন—লেখক, সুনন্দ, চটপটি, ভুলু আর ন্যাপলা।

গল্প শোনাতে আসেন বালিগঞ্জে লেখকের বাড়িতে।

* যাতায়াত: বাসে। বাস না পেলে পায়ে হেঁটে গল্প শোনাতে আসেন।

* প্রকৃতি: বাইরে একটা খিটখিটে ভাব দেখালেও আসলে মনটা নরম।

* অপছন্দের বিষয় : বুড়োদের সঙ্গ ভালো লাগে না তাই এতদূরে গল্প শোনাতে আসেন।

* গল্প বলার সময় আচরণ : তক্তাপোষের ওপর বাবু হয়ে বসেন, ডান হাতটা পায়ের পাতার উপর রেখে অল্প অল্প দোলেন এবং মাঝে মাঝে কপালে ভাঁজ দেখা যায়। মাঝে মাঝে তাকিয়াটাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে বসতে দেখা গেছে।

* নেশা : এক্সপোর্ট কোয়ালিটির বিড়ি। দুধ-চিনি ছাড়া ‘র’টি। চা খাওয়া নিয়ে একবার বলেছিলেন, ‘এই বাদলার সন্ধ্যায় গরম চা যতক্ষণ না পেটে পড়বে ততক্ষণ ভ্রূকুটি থাকতে বাধ্য।’

* ব্যবহৃত জিনিস: বর্ষায় সঙ্গী জাপানী ছাতা।

তারিণীখুড়োর গল্প থেকে তাঁর অতীত জীবনের যে সব তথ্য পাওয়া যায় এবার তার দিকে একটু চোখ বোলানো যাক—

* শারীরিক বর্ণনা : উচ্চতা ৬ ফুট, গায়ের রঙ ফর্সা, দোহারা চেহারা, চোখা নাক, পাতলা ঠোঁট, ব্যায়াম করা পাকানো শরীর, জামা খুললে প্রতিটি মাস্‌ল আঙুল দিয়ে দেখানো যায়। চোখে মাইনাস ৯ পাওয়ারের পুরু চশমা।

একটা সময় গোঁফ রাখতেন। আগ্রার ব্যাঙ্কে থাকাকালীন এক খদ্দেরের গোঁফ দেখে তাঁর গোঁফ রাখার শখ হয়। কিন্তু এই গোঁফ রাখার জন্য তাঁর চেহারা হয় ডাকু টোটা সিং-এর মতো। তাই শেঠ গঙ্গারামের বাড়িতে টোটা সিং হামলা করার পরে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে মহাবীর তার গোঁফ শেভ্ করে দেয়। মাঝে একবার ত্রিকোণাকার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছিলেন। যদিও অধিকাংশ গল্পে ও ইলাসট্রেশন্-এ গোঁফের উল্লেখ নেই বা আঁকা নেই।

* ঘুম : নরম বিছানায় শোওয়া পছন্দ করেন না।

* খাওয়া-দাওয়া : চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে দেশে বিদেশে ঘুরেছেন তাই বলা যায় তিনি বিভিন্ন খাবারে অভ্যস্ত। গল্পে খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ উল্লেখ নেই। তবে বনমোরগের রোস্ট খেয়েছেন। গুজরাটি রান্নায় অভ্যস্ত। শেঠ গঙ্গারামের বাড়িতে নিরামিষ খেতে হবে শুনে প্রথমে দমে গেলেও শেঠজীর বাড়ির নিরামিষ সুস্বাদু খাবার আর খাঁটি গরুর দুধের মালাই তার মাছ-মাংসের অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল।

* পোষাক: শার্ট, ট্রাউজার্স, টাই, কোট, বাড়িতে পরতেন পাঞ্জাবি। শিকারের সময় নিশ্চয়ই শিকারের পোষাক পরতেন।

* নেশা: কফি খেতেন, র-টি (দুধ-চিনি ছাড়া) খাওয়ার অভ্যাস ডুমনিগড় থেকেই। চুরুট খেতেন। হাভানা চুরুটের উল্লেখ পাওয়া যায়। মদ্যপানে অভ্যাস না থাকলেও শ্যাম্পেন পানে ডুমনিগড়ের রাজা ভূদেব সিংকে সঙ্গ দিতেন।

* অসুখবিসুখ: ডন বৈঠক দিয়ে শরীর বানানো, এমনিতে অসুখবিসুখ হয় না বললেই চলে। কিন্তু সর্দি জিনিসটাকে বড় ভয় পেতেন।

* শিক্ষা ও ভাষাজ্ঞান : কলেজে ইংরাজিতে অনার্স ছিল। বাংলা ও ইংরাজি ছাড়াও দু'বছর আগ্রায় থাকায় হিন্দীটাও ভালো শিখেছিলেন। উর্দুও ভালো জানা ছিল।

* শখ: নবাবী আমলের জিনিসের শখ ছিল। খুড়োর লক্ষ্ণৌয়ের ফ্লাটের বৈঠকখানায় অনেক জিনিস কেনা হয়েছিল লক্ষ্ণৌয়ের হজরতগঞ্জ অকশন হাউস থেকে। এখান থেকে এক হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বন্দুক প্রস্তুতকারক জোসেফ ম্যান্টনের ছাপ মারা একজোড়া ডুয়েলিং পিস্তল, যা দিয়ে লক্ষ্ণৌয়েই এক ডুয়েল লড়া হয়েছিল দিলখুশার পশ্চিমে গোমতী নদীর কাছে একটা মাঠে তেঁতুল গাছের নিচে--আনুমানিক ১৮০০ বা ১৮০১এর ১৬ই অক্টোবর সুন্দরী তরুণী অ্যানাবেলার জন্য ক্যাপ্টেন ব্রুস ও চিত্রশিল্পী ইলিংওয়ার্থ-এর মধ্যে।

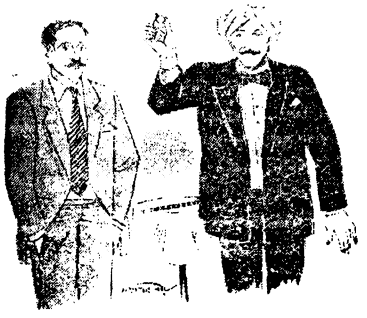

ম্যাজিকের শখ আছে। অভিনয়ের শখ আছে। খেলা-ধুলো—বিশেষত ক্রিকেটের শখ আছে।

* জ্ঞানের পরিধি: হলিউডের ছবি ও বাংলা পেশাদারী থিয়েটার সম্পর্কে জ্ঞান আছে। শিশিরকুমার ভাদুড়ি, যোগেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

নিজের শখে এককালে ডুয়েলিং নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছেন। পামিস্ট্রি সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। টাইপিং জানতেন।

* যা পড়েছেন : এককালে বেতালের গল্প পছন্দ করতেন। বীরেন্দ্রপ্রতাপ সিংকে তার বাবা রাজেন্দ্রপ্রতাপ সিং-এর জীবনী লেখার জন্য সাহায্য করার সময় ইংরাজিতে লেখা রাজেন্দ্র-প্রতাপের ডাইরির তেত্রিশ ভল্যুম পড়েন।

রিটায়ার্ড জাদুকর মহিম সান্যালের সেক্রেটারি থাকা-কালীন তার লেখা পাণ্ডুলিপি পড়েন। তার পাণ্ডুলিপির নাম ছিল 'ইন্ডিয়ান ম্যাজিক'। ইংরাজিতে লেখা এই সাড়ে চার'শ পাতার পাণ্ডুলিপিটি তিনি টাইপ করে দিয়েছিলেন, কারণ এক বিদেশী প্রকাশক তা ছাপার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ফেলুদার 'ইন্দ্রজাল রহস্য' গল্পে সোমেশ্বর বর্মনের ভারতীয় জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত বইটির নামও 'ইন্ডিয়ান ম্যাজিক'।

* সঙ্গীত: গানের জলসায় যেতেন।

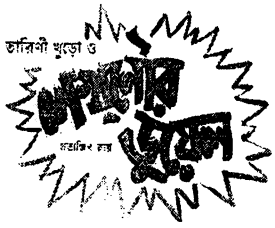


* সিনেমা-থিয়েটার : ছেলেবেলায় 'জিন্দা লাশ' বলে একটা হিন্দী ফিল্ম দেখেছিলেন। হলিউডের ছবির খুব ভক্ত ছিলেন। বাংলা ছবি সম্পর্কে মত, 'বাংলা ছবিতে তো

আর অভিনয় হ'ত না, যত রং তামাশা।'

ভালো পেশাদারী থিয়েটার দেখতেন। রতনলাল রক্ষিতের সেক্রেটারি থাকাকালীন প্রতি সন্ধ্যেতে বিশু(রতনলাল রক্ষিত) ও শিবু (শরৎ কুণ্ডু)-এর ২০ মিনিটের শর্ট কমিক সাইলেন্ট ফিল্ম দেখতেন।

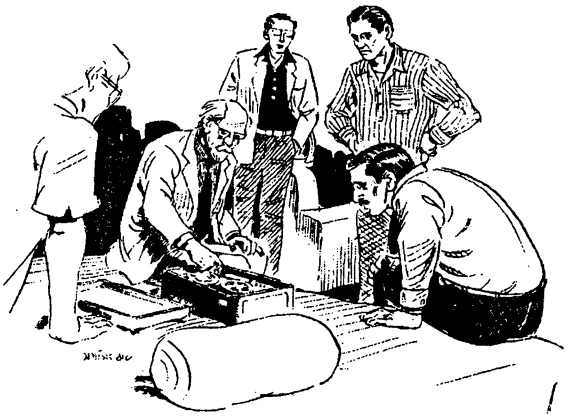

* চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যকে কখনোই উঁচুতে স্থান দিতেন না। নানা অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত।

একবার নিজের হাতে দুটি তেঁতুলে বিছে ও একটি কাঁকড়া বিছে তুলেছিলেন। ফিল্মে হিরো হবার শখ তাঁর ছিল না। তবে চাইতেন তাঁর গোটা জীবনটাই হবে সিনেমার গল্পের মতো।

* ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাস : ভূতে বিশ্বাস করেন। তার মতে ভূত চার প্রকারের-- এক, অশরীরী আত্মা, যাকে চোখে দেখা যায় না। দুই, ছায়ামূর্তি। তিন, নিরেট ভূত যাকে দেখলে জ্যান্ত মানুষ মনে হবে কিন্তু চোখের সামনে ভ্যানিশ হয়ে যাবে। চার, নরকঙ্কাল। যদিও কঙ্কাল তবুও চলে ফিরে বেড়ায় আর কথা বলে।

প্ল্যানচেট-এ বিশ্বাস নেই, কিন্তু 'নরিস সাহেবের বাংলো'-তে নিজে নরিস সাহেবের আত্মা নামানোর কাজ করেন। তাঁর মতে মিডিয়াম যদি খাঁটি না হয় তবে বুজরুকির সুযোগ থাকে। খুড়োর মতে তিনি হাঁচি, টিকটিকি, ভূতপ্রেত, দত্যিদানা, বেদ-বেদান্ত, আইনস্টাইন-ফাইনস্টাইন সব মানেন।

* পছন্দ-অপছন্দ : যে কেউ তাঁকে তুই-তোকারি করে সম্বোধন করুক তা একেবারেই পছন্দ নয়।

* খেলাধুলো : শিকার করতেন এমনকি নিজে বাঘও মেরেছেন, 'অব্যর্থ ট্রিপ', কর্নেল হোয়াইটহেড নিজে হাতে ধরে বন্দুক চালানো শিখিয়েছিলেন আজমীরে থাকতে। ম্যাজিশিয়ান চমকলালের কাছ থেকে দু-একটা ছোটখাটো ম্যাজিক শিখেছিলেন। ডাংগুলি, হা-ডু-ডু, ব্রিজ, পোকার, দাবা, বিলিয়ার্ড, সবই খেলেছেন। স্কুল কলেজে হকি, ফুটবল, আর ক্রিকেট রেগুলার খেলতেন। ফাইভ ডাউন বা সিক্সডাউনে নামতেন। তার হিরো ছিল জামসাহেব অফ্ নওয়ানগর মহারাজা রণজিৎ সিংজী। ত্রিশ বছর বয়সে মার্তন্ডপুর ক্রিকেট ক্লাব (এম.সি.সি.)-র হয়ে সাহেবদের প্লান্টার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলেন। ওই ম্যাচে তাঁর রান ছিল ২৪৩ অপরাজিত। তাঁর মধ্যে এগারোটা ওভার বাউন্ডারি আর একত্রিশটা বাউন্ডারি ছিল।

* যানবাহন : বিভিন্নসময় ট্রেনে এবং গাড়িতে চড়েছেন। গাড়ির মধ্যে জিপ, ফোর্ড, ট্যাক্সি, আর্মস্ট্রং সিডনি। ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন ছাড়া ট্রেনে চড়তেন না, শহরে ঘুরেছেন ট্যাক্সিতে।

* ভ্রমণ: ৪০-৫০ বছর ধরে দেশে বিদেশের প্রচুর জায়গায় ঘুরেছেন। দেশের মোট তেত্রিশটি শহরে ঘুরেছেন, বিদেশের কোথায় কোথায় ঘুরেছেন তার কোনও তথ্য মেলেনি। কাজের সূত্রে ঘুরেছেন--মধ্যপ্রদেশের বাঘেলখন্ডের ডুমনিগড় বলে একটা নেটিভ স্টেট (মাইহার পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে পূর্বে ১৩২কিমি গাড়িতে), কোডার্মা, হাজারীবাগ, পুণে, আগ্রা, আজমীর, উত্তর প্রদেশের নেটিভ স্টেট মার্তন্ডপুর, মালাবার, মাদ্রাজ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ব্যাঙ্গালোর, মধ্যপ্রদেশের ছোট শহর ধুমলগড়(চাঁদা থেকে ৭০কিমি পশ্চিমে), হায়দ্রাবাদ, বম্বে, নাগপুর, আহমেদাবাদ, মাইসোরের কাছে মন্দার নেটিভ স্টেট নিজে ঘুরেছেন অম্বর প্যালেস, আজমীর-এর মুসলমানতীর্থ এবং আকবরের প্রাসাদ। এখান থেকে ৭ মাইল পশ্চিমে হিন্দুতীর্থ পুস্কর, এখানে একরাত কাটান আনাসাগরের ধারে সার্কিট হাউসে। রাজস্থানের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর মতে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজস্থানই হল সত্যিকারের প্রেম ও রোমান্সের ঘাঁটি। দক্ষিণভারতে ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কোচিন টু কোয়েম্বাটুর টু ব্যাঙ্গালোর টু কুর্নুল টু হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদের সালার জাং মিউজিয়াম ও গোলকোন্ডা মিউজিয়াম দেখার ইচ্ছা ছিল। খুড়োর মতে স্রেফ একজনের সংগ্রহের জিনিস একটা গোটা মিউজিয়ামের আকার নিতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

* পেশা ও উপার্জন : ৪০-৪৫ বছর ধরে দেশে

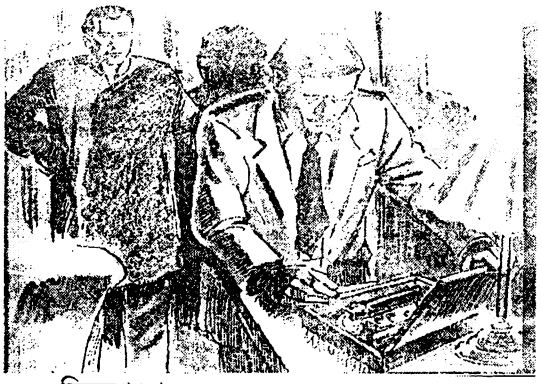

বিদেশে কাজের সূত্রে ঘুরেছেন। তবে এক বছরের বেশি কোনও কাজে টিকে থাকেননি। ভারতের তেত্রিশটি শহরে ছাপান্ন রকমের কাজ করেছেন উপার্জনের জন্য। কাজের পরিধিও বিস্তৃত। তাঁর কাজের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

* বিবিধ পেশা : অভিনয় ও মডেলিং ছাড়া অন্য পেশার তালিকা নিচে দেওয়া হল--

১। মধ্যপ্রদেশের ডুমনিগড় নেটিভ স্টেটের ম্যানেজার।

২। কোডার্মার মাইকা মাইনসের চাকরি।

৩। পুণেতে এক হোটেলের ম্যানেজার।

৪। আগ্রায় ব্যাঙ্কে চাকরি।

৫। আজমীরের বিখ্যাত ধনী শেঠ গঙ্গারামের সেক্রেটারি ও তার ছেলে মহাবীরের গৃহশিক্ষক।

৬। উত্তরপ্রদেশের নেটিভ স্টেট মাতণ্ডপুর-এর রাজা বীরেন্দ্রপ্রতাপ সিং-এর সেক্রেটারি। সেখানে তিনি বীরেন্দ্র-প্রতাপকে তার বাবা রাজেন্দ্রপ্রতাপের জীবনী লিখতে সাহায্য করতেন।

৭। মেজমামার সহপাঠী পরেশ মুস্তাফির ভারতমাতা স্টুডিওর প্রোডাকশন্ ম্যানেজারের চাকরি।

৮। প্রাক্তন অভিনেতা রতনলাল রক্ষিতের সেক্রেটারি, সেখানে খুড়ো তার অভিনীত 'সাইলেন্ট কমিক্' ছবির ফিল্মোগ্রাফি তৈরির কাজ করেন।

৯। মাদ্রাজে একটা হোটেলের ম্যানেজারের চাকরি, সম্ভবত এটি তার জীবনের একটি রেকর্ড কারণ এখানে তিনি দু' বছর কাজ করেছিলেন।

১০। ম্যাজিশিয়ান চমকলালের ম্যানেজার।

১১। কানপুরে ব্যাঙ্কে চাকরি।

১২। রিটায়ার্ড ম্যাজিশিয়ান মহিম সান্যালের সেক্রেটারি। যেখানে তার লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি টাইপ করতে হ'ত।

১৩। বোম্বেতে মুকুন্দ পটবর্ধনের কাছে হাত গণনা শিখে পসার জমানোর জন্য নাগপুরে গিয়ে গণনার কাজ শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ এবং মাসিক রোজগার ছিল প্রায় তিন হাজার টাকার মতো। এর জন্য তাঁকে এক বি. এ. পাশ সেক্রেটারি রাখতে হয়।

১৪। প্রায় ৪৫ বছর বয়সে আহমেদাবাদে কাপড়ের ব্যবসায়ী বলবন্ত পারেখের বাড়িতে স্টোরি টেলারের কাজ নেন, সেখানে খুড়োকে নানা গল্প শোনাতে হ'ত পারেখকে।

* সংবাদপত্র সংক্রান্ত কাজ :

১৫। লক্ষ্ণৌতে 'পায়োনিয়ার' ইংরাজি কাগজে মাঝে মাঝে চুটকি গোছের লেখা লিখতেন।

১৬। ব্যাঙ্গালোরে 'ডেকান হেরাল্ড' কাগজের রিপোর্টার। সম্পাদক -জগন্নাথ কৃষ্ণান। এই সময় তাঁর শখ হয় ধুমলগড়ের মৃত বড়কুমার আদিত্যনারায়ণের প্রেতাত্মার সাক্ষাৎকার নেবেন।

১৭। হায়দ্রাবাদে থাকাকালীন 'অন্ধ্র হেরাল্ড' পত্রিকায় একটু আধটু লিখতেন।

১৮। বম্বেতে ফ্রি-প্রেস জার্নাল কাগজের এডিটর ছিলেন দেড় বছর।

* ব্যবসা:

১৯। লক্ষ্ণৌতে হজরতগঞ্জ অকশন হাউস থেকে পুরনো জিনিস সুবিধামতো কিনে আমেরিকান ট্যুরিস্টদের কাছে তা বেচতেন। পুরানো জিনিসের সাপ্লায়ার হিসাবে তাঁর পরিচিতিও ছিল।

২০। একটা সময় মালাবারে এলাচের ব্যবসা করতেন।

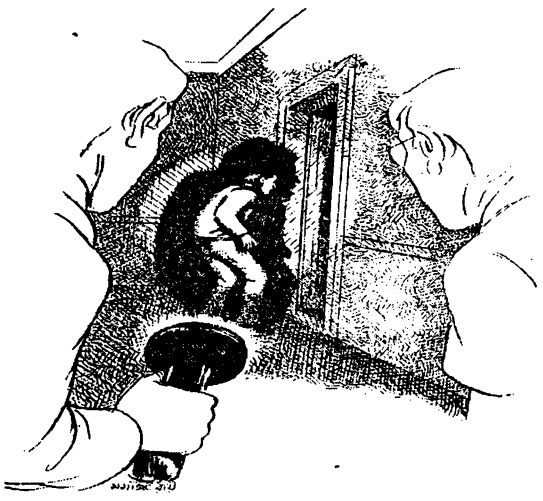

অভিনয় : চেহারার জন্য ফিল্মে হিরোর জন্য অনেক অফার পেলেও রিফিউজ করেছেন। এককালে অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। 'আলমগীর' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করেন রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্থানে। যদিও তারিণীখুড়োর বন্ধু ব্রতীন, মেক-আপ ম্যান যতীন তার সহকারী হাবুল, ড্রেসার তারাপদ, নতুন প্রোডাকশন ম্যানেজার এবং অবশ্যই রমণীমোহন ছাড়া আর কেউ একথা জানতে পারেনি। এজন্য তিনি পারিশ্রমিক ছাড়াও রমণীমোহনের কাছ থেকে তার মুঘল আমলের হীরে আর চুনী বসানো সোনার আংটিটি পান। এই সিনেমায় খুড়ো অভিনয় করলেও নাম হয়েছিল রমণীমোহনের। ছবিটি সুপার হিট হয়েছিল এবং বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে রমণীমোহন তিনটি সংস্থা থেকে পুরস্কার পেয়েছিলেন— এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি নিজেই 'জ্যোতিষার্ণব'-এর মেকআপ নিয়ে রমণীমোহনের বাড়ি গিয়ে তাকে অভিনয়-এর দিকে যেতে বারণ করেছিলেন। পাঁচ দিনের জন্য মন্দোর নেটিভ স্টেটের মহারাজা গুলাব সিং-এর স্থানে তিনি অভিনয় করেন তার অসুস্থতার কারণে। এর জন্য তিনি দশ হাজার টাকা পুরস্কার পান।

* মডেলিং : হায়দ্রাবাদে থাকাকালীন ধনরাজ মার্তন্ড-র পৌরাণিক ছবি আঁকার জন্য তার ছবির পুরুষ মডেল নির্বাচিত হন বিশ্বনাথ সোলাঙ্কির স্থানে।

পরে তার বিক্রমাদিত্য ছবির সিরিজের ছবির জন্যও তিনি মডেল নির্বাচিত হন, বিশ্বনাথ সোলাঙ্কির স্থানে।

* অন্যান্যভাবে উপার্জিত টাকা:

কনওয়ে কাস্‌লে প্রেতাত্মার উপস্থিতি প্রমাণ করে এক হাজার টাকার বাজি জেতেন উকিল ঘনশ্যাম আপ্‌টের কাছ থেকে।

ধনরাজ মার্তণ্ডকে বিক্রমাদিত্য ও বেতাল-এর ছবি আঁকার জন্য একটা কঙ্কাল জোগাড় করে পাঁচ'শ টাকা বখ্‌শিস পান।

লক্ষ্ণৌতে তাঁর কোনও স্থায়ী চাকরি ছিল না। তার দেড় বছর আগে (আনুমানিক) ১৯৫০-এর এপ্রিলে রেঞ্জার্স লটারিতে লাখ দেড়েক টাকা জেতেন।

* অস্থায়ী ঠিকানা :

পুণেতে বন্ধু রাধানাথ চ্যাটার্জির বাড়িতে থাকতেন, আজমীরে থাকতেন শেঠ গঙ্গারামের বাড়িতে। লক্ষ্ণৌতে লাটুশ রোডের একটা ছোট বাংলো বাড়িতে থাকতেন। নাগপুরে হাত দেখা চালানোর সময় এক বছরের মধ্যে একটা বড় ফ্ল্যাট-এ চলে যান পসার জমে যাওয়ায়।

সব সময় ভাল হোটেলে থাকা পছন্দ করতেন। হাজারীবাগে থাকার সময় ছিলেন হোটেল ডি-লাক্স-এ।

* জীবনে জ্যোতিষীর ভূমিকা :

ছোটবেলায় এক জ্যোতিষী বলেছিলেন তাঁর অপঘাতে মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু জ্যোতিষীর ওই ভবিষ্যতবাণী মোটেই ফলেনি। ডুমনিগড়ে এক সাধুবাবাজী ম্যানইটার মারতে যাবার আগে তাঁর কপালে হিঙ আর কস্তুরি মেশানো গন্ধযুক্ত এক সবুজ মলম মাথায় ঘষে দেন। সেদিন তিনি ম্যানইটারের কাছ থেকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসেন অক্ষত অবস্থায়। কিন্তু এটা যে মলমের জোরেই ঘটেছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না।

এহেন তারিণীখুড়োকে ভুললে চলবে না।

*ছবি : সত্যজিৎ রায়*

**With Compliments From :**

**EAST INDIA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED**

**Kolkata -700 071**

# লীলাদির একখানি অপ্রকাশিত চিঠি

*সন্দেশের লেখক সলিল মিত্রকে লেখা লীলা মজুমদারের চিঠি*

রতনপল্লী,
শান্তিনিকেতন,
(৭৩১২৩৫),
২০ - ৬- ৮৩

স্নেহের সলিল,

আজ তোমার পোঃ কাঃ পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। গৌরী ধর্মপালের 'মাল্যশ্রীর পঞ্চতন্ত্র'টিও পড়ে দেখ। (সুখলতা রাওয়ের পঞ্চতন্ত্রের গল্প আছে মনে হয়।) যদিও অনেকখানি মৌলিক। ঐ রকম নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখো, নইলে ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়বে না। এসব প্রাচীন বইয়ের কোনও কপিরাইট থাকে না। মিল্টন বাইবেলের অংশ নিজের মতো করে Paradise Lost তৈরি করেছিলেন। তুমিও স্বচ্ছন্দে ঐ সব গল্পে নিজস্ব বক্তব্যও ভরে দিতে পার। নামধাম তো বটেই। আমার অনুবাদে লালবিহারী দে-র বাংলার উপকথার গল্পগুলি নজর করে দেখলে বুঝবে ওসব নিছক অনুবাদ নয়। বহু স্থানে উনি গল্পের frame টুকু দিয়েছেন। নামধাম রস দিয়ে আমি তাকে পূর্ণ করেছি। ছোটদের অনুপযুক্ত অংশ বাদ দেবে। প্রাসঙ্গিক নতুন সংযোজন দরকার হলে দেবে। Fossil নিয়ে আমাদের কারবার নয়। তার মধ্যে চিরন্তন সামগ্রীটুকু নিও। তোমার বইয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ডাকে সন্দেশ কার্যালয়ে পাঠিয়েছিলাম। কি হল বুঝলাম না। খোঁজ নেব। এখানেও দারুণ গরম, দারুণ খরা।

স্নেহাশীর্বাদ নিও।

আঃ লীলা মজুমদার

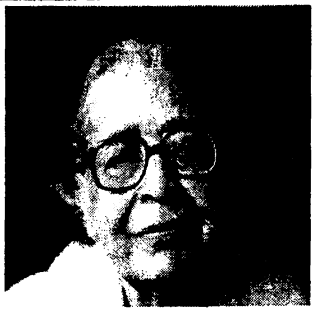

# অনেকটা পথ পেরিয়ে

## অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৯ সালে বিশ্বভারতী যাই ছাত্র হিসেবে। সেই সময়ে অধ্যক্ষ ছিলেন অনিল চন্দ। রবীন্দ্রনাথের কাছে খবর পৌঁছেছিল সাহিত্যিক বনফুল(বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-এর ভাই ছাত্র হিসেবে এসেছে। সুতরাং আমার ডাক পড়ল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার। অনিল চন্দ আমাকে বলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ কানে কম শোনেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করতেই উনি জিজ্ঞেস করলেন--আমি বলাইয়ের ভাই কানাই কি না! আমি বেশ জোরেই উত্তর দিলাম--না, আমি অরবিন্দ। সঙ্গে সঙ্গে উনিও বলে উঠলেন, এতো দেখছি সানাই! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত এভাবেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, পাশেই ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। রবীন্দ্রনাথই পরিচয় করিয়ে দিলেন যে ইনিই তোমাদের কেমিস্ট্রি পড়াবেন, তবে গানের রসায়নও উনি খুব ভালো বোঝেন সুতরাং দেখবে দুটোই উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। সে সময়ে আমাদের পড়াতেন সুধীর কর, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখেরা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের 'ছন্দ' পড়াতেন।

সে সময় আমি খুব লেখালেখি করতাম। 'সাহিত্যিকা' নামে যে পত্রিকা ছিল তাতে প্রায়ই আমার গল্প বের হ'ত। রবীন্দ্রনাথ একবার আমার গল্পের নামও পাল্টে দিয়েছিলেন। আমাদের এম.এ. ক্লাসে বাংলা পড়াতেন ক্ষিতিমোহন সেন। উনি পড়াতেন গীতাঞ্জলি ও বলাকা। রামকিঙ্কর বেজ আমাদের নাটক করাতেন। ওঁর প্রশিক্ষণে বহু নাটকে অভিনয় করেছি। আমাদের হিন্দী নাটকে তালিম দিতেন বলরাজ সাহনী। হয়তো এই নাটকের চর্চাই আমাকে পরবর্তীকালে সিনেমার চিত্রনাট্য লিখতে আর ছবি তৈরির পটভূমি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

আমিই একবার প্রস্তাব এনেছিলাম বিশ্বভারতীতে সরস্বতী পুজোর প্রচলন করার। কিন্তু নানা জনের আপত্তি উঠেছিল, শেষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকে বুঝিয়ে বলেছিলেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মহড়া হ'ত আমাদের একসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ নতুন গানে সুর দিলেই সে গানের মহড়ায় বসে যেতাম আমরা। বর্ষামঙ্গলের মহড়া চলছে, রবীন্দ্রনাথ সেবারে অনেকগুলি নতুন গান তৈরি করেছেন, তারই মধ্যে একটি গান 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে'—এ গানের একটি পংক্তি 'বৃষ্টি নেশাভরা সন্ধ্যাবেলা, কোন্ বলরামের আমি চেলা'—প্রশ্ন উঠল, এর মানে কী? নানাজনে নানা মত জানাতে লাগল। শেষে রবীন্দ্রনাথ এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন, উনি তো জানতেনই আমি লেখালেখি করি--

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'বলরাম হলেন মদ্যপায়ী পানাসক্ত ব্যক্তি।' উত্তর শুনে খুশি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

একই বছরে না পড়লেও সুচিত্রা, কণিকা, সুবিনয় সে সময় এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। আর এসেছিলেন সত্যজিৎ রায়, উনি থাকতেন ওকাকুরা ভবনে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ বাঁধায় দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন, ওই সময়ে সুভাষচন্দ্র ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন মহাজাতি সদনে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের খুবই অর্থাভাব দেখা দেয়। সব মিলিয়ে ওঁকে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হতে দেখেছিলাম। তবে সব ব্যাপারটা না জানলেও এটুকু জেনেছিলাম ওই সময়ে গান্ধীজী এবং জওহরলাল নেহরু কিভাবে যেন বিশ্বভারতীকে অর্থ সাহায্য দিয়ে কিছুটা সঙ্কট মোচন করেছিলেন।

আজ জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে পিছন ফিরে তাকালে মনটা এক অযাচিত পাওয়ার আনন্দে ভরে ওঠে। অজস্র গুণীজন সঙ্গের স্মৃতির আলোয় আমার বাকি দিনগুলোও আলোকিত হয়ে থাকবে।

*(অনুলিখন : বিনীতা ঘোষ)*

# আলোকযাত্রা

## কেতকী গোস্বামী (বাগচী)

গ্রামের নাম নুনিয়া মাহাতো টোলা। তিনটে মোটে ইঁটে গাঁথা বাড়ি, আর সব ঘরে মাটিলেপা বাঁশের বেড়ার দেওয়াল তোলা। ছাদ বলতে শুকনো গমপাতার ছাউনি। উঠোনে বাঁশের গোল বেড়ের ওপর বসানো মাটির গামলা। ভূসির জাবে সবে মুখ ডুবিয়েছে সারাদিনের পর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত গরু-মহিষের দল। গোবরের গন্ধে বাতাস টইটম্বুর। পলেস্তারা হীন ইঁটের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পাকাঘরটির মেঝেতে না হোক জনা চল্লিশেক বালিকা গোল হয়ে ঘিরে বসেছে। সবারই সামনে বই খাতা। দিদিমণি বই হাতে সকলকেই ঘুরে ঘুরে পড়াচ্ছে। আমরা দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েরা সব উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। বিশেষ করে দেবনারায়ণজীকে।

'পঢ়াই ঠিকঠাকসে চলতা ক্যা? কোই দিক্কত তো না হো ববিতাজী?' দেবনারায়ণজী জিজ্ঞাসা করলেন।

বছর পঁচিশের মিষ্টি দিদিমণি ববিতা সসম্ভ্রমে উত্তর করল, 'জী নেহী।'

'কী পড়াচ্ছেন?' ববিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, অবশ্যই হিন্দিতে।

'প্রকৃতি বিজ্ঞান'...আর ওদিকে ওরা অঙ্ক করছে।

একই সঙ্গে তিন ক্লাস চলছে—দেবনারায়ণজী বললেন, 'বাল, শিশু আর প্রাথমিক। এভাবে একসঙ্গে তিন ক্লাসকে পড়াতে অসুবিধা হয় না?' ববিতাকে জিজ্ঞাসা করি।

'আগে হ'ত দিদি, এখন আর হয় না।' ববিতা বলল।

'বাচ্চারা, তোমরা খুশিমনে পড়ছ তো?' দেবনারায়ণজী জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, অ্যাঁ...' সমস্বরে উত্তর পাওয়া গেল।

দেওয়ালে ঝুলছে পশুপাখি, ফল-সবজির সচিত্র চার্ট। খোলা জানলা দিয়ে পশ্চিমের কমলা রোদ এসে পড়েছে মেয়েদের মুখে গায়ে। সকলেই এখন পড়া ফেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন দিদি?' ববিতা আমায় প্রশ্ন করল।

'কোলকাতা থেকে। তোমাদের স্কুল দেখতে এসেছি।'

'বসুন দিদি।' ববিতা আমায় একটা চেয়ার এগিয়ে দিল... 'আমার মেয়েদের কিছু বলে যান।'

বেরিয়ে আসার সময় মিষ্টি হেসে বলল, 'আবার আসবেন দিদি। আর আমার মেয়েদের চোখটা একদিন একটু দেখে দেবেন।'

বোলেরো গাড়িতে দু' কিলোমিটার মতো ধূলো পথ পেরিয়ে এবার পূরবী মাহাতো টোলা। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ, দু'পাশে নিবিড় গমের ক্ষেতে সোনালী রঙ লেগেছে। তার মাঝে মাঝে সূর্যমুখী গাছের ঢালা সবুজ। এখনও ফুল আসেনি। বিহারের এই বেতিয়া জেলায় প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। পূরবী মাহাতো টোলার তিন দিকে তিনটে মাটির বাড়ির মাঝে পরিপাটি উঠোন। নরম তেরছা ছায়ায় ঢাকা, সেখানে ঊর্মিলা দেবী ক্লাস নিচ্ছিলেন। জনা পঞ্চাশেক ছাত্রছাত্রী ক্লাসে। দু'টি ছেলে লাজুক মুখে দৌড়তে দৌড়তে এসে একেবারে আসনপেতে বসে পড়ল। ...দেরি হয়ে গেছে।

'এখানে কি পড়ানো হচ্ছে?'

'ভোজপুরী'। রামকিশোরজী উত্তর দিলেন।

'কি...?' কানে যেন অদ্ভুত লাগল কথাটা।

'ভোজপুরী! এ বুধিয়া, বোলরে, একঠো পহেলিয়া বোলতানি, ম্যায়ডামকো শুনা দে।'

বুধিয়া একটুও না ভড়কে দিব্যি গড়গড় করে বলে গেল

*—ঘামমে ছহইয়াঁ, আঁধীমে হহইয়া,*
*চলী না ফিরী, রহী এক ঠঁইয়া।'*

ছন্দটা মনে দিব্যি দোলা দিলেও কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

'গাছের কথা বলছে বুঝলেন না।' রামকিশোরজী ওদের বইয়ে ছবিটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। 'আর একটা শুনুন...

ধনী ঘরে রহিলে, গরীব কনে না যাইলে।
হমরে খাতির চোর ডাকু, সবকে লড়াইলে।'

এবারে খুব বুঝেছি। এতো দেখছি ছোটদের ছড়ায় সমাজতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা।

'আমরা প্রথমটা এদের মাতৃভাষা ভোজপুরীতেই পড়াই, বুঝলেন। কেন না, তা না হলে এরা তো প্রথম থেকেই পড়ার আনন্দটা নিতে পারবে না।' দেবনারায়ণজী বললেন।

'কিন্তু ...যতদূর জানি, এটা একটা কথ্য ভাষা, এর লিপি নেই... তাছাড়া বিহারের স্কুলে তো এখনও ভোজপুরিটা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু হয়নি।'

'হয়নি তো! দেখুন না, 'আলোক'-এর তরফ থেকে আমরাই ভোজপুরীতে বই ছাপিয়ে নিয়েছি। হিন্দী হরফে... এই যে 'বুঝি-সমঝি' বইটা উল্‌টে মলাট দেখালেন রামকিশোরজী।

এদেরই গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, লোককথা, এই সবের সঙ্কলন এতে রয়েছে। এরকম ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল বইও আছে। তবে হ্যাঁ, পরের দিকে এদের আমরা আস্তে আস্তে হিন্দীতে অভ্যস্ত করে তুলি।

অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা, বলতেই হবে। অনেকটা আমাদের সাঁওতালী ভাষা 'অলচিকির' মতো।

দিল্লীতে শ্রদ্ধেয় ডঃ সঞ্জিত বাঙ্কার রায়ের কাছে। বাঙ্কার রায় নামেই তিনি দেশে বিদেশে পরিচিত।

কিভাবে 'আলোক' দেখতে যাব বলে যখন সাত-পাঁচ ভাবছি তখন অযাচিতভাবে পাটনায় পরীক্ষা নিতে যাবার ডাকটা পেলাম। পাটনা থেকে বাসে প্রায় দু'শ কিলোমিটার উত্তরে ছোট্ট শহর বেতিয়া, জেলা চম্পারনপুর। সেখান থেকে আরও ষোল কিলোমিটার ভিতরে জগদীশপুর গ্রাম। এই গ্রামে আলোক কেন্দ্রের উঠোনে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় বসে শ্রীরামকিশোর আমাকে বোঝাচ্ছিলেন। 'আলোক'-এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৭ সালে। দেবনারায়ণ সাহ, রামকিশোর দুবে, আবদুল হামিদ, ডি.জে. গঞ্জালেস-- সকলে মিলে গড়ে তুলেছেন এই গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র। প্রেরণা পেয়েছেন ডঃ বাঙ্কার রায়ের কাছে। সহায়তা শ্রীমতী অরুনা রায়ের কাছে। বাঙ্কার রায়ের প্রতিষ্ঠিত

পরের গ্রাম নওরোঙ্গাটোলা। চার কিলোমিটার তফাতে। এবার আমার ভ্রমণ বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে। 'আলোক'-এর হাত ধরে। আলোকের কথা আমি শুনি গত অক্টোবরে।

সোস্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের প্রথম কেন্দ্রটি রয়েছে রাজস্থানের তিলোনিয়াতে, তার আর এক নাম-বেয়ার ফুট বা নগ্নপদ কলেজ। তার ভিডিও আমি দেখেছিলাম দিল্লীতে।

এই গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রামের ভিতর থেকে। শিক্ষিত

শহুরে মানুষের নয়। গ্রামের তথাকথিত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত শ্রমজীবি মানুষই এই উন্নয়নের রূপকার। আদিগন্ত ফসল ক্ষেতের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ছোট ছোট এক একটা গ্রাম। পাকা রাস্তা নেই, স্কুল নেই, হাসপাতাল নেই। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সারাটা দিন কাটে ক্ষেতি করে, ছাগল-গরু-মোষ চরিয়ে আর গেরস্থালি করে। কুড়ি কিলোমিটার দূরে প্রাথমিক স্কুলে যাবার সময় কই!

তাই গ্রামে গ্রামে শুরু হল আলোকের সান্ধ্য স্কুল। এই স্কুলে পড়ার জন্য চাই আলো--শুরু হল আলোক কেন্দ্রে সৌরশক্তি প্রযুক্তি শেখানোর ইস্কুল। ছাত্র-ছাত্রী যারা, তারা ওই গ্রামেরই নিরক্ষর নারী-পুরুষ। আর শিক্ষক? তারাও তা-ই...তবে তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে তিলোনিয়ার 'বেয়ারফুট কলেজ' থেকে।

নিজে হাতে সৌর লণ্ঠন বানিয়ে এরা সারাদিন রোদ খাওয়াবে তাকে, তারপর রাতেরবেলা জ্বালিয়ে পড়াশুনো, ঘরের কাজ, জলসেচের কাজ...।

'সারাদিন কাজকর্ম করার পর দিনের শেষে কতটা উৎসাহ আর থাকে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো করার?'

'আপনি নিজেই দেখে নিন না।' বললেন রামকিশোরজী।

নওরোঙ্গাটোলার রাস্তায় দূর থেকে কানে এল গানের সুর। কী ব্যাপার? প্রশস্ত উঠোনের একদিকে চণ্ডীমন্ডপের চারচালা, আর একদিকে একটি আম গাছ। মাঝে চলছে স্কুল। আমের মঞ্জরির গন্ধে মনে পড়ে গেল শান্তিনিকেতনের কথা। মাঝবয়সী শিক্ষক ভূদেবজী গানের সুরে অঙ্ক শেখাচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও গলা মেলাচ্ছে থেকে থেকে। এক দিকে একটি ব্ল্যাকবোর্ড। সেখানে রয়েছে অঙ্ক কষা। ভূদেবজীকে বললাম, 'এটা কি আপনার নিজস্ব পদ্ধতি,...এই গান করে অঙ্ক শেখানো?'

ভূদেবজী বললেন, 'গানটা আমার হতে পারে, তবে কাদয়াদা 'আলোক' থেকেই শেখা।

'শিক্ষকদের মাইনে দেন আপনারা?'

'খুবই সামান্য। এঁরা সারাদিন নিজেদের রুটি-রুজি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কিন্তু বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানোর সময় এঁরা বার করে নেন।

'নিয়মিত আসতে পারেন স্কুলে?' আমি সংশয় প্রকাশ করি।

'মোটামুটি। যদি না পারেন, তবে আমাদের আগে থেকে জানতে হয়। আমরা বদলি শিক্ষক দিয়ে দিই। তবে তার খুব একটা দরকার পড়ে না।' রামকিশোরজী বললেন।

বেরোবার মুখে এগিয়ে এলেন গ্রামের মহিলারা। 'দিদি, আমাদের ঘরে একটু বসবেন চলুন।'

এরা নিজেদের মধ্যে টাকা জমিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেছেন 'আলোক'-এর প্রেরণায়। আপাতত ছাগল পালন পর্যন্ত এগোনো গিয়েছে। মৌমাছি পালনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। ঘরোয়া একটা ডাকঘরও চালাচ্ছেন একটু লেখাপড়া জানা একজন।

পরের গ্রাম খুদাবক্সটোলা। বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। মশারা ওড়াউড়ি শুরু করেছে কানের চারপাশে। ঠাণ্ডাটা একটু একটু করে বোধ হ'তে শুরু করেছে। ক্লাস উঠোনের মাঝখানে দুটো সৌর লণ্ঠন রাখা। জ্বালাবার অপেক্ষায়। ক্লাস চলে শীতকালে সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে সাতটা। কাজেই শেষ ঘণ্টায় আলো জ্বালাতে হয়।

এখানে শিক্ষক ভগেলুপ্রসাদ এখন পড়াচ্ছেন স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। এর আগে হয়েছে গণিতের ক্লাস। তারপর হবে ইংরাজি। শেষ ঘণ্টায় একটু খেলাধুলো হয়ে তারপর ছুটি।

'ইংরাজিও শেখানো হয় নাকি এখানে?' আমি বিস্মিত হয়ে বলি।

'হ্যাঁ, আপনি জিজ্ঞাসা করুন না ওদের।'

'এই বাচ্চারা, 'বয়' মানে কী? হামিদসাহেব নিজেই আরম্ভ করলেন--লেড়কা আ আ...সমস্বরে উত্তর।

'গার্ল মানে কি?'

'লেড়কী ই ই ই...'

'...ক্যাট?'

'বিল্লী ই ই ই...'

'সান...'

'সূর্য...'

'আচ্ছা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে কি পড়ানো হল?' আমি একটু কৌতুহলী হই।

'এই তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী রয়েছে এখানে। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।' দেবনারায়ণজী একটি বছর তেরোর মেয়েকে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে দেন সকলের মধ্যে থেকে। মেয়েটি মুখ নিচু করে সলজ্জ হাসতে থাকে।

'স্বাস্থ্যমন্ত্রী!!'

'হ্যাঁ...ও তো সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে এখান থেকে।

এখানে তো শিশু সাংসদ আছে , জানেন না?'

'তাই নাকি!' আমি ক্রমশ হতভম্ব হই।

'হ্যাঁ, ওদের প্রধান মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পর্যাবরন মন্ত্রী রয়েছে।'

'ও হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে! তিলোনিয়ার ভিডিওতে দেখেছিলাম বটে শিশুসাংসদের নির্বাচনের ছবি। ...তা আর সব মন্ত্রী? রয়েছে অন্যান্য টোলায়। সাংসদদের বেশিরভাগই আবার মহিলা।'

'তাই নাকি!' আমি ক্রমশঃ অবাক হই।

'কাজ কি এই সাংসদদের?'

'স্কুলের উন্নতি, গ্রামের শিশুদের উন্নতি। সে জন্য নিয়মিত বৈঠকও হয় ওদের।'

ভেগৌনা। পঞ্চম গ্রাম।

সৌর লণ্ঠন জ্বালিয়ে ক্লাস চলছে। ব্ল্যাকবোর্ডে সূর্য আর পৃথিবীর ছবি আঁকা। পর্যাবরন পড়ানো হচ্ছে। একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গরু-মহিষের চোখগুলি জ্বলে উঠছে সন্ধ্যের অন্ধকারে। ভালোই ঠাণ্ডা লাগছে এখন। ছেলে মেয়েদের কারও গায়েই সেরকম গরম জামাকাপড় নেই। খোলা উঠোনে মাথায় হিম পড়ছে নিশ্চয়ই।

রামকিশোরজী গলা তুললেন, 'এই ছেলে-মেয়েরা, আমাদের পৃথিবীতে দিনরাত কী করে হয়?'

'পৃথিবীর আহ্নিক গতি দিয়ে।'

'আকাশে মেঘ কি করে হয়?'

'সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে।'

'এই লণ্ঠনের আলো কোথা থেকে আসছে?'

'সূর্য থেকে। সোলার প্যানেলের সাহায্যে।'

বেশ হইহই করে উত্তর দিচ্ছে ছেলে-মেয়েরা। সাফল্যের খুশি সমস্ত মুখে চোখে উছলে পড়ছে। আমি অবাক হয়ে দেখি!

ভেগৌনা থেকে যখন বেরোলাম পুরো অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিক। দেবনারায়ণজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আরও দেখবেন? মোট পনেরটি গ্রামে এরকম স্কুল চলছে।'

'না, আর দরকার নেই। যা দেখলাম তাতেই তো মন ভরে গেল। আপনারা কি করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন?'

'গ্রামবাসীদের সাহায্য ছাড়া হ'ত না।' দেবনারায়ণজী বললেন, 'এই ছাত্র, শিক্ষক, স্কুল সবকিছুই তো গ্রামের।'

'গ্রামের মানুষকে কি করে রাজী করালেন?'

'প্রথমটা অনেক বোঝাতে হয়েছে। প্রথমে ওদের ধারণা হয়েছিল আমরা নিজেদের কিছু ধান্দা ওদের ওপর চাপাতে চাইছি। কিন্তু আস্তে আস্তে ... এখন ব্যাপারটা ওরা নিজেরাই বুঝে নেয়, আমরা পাশে থাকি সাহায্য করার জন্য। অর্থনৈতিক সাহায্য। কিছুটা এই শিক্ষকর ভাতা, সৌর লণ্ঠনের সরঞ্জাম, বইপত্র। তবে টেকনিক্যাল সাহায্যই বেশি। শিক্ষকদের শিক্ষণ, সৌর প্রযুক্তি শিক্ষণ, গ্রন্থাগার চালানো...'

'গ্রন্থাগারও আছে এখানে?'

'ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার! ভ্যানরিক্সাতে।' হেসে উঠলেন হামিদজী, 'গ্রামে গ্রামে বই নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'আপনাকে বোধহয় বলা হয়নি...' রামকিশোরজী বললেন, 'এই বাচ্চারা এখন বড়দের শেখায়। এরা মুখোশ পরে নৌটঙ্কি করে দেখায় কি করে সামাজিক কু-সংস্কারকে জয় করা যায়।'

বিদ্যুৎহীন রাতের অন্ধকার ঘিরে ধরেছে আমাদের। এখনও চাঁদ ওঠেনি। গাড়ির হেডলাইটের আলোচেরা পথের দু'পাশে মাঠ-ঘাট সমস্ত এখন একাকার।

পাশে বসা রামকিশোরজী বললেন, 'কাল কি করছেন,...চলুন চল্লিশ কিলোমিটার দূরে বাল্মীকি বন আছে, মন্দির আছে সেখানে, আপনাকে দেখিয়ে আনব,...ঐতিহাসিক স্থান, তীর্থস্থান।'

আমি চুপ করে রইলাম।

তীর্থদর্শন তো এখানেই হয়ে গেছে আমার। সে তীর্থ মানবতীর্থ। আর কোনও তীর্থে প্রয়োজন নেই। আর ইতিহাস? নতুন ইতিহাসও এখান থেকে কোনও না কোনও দিন উঠে আসবে।

*ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য*

# সুন্দরবনের আতঙ্ক

## অসিত দলপতি

সুন্দরবনের প্রকৃতি ঘন-অরণ্যে সমৃদ্ধ— সুন্দরী, গরাণ, হেঁতাল ইত্যাদি গাছে ভরা, দূর থেকে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। এর অন্তস্থল বড় ভয়ঙ্কর—ডাঙায় যেমন রয়েল বেঙ্গল ও বিষধর সাপ, জলেও কুমির, কামট ইত্যাদি ওত পেতে রয়েছে--পদে পদে বিপদ, সামান্য অসাবধানতায় মৃত্যুও ঘটতে পারে। এই রকম পরিবেশে বাঁচার তাগিদে মানুষ সকল বিপদ ও জীবনহানিকে উপেক্ষা করে কাঠ, মধু বা মাছ ধরতে চলে সুন্দরবন এলাকায়। লড়াই কেবল বাঁচার।

সামুদ্রিক নোনা জলের ভিন্নস্বাদের মাছ, কাঁকড়া, মধু, জ্বালানি কাঠ এদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির আর অথৈ বঙ্গোপসাগরের কূলে অসংখ্য বিন্দু বিন্দু ঘন বনের জঙ্গলে রাজার ডেরা। ভাবলে বা দেখলে গা শিউরে ওঠে। বাঘের পেটে জীবনহানির ঘটনা তো নতুন কিছু খবর নয়। বনবিবি তথা দক্ষিণ রায় এ অঞ্চলে সর্বত্র বীরবিক্রমে দাপিয়ে বেড়ায়। কেউ কেউ পুজো দিয়ে আবার কেউ বা মানত করে দিনের প্রথম যাত্রা শুরু করে। কেউ লাভের অঙ্ক ঘরে তোলে, আবার কেউ জঙ্গলেই জীবন শেষ করে। বিধাতার বিচিত্র খেয়াল। তা সত্বেও অসীম সাহসে বুক বেঁধে এখানকার শ্রমজীবী মানুষ নদী ও জঙ্গলকেই জীবনধারণের হাতিয়ার করেছে।

এ অঞ্চলে বেশ ক'দিন ধরে বাঘের আক্রমনের সীমাটা বাড়ছিল। গ্রামবাসীদের দিন-রাতের ঘুম প্রায় চলে গেছে। সজনেখালির এই অ্যানপুর, বীরপুর, দেবীপুর মাঠের ডাঙা গহীন জঙ্গল আর নদী ঘেঁষা গ্রামগুলিতে বাঘিনীর তাণ্ডবে সবাই দিশেহারা। জ্যৈষ্ঠের এক মধ্যাহ্নে গণপতি মণ্ডলের বছর ষোল বয়সী মেয়ে শ্যামলী নদীর ধারে মাঠে ছাগল বাঁধতে গিয়ে বাঘের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে মূর্চ্ছা যায়। পাশের ক্ষেতে চাষ করছিল বিনোদ মাইতি, বাঘের ডাকে সেও চমকে ওঠে এবং মেয়েটিকে নদীর ধারে পড়ে যেতে দেখে দৌড়ে এসে নিরাপদে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

মাসখানেক পর আষাঢ়ের এক সন্ধ্যায় বিভূতি জানা দিনের কাজের শেষে দাওয়ায় বসে মুড়ি কাঁচালঙ্কা সহ জলযোগ সারছে, হ্যারিকেনটা পাশে রাখা। ছোট্ট মেয়ে অষ্টবালা পাশে বসে বইয়ের-পড়া পড়ছিল। হঠাৎ বাইরে একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ। টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোটা তুলে ধরেই অবাক, একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিউলি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে! মেয়েটাও দেখতে পেয়েছে বাঘটাকে, দেখেই চিৎকার চেঁচামেচি। আশে পাশের বাড়ির লোকজনের তাড়া খেয়ে বাঘটা পালায়।

এরপর একদিন তারিণী সামন্তর গোয়াল ঘরে দিনের বেলা ঢুকে পড়ে মোটাসোটা একটা বাঘ। চারদিকে হইহই কাণ্ড। লোকজন ডেকে লাঠি সোঁটা নিয়ে মারার চেষ্টা করলে প্রাণে বাঁচতে বাঘটা নদী সাঁতরে জঙ্গলে পালায়।

বীরপুর গ্রামে ভর-দুপুরবেলায় মাছ, কাঁকড়া ধরে বাড়ি ফিরছিল বাসন্তী বারুই, সোমা খাঁড়া, করুণা দাস আর কিছু কচিকাঁচা। পথে একটি গর্ভবতী বাঘিনী শুয়ে, ওরা এগোতে সাহস পাচ্ছে না। গ্রামে খবর গেলে কিছু মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে আসে মারতে। ভীষণ তাড়া খেয়ে বাঘিনীটা একটি বড় খেজুর গাছে উঠে পড়ে। নামতে পারছে না। গাছের তলায় লাঠিসোটা হাতে লোকজন দাঁড়িয়ে। এদিকে বনদপ্তরে খবর যায়। খবর পেয়ে বড়কর্তা অতনুবাবু লোক-লস্কর নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে অসেন। সঙ্গে নানাবিধ বাঘ ধরার জাল ও শক্ত দড়ি, বন্দুক ইত্যাদি। খেজুর গাছের নিচে ঝোপ আর কচুরি পানার বড় পুকুর। জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয় চারপাশটা। জালের দুই দিকে নিমাই হাতি, খোকন সাঁতরা, বিমল বেরা ও আরও অনেকে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। গ্রামের সাহসী বলে খ্যাত হেম নস্কর একটি মোটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঘের পায়ে বেঁধে দেয়। তারপর নিচে নেমে দড়ি ধরে সবাই টানাটানি করে। বাঘটা গর্জন করতে করতে গাছ থেকে লাফ দিয়ে পুকুরের এক

কোণে পড়ে যায় এবং জালে মাথা গুঁজে দেয়। হঠাৎ হেম নস্করের অসাবধানতায় কনুইয়ে থাবা বসিয়ে দেয় বাঘটা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে হেম নস্কর। অঝোরে রক্ত ঝরছে, সঙ্গে সঙ্গে ধরাধরি করে নিকটবর্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করা হ'ল। বাড়িতে শোকের ছায়া। এদিকে ঘাতক বাঘিনীটা অবশেষে ধরা পড়ে এবং বনদপ্তরের অফিসাররা তাকে খাঁচায় বন্দী করে নিয়ে যান।

এরপর গত আষাঢ়ের বিকেলে ঝড়খালির কানাই মণ্ডল তার নিজস্ব ডিঙি নৌকো নিয়ে সুধন্যখালি নদীতে জাল নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সঙ্গে তার স্ত্রী আর ছোট দুটো বাচ্চা। ডিঙি নৌকোটা একটি মোটা গরান গাছে বেঁধে মাছ ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল কানাই। তার স্ত্রী মালতী কাঁকড়া খুঁজছে, পাশে কোলের বাচ্চা দুটো। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বাঘের গর্জন, সবাই ভয়ে তটস্থ! তাকিয়ে দেখে নৌকো থেকে পনেরো-কুড়ি ফুট দূরে হলুদ-কালো ডোরার গুটিগুটি পায়ে আগমন। বাঘের গর্জনে মালতী বাচ্চা দুটোকে কোলে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে নৌকোর গলুইয়ে চট-কাঁথার তলায় লুকিয়েছে। সুযোগ বুঝে কানাই মণ্ডলকে ধরে কোমরে পিঠে থাবা বসিয়েছে বাঘটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। নৌকার গলুইয়ের ভিতর থেকে লুকিয়ে থাকা মা ও বাচ্চা দুটো বাঘের সঙ্গে কানাইয়ের মরণপণ যুদ্ধ দেখে ভয়ে তটস্থ। বাঘে মানুষের এক ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের দৃশ্য। দেহে প্রাণ থাকতে কেউ কাউকে ছাড়তে নারাজ। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে কোনওরকমে নৌকোর কাছে চলে এসে নৌকো থেকে সরু একটা বাঁশ

নিয়ে বাঘকে আক্রমণ করে কানাই। সুযোগ বুঝে বাঘের গালের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় বাঁশটা। নিরুপায় বাঘটা গর্জন করতে করতে বনের ভেতর দৌড়ে পালায়। এই সুযোগে কানাই মণ্ডল ডিঙিনৌকোর বাঁধন খুলে স্ত্রী ও বাচ্চা দুটোকে নিয়ে সেখান থেকে দূর চলে আসে। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসে বাঘটা। ততক্ষণে ওরা বাঘের নাগালের বাইরে। কানাইয়ের নৌকোটাকে আসতে দেখে এবং তাদের হাঁকডাকে আশেপাশের নৌকোর মাঝিরা ছুটে আসে। কোনও অপেক্ষা না করে তারা নিয়ে গেল কানাইকে হাসপাতালে, দ্রুত তার চিকিৎসার প্রয়োজনে।

খরস্রোতা, এঁকেবেঁকে চলা দীর্ঘ নদী গোমর। নদীর ওপারে সজনেখালির ব্যাঘ্র প্রকল্প। আবার এই নদীতে ভয়ঙ্কর কুমির কোমটের আস্তানা, একটু অসাবধান হলেই জীবনহানি। মাত্র ক'দিন আগে গোমর নদীর কাছে সুধন্যখালি, হেতমপুর, কন্যানগর, মিঠেপুর, গোসাবা, রাঙাবেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে হঠাৎ বাঘের হানা। গ্রামবাসীদের খাওয়া-দাওয়া রাতের ঘুম চলে গেছে আতঙ্কে। খবর যায় সরকারী বনবিভাগের দপ্তরে, খবর পৌঁছনো মাত্রই দপ্তর থেকে পঁচিশ জনের একটি টিম পাঠানো হ'ল ওই এলাকায়; সঙ্গে বাঘ ধরার জাল, খাঁচা, ত্রিপল, ঘুমপাড়ানি বন্দুক, দূরবীন, দু-তিনটে হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠা ইত্যাদি। বনদপ্তরের বড়বাবু মিঃ বিশ্বাসের তদারকিতে ফাঁদ পাতা হল। বনদপ্তরের লোকেদের আনা দু'টি খাঁচায় দুটো পাঁঠা বেঁধে টোপ তৈরি করে ফাঁদ দুটো রাখা হ'ল উপযুক্ত জায়গায়। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাঘ তো ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হল পাঁঠার লোভে, এবং সঙ্গে সঙ্গে খাঁচায় বন্দী। বন্দী বাঘ হিংস্র হয়ে ওঠে, তার গর্জনে চারদিকে কম্পমান। ছুটে আসে দূরে অপেক্ষায় থাকা বিলাস মুর্মু, গোবিন্দ খাঁড়া, পঞ্চানন দাস ও গ্রামবাসীরা। বেশ কিছুক্ষণ হুঙ্কার ছেড়ে আস্তে আস্তে একটু শান্ত হয় এবং পাঁঠার লেজের দিকের অবশিষ্ট অংশ খেতে শুরু করেছে বাঘটা। এবার বোঝা গেল সেটা বাঘ নয় বাঘিনী। লোকজন খাঁচার দিকে এগোলেই ভয়াল হুঙ্কার! কিছুতেই থামানো যায় না তাকে। শেষমেষ মিঃ বিশ্বাস ঘুমপাড়ানি বন্দুক ফায়ার করে বাঘিনীটাকে ঘুম পাড়িয়ে পরীক্ষা করেন—বাঘিনীটার পিছনের পা জখম, রক্ত জমাট বেঁধে আছে তার পায়ে। যথারীতি এর চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেন। এরপর বড়নৌকোয় খাঁচাটা তুলে বনকর্মীরা কয়েকটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে নদীতে জোয়ারের আশায়। চারটে ভুটভুটি ও কয়েকটা বড় নৌকোর ব্যবস্থা আগেই করে রাখা ছিল। কিছুদিন পর বাঘিনীটাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে আবার সুন্দর বনের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে সরকারী দপ্তরের লোকেরা।

জঙ্গলের সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণী এই বাঘ। এরা সাধারণত লোকালয়ে আসে না, বা মানুষখেকোও হয় না। চোরা শিকারীদের উপদ্রব, নিজেদের মধ্যে লড়াই বা কোনও শিকারের সময় আহত হয়ে তবেই বাঘ হিংস্র হয়, এবং নদী সাঁতরে লোকালয়ে চলে আসে, মানুষকে আক্রমণ করে। নিজেরা আহত না হলে লোকালয় এড়িয়ে চলে। বর্তমানে এই প্রজাতির যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সরকারীভাবে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী দপ্তর থেকে মাঝে মাঝেই জঙ্গল সার্ভে করা হয়। নানাভাবে এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলছে। এই ভাবে নজরদারীর ফলে চোরা শিকারীদের উপদ্রব অনেকটা কমেছে। তবুও ভয়ঙ্কর সুন্দর এই প্রাণী এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। ওরা নিরাপত্তা পেলে তবে সুন্দরবনের শ্রমজীবী মানুষও নিরাপদে থাকবে।

*ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য*

# মেঘাবরোধ

সমীরণ বিশ্বাস

বিজয় কেতন উড়িয়ে দিয়ে রোদ
মেঘের পথে চলছে অবরোধ
সারা আকাশ ফাঁকায় ফাঁকায়
ঘামটা মুছে উপর তাকায়
কে জানে কোন কৃত কর্মের
চলছে প্রতিশোধ
মেঘেরা সব আটকে পথে, চলছে অবরোধ।

ঘাম প্যাচ প্যাচ ঘামাচিদের চলেছে উৎসব
দাওয়ায় বসে ঝিনুক দিয়ে পুটুস পাটুস রব।
শুধু যারা ঠাণ্ডা ঘরে
ঠাণ্ডা চাকার গাড়ি চড়ে
হয়তো ওদের, এ মাহাত্মের হয় না অনুভব
সারা গায়ে ঘামাচিদের চলেছে উৎসব।

ঘরের থেকে বাইরে আসি আবার ফিরি ঘরে
ক্লান্ত দেহ শান্ত না হয় ঘাম ঝর ঝর ঝরে
জ্যৈষ্ঠ শেষ, নেই কোথা জল
এল আষাঢ় আশা বিফল
নাকের জলে চোখের জলেও ঘামের জল পড়ে
হাঁফিয়ে উঠে বাইরে আসি আবার ফিরি ঘরে।

# ভূতের বাসা

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

গা ছম ছম সন্ধ্যাবেলা
রাত দুপুরে ভয়
ভূতের সাথে পেত্নি নাকি
তখন কথা কয়।

নিমের ডালে তালের মাথায়
নাকি সুরের গান
হানাবাড়ির বন্ধ ঘরে
কাদের কলতান?

ভূত পেত্নির বাসা নাকি
অন্ধ ঘরের কোণে,
আসল কথা ভূতের বাসা
সব ভীতুদের মনে।

# বাড়ি বিপাক

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

খতখুঁতে তার স্বভাবটা যে, তাই তো ভাড়াবাড়ি
অনেক খুঁজে হয়তো মেলে, ছাড়েন তাড়াতাড়ি।
হয় না আপোষ, সয় না কিছুই অল্পেতে যান রেগে
হঠাৎ বাড়ি পছন্দ হয়, ছাড়েন দ্বিগুণ বেগে।
মোড়ের মাথায় সেদিন দেখা, শুধাই ব্যাপারটা কি
মনের মতো অনেক বাড়ি, পছন্দ হয় না কি?
মুখটি করে সিদ্ধ ছোলা, বলেন আশু পিসে
একলা মানুষ থাকার আমার সমস্যাটা কি সে।
শ্যামবাজারে একটা বাড়ি পেলাম মনের মতো
হপ্তা গেলেই বুঝতে পারি সমস্যা তার কতো।
পাল্লা দিতে হল্লা তুলে দুই বোনে দুই বেলা
হাড়ের ভেতর কাঁপন জাগায় বিষম গানের ঠ্যালা।
শেয়ালদাতে তারপরে যেই ছোট্ট বাড়ি পেলাম
বাবরি চুলো বাড়ির মালিক লম্বা জানায় সেলাম।
পদ্য লেখার বাতিক ছিল, সদ্য পেয়ে আমায়
সকাল দুপুর বিকেল রাতে কাব্য সে কি থামায়?
তাইতো হলো হুপিং কাশি আঁচিল বেরোয় নাকে
ভর দুপুরে সটকে পড়ি কখন যে এক ফাঁকে।
ঠিক করেছি ঝুঁকব না, আর ভাড়াবাড়ির টানে
আশ্রমেতেই থাকব এখন হোক না সে বাগনানে।

# সৃজনে ফুলে আলপনা

কনক ঠাকুর

কে রাঙালো শিমুল পলাশ লাল কে গুলে
পথ চেয়ে কার আলপনা দেয় সজনে ফুলে?
স্বপ্ন তুলি বুলিয়ে বাতাস লিখছে চিঠি
বসন্তকে আনতে গেছে মৌলি মিঠি।

আকাশমণির পাতায় পাতায় পাগল হাওয়া
উদাস করা বাউল নদীর কী গান গাওয়া
সেই সুরে আজ সু-স্বাগতম বসন্তকে
পরিয়ে দেবো সবুজ রঙের বসন তোকে।

*ছবি: রাহুল মজুমদার*

# কেন যুদ্ধ চাই না

রমেন গাঙ্গুলী

## আজব মানুষ

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা গ্রাম। গাঁয়ের পুরুষরা সবাই গেছে যুদ্ধ করতে। ফিরল না তাদের বেশিরভাগই। অল্প ক'জন যারা ফিরে এল তারা কেউই আর গোটা মানুষটি নেই। একজনের মুখের একটা দিক উড়ে গেছে বিস্ফোরণে। টিনের ওপর রঙ করা মুখোশ পরে থাকে সে। দুটো হাতই কাটা গেছে একজনের, আর একজনের গেছে পা দুটো। দুটো চোখের একটাও যার নেই সে পরে থাকে রঙীন একটা চশমা। এক হাত, এক পা বা এক চোখ নেই এমন আছে বেশ কয়েকজন।

এরা সবাই কিছু না কিছু রোজগেরে কাজ করে। চলে ফিরে বেড়ায় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, হেলেদুলে নানা কায়দায়। যেন বিচিত্র সব খেলনা দম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদের সঙ্গে খেলাধুলো করে বেশ মজায় আছে একটা তিন বছরের বাচ্চা—ওরা-ও রঙ্গ তামাশা করে বাচ্চাটার সঙ্গে। মা জানে এদের জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্তে তার আঁধার ঘরের মাণিককে রেখে ঝর্ণার জলে কাপড় কাচতে যাওয়া যায়। তা যায়ও রোজই।

একদিন হয়েছে কি বাচ্চাটা ঝর্ণার ধার দিয়ে দিয়ে চলে এসেছে গাঁ ছাড়িয়ে অনেক দূরে একা একাই। পৌঁছে গেছে যেখানে জল জড়ো হয়ে, হয়ে উঠেছে একটা পুকুরে। সেখানে ভিনদেশী এক জোয়ান ছেলে মনের আনন্দে চান করছিল।

বেশ খানিকটা দূরে এক গাছের আড়াল থেকে বাচ্চাটা তাকে অবাক হয়ে দেখল। চান সেরে সে রেখে গিয়েছিল তার জামাকাপড়।

বাচ্চাটা দেখল ছেলেটির আছে গোটা দুটো হাত, পা, চোখ, কান চোয়াল। ছেলেটাও দেখল বাচ্চাটাকে। এগিয়ে এসে আদর করে তার হাতে ধরিয়ে দিল এক চাকা চকোলেট।

বাচ্চাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল—মা ছিল কাছে ভিতেই। ছুট্টে এসে তাকে কোলে তুলে শান্ত করল।

বিব্রত হয়ে ছেলেটি শুধাল, 'আমায় দেখে ও অমনি করে কেঁদে উঠল কেন?'

'তোমার মতো একজন গোটা মানুষ জন্মে অবধি দেখেনি। তাই ভারি ভয় পেয়েছে।' সলজ্জ উত্তর মায়ের।

*মূল গল্প : ফ্যানি কেম্বল জন্‌সন্*

## বার্লিনে

ট্রেনটা সবে ছেড়েছে বার্লিন স্টেশন থেকে, শহরসীমা পেরোয়নি। তাই এখনও চলছে ধীরেই। যাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সবল পুরুষ মানুষ নেই বললেই হয়। প্রায়ই সবাই হয় শিশু নয় তো মহিলা।

একটা কামরায় বসেছিলেন স্থূল সেনার পোষাক পরা এক বৃদ্ধ;তাঁর পাশে একজন রোগা পাতলা প্রৌঢ়া।

যাত্রীদের কলগুঞ্জন আর ট্রেনের কলকব্জার আওয়াজ ছাপিয়ে সকল যাত্রীর কানে পৌঁছেছিল সেই প্রৌঢ়ার ক্রমাগত তিনটি সংখ্যা গোণার শব্দ: এক -দুই-তিন। আপনমনে যন্ত্রের মত গুণেই চলেছেন: এক-দুই-তিন।

দু'জন কমবয়সী মেয়ে এটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হালকা মেজাজে কিছু মন্তব্য করল। একজন বয়স্ক যাত্রী তাদের দিকে কটমট করে তাকাতে তক্ষুণি তারা চুপ করে গেল।

এসবে ভ্রুক্ষেপ নেই প্রৌঢ়ার। আবার গুণলেন : এক-দুই-তিন। এবার মেয়ে দুটো খিল খিল করে হেসে উঠল। পাশে বসা বৃদ্ধ সৈন্যটি তাদের দিকে একটু ঝুঁকে স্থির গলায় বললেন, 'যদি বলি এই মহিলা আমার স্ত্রী সুস্থ নন, তাহলে কি মেয়েরা তোমাদের হাসি থামবে? অল্প দিন হল আমাদের তিন ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে। এবার আদেশ এসেছে আমার জন্য, আবার যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। তাই যাবার আগে আমার স্ত্রীকে উন্মাদাগারে রেখে দিতে যাচ্ছি। এক নিদারুণ অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল সেই কামরায়।

*মূল গল্প : মেরী বয়েল ও'রিনি*

*ছবি : রাহুল মজুমদার*

# যে ছেলেটি উড়তে চেয়েছিল

## শিবানী রায়চৌধুরী

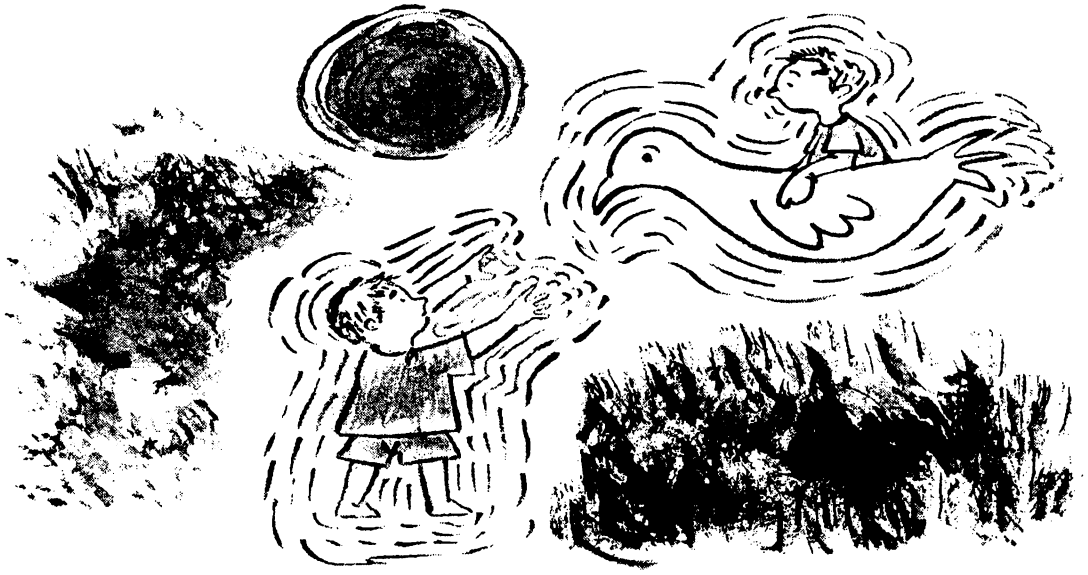

পাঁচশো বছর আগের কথা। তখন আকাশে এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, স্পেস শিপ কি হট-এয়ার-বেলুন কিছুই দেখা যেত না। আকাশটা ছিল পাখিদের দখলে। ঈগল, চিল, শকুন, গাঙচিল, কাক, বক, পায়রা, শালিখ, চড়ুই আকাশ জুড়ে উড়ে বেড়াত। দশ বছরের জিনো আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবত মানুষ কি কখনও পাখির মতো আকাশে উড়ে বেড়াতে পারবে?

জিনোর বাড়ি ছিল ইতালির মিলান শহরে। জিনো ছবি আঁকা শিখেছিল। জিনোদের ছবিআঁকার ইস্কুলের দাড়িওয়ালা মাস্টারমশাই একটা অসাধারণ জিনিসের স্বপ্ন দেখতেন। জিনোকে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'জিনো, একদিন লোকে মেঘের মধ্যে ডানা মেলে উড়ে যাবে। আর নিচের দিকে চেয়ে পৃথিবীটা দেখবে। চেষ্টা করলে সব কিছুই সম্ভব!'

সেই জাদুকরের মতো দাড়িওয়ালা মাস্টারমশাইয়ের আশ্চর্য সব স্বপ্ন ছিল। তিনি ছিলেন একজন মহান শিল্পী। নাম লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি।

জিনো লিওনার্দোর স্টুডিওতে কাজ শিখছিল। লিওনার্দো ছবি আঁকতেন, পাথরে খোদাই করে মূর্তি বানাতেন আর সময় পেলে লিখতেন। খুব ভালো অঙ্ক কষতে পারতেন। লিওনার্দো একটা নোটবই -এ তাঁর সব কল্পনা লিখে-এঁকে রাখতেন। অনেক সময় জিনোকে নোটবইটা দেখাতেন। জিনো অবাক চোখে দেখত নোটবইয়ের পাতা থেকে হাজার হাজার কল্পনা উপচে পড়ছে।

জিনো লিওনার্দোর কথা মন দিয়ে শুনত। লিওনার্দো বলতেন, 'জিনো, আমরা সবকিছু বোঝার আর জানার চেষ্টা করব।'

'কেমন করে আমাদের জন্ম হয়?'

'কেমন করে গাছপালা বেড়ে ওঠে।'

'কেমন করে গ্রহ-উপগ্রহ মহাশূন্যে ঘোরে?'

'আর কেমন করে একদিন মানুষ পাখির মতো আকাশে উড়তে পারবে?'

জিনো কোন বইতে এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেত না। লিওনার্দোর স্টুডিওর একটা ঘরের দরজা সবসময় বন্ধ থাকত। লিওনার্দো ছাড়া আর কেউ সে ঘরে ঢুকতে পারত

না। লিওনার্দো সেখানে গভীর চিন্তা করতেন।

জিনোর খুব ইচ্ছে করত ওই বন্ধ স্টুডিওতে ঢুকে দেখতে। জানতে চাইত ওই স্টুডিওর ঘরে কি আছে? জিনো ভাবত হয়তো একটা পাথরে খোদাই করা দারুণ সুন্দর মূর্তি আছে। হয়তো বা লিওনার্দো লুকিয়ে লুকিয়ে একটা যুদ্ধের মেশিন তৈরি করছেন।

জিনো লিওনার্দোর স্টুডিওতে সারাদিন অনেক কাজ করত। রঙ গুলত, রঙের ব্রাশ ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে রাখত। আবার ছবি আঁকা প্র্যাকটিশ করত।

জিনো আপন মনে বলত, 'বড় হয়ে আমি নিজের স্টুডিও করব। সেখানে একটা তালা বন্ধ ঘর থাকবে। কেউ সেখানে ঢুকতে পারবে না—একমাত্র আমি ছাড়া।'

লিওনার্দো হেসে বলতেন, 'জিনো, তুই একদিন নিশ্চয়ই নিজের স্টুডিও বানাতে পারবি।'

লিওনার্দোর মতো দয়ামায়া খুব কম লোকেরই ছিল। যদি কখনও অসুস্থ জন্তু কি পাখি দেখতেন, তাকে বাড়ি নিয়ে আসতেন। ছাত্রদের বলতেন, 'এটাকে সুস্থ করে তোল।'

লিওনার্দো একদিন একটা খুব দুরন্ত ছেলেকে টানতে টানতে স্টুডিওতে নিয়ে এলেন। ছেলেটা লিওনার্দোর সঙ্গে হাতাহাতি করছিল। লিওনার্দোকে লাথি মারছিল, থু-থু করে পায়ে থুথু ফেলছিল।

জিনো তো অবাক ছেলেটার কাণ্ড দেখে। লিওনার্দোকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা আবার কে? কোথা থেকে এল?'

লিওনার্দো হেসে বললেন, 'এ একটা দস্যি ছেলে। একেবারে বুনো জন্তু।'

ছেলেটা কোনওদিন ইস্কুলে যায়নি। ওর মা এত গরীব যে ওকে খেতে দিতে পারত না। দেখাশোনা করার ক্ষমতা ছিল না। ওর মা লিওনার্দোর হাতে-পায়ে ধরে বলেছিলেন, 'ওকে একটু কাজকর্ম শিখিয়ে মানুষ করে তুলুন, নইলে কোন দিন জেলে যাবে।'

সেই দস্যি ছেলেটা লিওনার্দোর হাতটা খামছে ধরে খুব জোরে এক কামড় দিল। লিওনার্দো রাগের ভান করে বলেছিলেন, 'আমি তোকে দানো বলে ডাকব। তুই একটা ছোট্ট দানব। এখন থেকে জিনোর বন্ধু দানো।'

তখন থেকে দানো লিওনার্দোর স্টুডিওতে থেকে গেল। এই দুষ্টু ছেলেটাকে সবাই ভালোবাসতে শুরু করল। লিওনার্দো বললেন, 'দানো, তুই এইসব ছেঁড়াতেনা কাপড় পরতে পারবি না। আমি তোকে ভেলভেটের স্যুট আর চামড়ার জুতো কিনে দেব। লিওনার্দো তারপর এদিক ওদিকে কী যেন খুঁজতে লাগলেন, 'আমার মানিব্যাগটা কোথায় রাখলাম? কোথায় গেল আমার মানি ব্যাগটা?'

সবাইমিলে চারদিক তচ্‌নচ্‌ করে খুঁজল, কিন্তু মানিব্যাগটা পাওয়া গেল না। শেষকালে জিনো দানোর ছেঁড়া নোংরা কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগ খুঁজে পেল। জিনো বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে দানোর এত সাহস যে লিওনার্দোর পকেট থেকে মানিব্যাগ চুরি করল। দিনের পর দিন লিওনার্দো নানারকম জিনিস আবিষ্কার করতে লাগলেন—

প্যারাস্যুট
দু-চাকার সাইকেল
সাঁতার কাটার লইফ বেল্ট
ডাইভিং স্যুট
কাঁচ কাটার আর পালিশ করার যন্ত্র।

নিজের জন্যে এক জোড়া চশমা বানালেন। তারপর একদিন একটা ঘোড়ার মুখ-ওয়ালা রূপোর বাজনা বানালেন। জিনো বিস্মিত হয়ে দেখত।

একদিন লিওনার্দো জিনোকে নিয়ে বাজারে গেলেন। বাজারে একটি মেয়ে ছোট ছোট খাঁচায় পাখি বিক্রি করছিল। লিওনার্দো পাখিগুলো দেখলেন। তারপর জিনোকে অবাক করে দিয়ে সব পাখিগুলো কিনে ফেললেন। কিন্তু লিওনার্দো পাখি বাড়ি নিয়ে পোষার কথা ভাবলেন না। জিনোকে বললেন— সব খাঁচার দরজাগুলো খুলে দিতে। সবাই তাকিয়ে দেখল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিগুলো খাঁচা থেকে উড়ে গেল। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। লিওনার্দো বললেন, 'পাখি খাঁচায় থাকবে কেন? স্বাধীনভাবে আকাশে উড়ে বেড়াবে। জিনো দ্যাখ, পাখিরা কেমন ডানা দিয়ে হাওয়ার গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওদের উড়তে দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলছে।'

লিওনার্দো বাড়ি ফিরেই সেই স্টুডিওতে ঢুকে তার দরজা খিল তুলে দিয়ে কাজে লেগে গেলেন। জিনো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে হাতুড়ি পেটার আর করাত দিয়ে কাটার শব্দ শুনতে পেল। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল। জিনো বাইরে অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু লিওনার্দো নাওয়া-খাওয়ার জন্য বেরিয়ে এলেন না। জিনো ভাবল লিওনার্দো

নিশ্চয়ই আশ্চর্য কোনও কিছু তৈরি করছেন। স্টুডিওর বাইরে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সিঁড়ির ধাপে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল জিনো।

লিওনার্দো একদিন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মহিলার রঙিন ছবি আঁকতে শুরু করলেন। মহিলা সপ্তাহের পর সপ্তাহ চুপ করে বসে থাকতেন। একটুও নড়াচড়া করতেন না। মহিলা যাতে চুপ করে বসে থাকতে বিরক্তবোধ না করেন তার জন্য লিওনার্দো গায়ক, বাদ্যকর আর দড়ির ওপর খেলা দেখানোর বাজিকরকে পয়সা দিয়ে রেখেছিলেন। ছবিটা ভীষণ সুন্দর দেখতে হয়েছিল। তাঁর এই ছবির মহিলার মুখে ছিল রহস্যময় হাসি। জিনো ভাবছিল মহিলা হয়তো গোপন কিছু জানেন। হয়তো বা তালা বন্ধ ঘরের ভিতরটা দেখতে পেয়েছেন।

আর জিনো চেয়ে চেয়ে দূরে ঘুমন্ত পাহাড় আর আঁকাবাঁকা নদীর দিকে চেয়ে ভাবত এমন নিখুঁত করে আর কেউ আঁকতে পারবে না। হঠাৎ দানো এসে জিনোর পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে জিনোর কানে কানে বলল, 'জিনো, আমার সঙ্গে আয়। তোকে ওই মহিলার ছবির চেয়েও আশ্চর্য জিনিস দেখাব।'

দানো জিনোকে নিয়ে সেই তালাবন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে একটা বড় চাবির গোছা বের করল। চাবির গোছাটা দেখে জিনোর দম বন্ধ হয়ে এল, 'জিনো, তুই চাবির গোছা চুরি করে এনেছিস? লিওনার্দো জানলে তোকে তাড়িয়ে দেবেন। তুই আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবি।'

দানো শুধু হেসে দরজার তালা খুলে দিল। জিনো ভাবছিল ওর এখনই লিওনার্দোর কাছে ফিরে গিয়ে সব জানানো উচিত। কিন্তু তালাবন্ধ ঘরের ভিতরে কি আছে জানার কৌতূহল ছিল অনেক বেশি।

ঘরে ঢুকে জিনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। একটা অসাধারণ যন্ত্র ঘরটাকে ভরে ফেলেছে। বিশাল ঈগলপাখির মতো তার ডানা।

দানো গম্ভীর গলায় জিনোকে আদেশ করল, 'এখন এই যন্ত্রটাকে বাইরে নিয়ে আসতে সাহায্য কর।' দানো আরও বলল, 'আমরা যদি লিওনার্দোর জন্য অপেক্ষা করি, আমরা কোনওদিনই আকাশে উড়তে পারব না।'

'দ্যাখ জিনো, যন্ত্রটার মধ্যে বসার জায়গাটা কত ছোট। বোধহয় তোর বসার জন্যে তৈরি হয়েছে। একমাত্র তুই এখানে বসতে পারবি। তুই আকাশে উড়ে বেড়াবি। তুই হবি পৃথিবীর প্রথম উড়ন্ত ছেলে!'

জিনো দানোর কানেকানে বলল, 'লিওনার্দো জানতে পারলে খুব চটে যাবেন।'

দানো চেঁচিয়ে বলল, 'তোকে স্টুডিওর মাথার ওপর উড়তে দেখলে আর চটবেন না। বরঞ্চ খুব খুশি হবেন। জিনো চটপট আমাকে সাহায্য কর।'

লিওনার্দো ওপরতলার ঘরে কাজ করছিলেন। তাই

কিছুই দেখতে পাননি। দানো আর জিনো ভারী যন্ত্রটাকে ঘর থেকে বের করে টেনে টেনে রাস্তায় নিয়ে এল। দূরে মাঠে নিয়ে ফেলল। দানো সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা দেখিয়ে

বলল, 'আমরা ওখান থেকে যন্ত্রটা ওড়ানোর চেষ্টা করব।'

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে, জিনো আর দানো পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছল। দানো জোর গলায় বলল, 'জিনো, যন্ত্রটার মধ্যে বসে পড়। তাহলেই হবে। যেই পেডাল করবি ওমনি ডানাদুটো উড়তে থাকবে।'

জিনোর একটুও যন্ত্রটার মধ্যে বসার ইচ্ছা ছিল না। ওর শরীর খারাপ লাগছিল। জিনো কেঁদে ফেলল, 'আমরা একটু অপেক্ষা করলেই পারতাম।'

দানো জিনোর কথায় কান দিল না। জিনোকে যন্ত্রটার সঙ্গে বেঁধে টানতে টানতে পাহাড়ের ধারে নিয়ে গেল। জিনো ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া বইল। দানো এক ধাক্কা দিতেই যন্ত্রটা মাটি থেকে ওপরে উঠে গেল। জিনো ভয়ে কাঁপছিল। নিচের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীটা দেখল। দেখতে দেখতে ও পাখির মতো উড়তে লাগল। নিচে দাঁড়িয়ে দস্যি ছেলে দানো গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল, 'যন্ত্রটা কাজ করছে! যন্ত্রটা কাজ করছে!'

যন্ত্রটাতে একটা গণ্ডগোল ছিল। পাখির মতো দেখতে যন্ত্রটার ওপর দিকটা বেশ ভারী। হঠাৎ যন্ত্রটা আর ওপরে উঠছিল না। জিনো পেডাল করল, এদিক ওদিক টানাটানি করল। কিন্তু যন্ত্রটা আর উঠল না। নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে লিওনার্দো মাঠের ওদিক থেকে দৌড়ে এলেন। জিনো যন্ত্রটার একটা দড়ি ধরে ঝুলছিল আর কাঁদছিল। যন্ত্রটা একটা গাছের গায়ে বেজায় ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেল।

লিওনার্দো দৌড়ে এসে জিনোর নেতানো শরীরটা ভাঙা যন্ত্রটা থেকে বের করে সাবধানে ওকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। দানো ওঁর পিছন পিছন মাথা নিচু করে হাঁটছিল। জিনোকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। জিনোর পা ব্যথা করছিল। মাথায় একটা বড় ব্যান্ডেজ--মাথা ধরেছিল।

লিওনার্দো ধরা গলায় বললেন, 'জিনো, দানো আমার কথা শোনে না জানি। কিন্তু তুই...?' আর কথা শেষ করলেন না। লিওনার্দো আবার শুরু করলেন, 'হয়তো আমারই ভুল। হয়তো মানুষ কোনওদিনই আকাশে উড়তে পারবে না। আমরা তো পাখি নই। এখন থেকে আমি শুধু ছবি আঁকব।'

জিনো ক্ষীণ গলায় বলল, 'না, একথা ব'ল না। মনে আছে, তুমিই আমাকে বলেছিলে একদিন মানুষ আকাশে উড়বে। সবই সম্ভব। আসলে যন্ত্রটা খুব ভারী ছিল, তাই পড়ে গেল। এই যা।'

লিওনার্দো জিনোর কথা শুনে এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর এক লাফ দিয়ে উঠলেন আনন্দে, এরপর দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বুঝেছি এবার। ডানা দুটো আরও লম্বা হওয়া উচিত ছিল। এই এতো খানি...।' দু'হাত দিয়ে দেখালেন। তারপর তিনি নোটবুক খুলে কাজে লাগলেন। খুব ধৈর্য্য ধরে আস্তে আস্তে একটা সুন্দর ছবি আঁকলেন, একটা নতুন যন্ত্রের ছবি—যা আগের চেয়েও অপূর্ব!

লিওনার্দো কাজ করছিলেন। ওঁর মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেছিল। যেন দূরে আগামী দিন দেখতে পাচ্ছিলেন--যখন জিনোর মতো ছেলেমেয়েরা মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাবে উড়োজাহাজে চড়ে। লিওনার্দো ভেবেছিলেন একদিন সবকিছুই সম্ভব হবে।

---

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবন বিষয়ে ছোটদের জন্য লেখা একটি ইংরাজি গল্পের ছায়া অবলম্বনে।*

---

*সম্পাদকের মন্তব্য : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেছিলেন এমন কোনও তথ্য নেই। কাহিনীটি পড়তে হবে নিছক গল্পরসের খাতিরে। (৩১ পৃষ্ঠার ছবিটি দা ভিঞ্চির ডাইরির পাতা থেকে নেওয়া।)*

*ছবি : সৌকর্য্য ঘোষাল*

# জয়-ধোনি

## অমিতাভ চৌধুরি

আরে বাপ্‌রে বাপ্‌ —
হাতে এল বিশ্ব কাপ;
অনেক খেটে খুটে,
জয়ী হলাম ক্রি-কেটে,
ফাইন্যালেতে লঙ্কাজয়,
দলের সবাই অকুতোভয়,
কাপ আনলো ধোনি বাহিনী,
ধন্য ধন্য তাঁর কাহিনী।
সেই তিরাশির পরে আবার
মুখে উঠলো মিষ্টি খাবার,

শচীন, বীরু আর যুবরাজ,
সেরে ফেললো আসল কাজ,
সাফ করলো ভিতর বাহির
হরভজন এবং জাহির
আমরা আবার বিশ্বসেরা,
দেশের ভালোবাসায় ঘেরা,
ব্যাটে বলে দাপট দেখাই
অন্য দেশকে খেলা শেখাই,
নাইডু, মার্চেন্ট, মুস্তাকের
চন্দ্রশেখর, বিশ্বনাথের
হাজারে, মাকড়, কপিলদের
বেদী, প্রসন্ন, গাভাস্কারের
আমরা তাঁদের বংশধর,
সবাই জয় ধোনি কর।

## অপূর্ব দত্ত

আটচল্লিশ ওভার শেষ, ঊনপঞ্চাশ শুরু
একশো একুশ কোটি লোকের বুকটা দুরু-দুরু।
ব্যাট করছেন যুবরাজ, আর ওই প্রান্তে ধোনি
এপ্রিলের দুই তারিখ সেটা, বারটা ছিল শনি।

বোলার কুলশেখর দিলেন প্রথম ডেলিভারি
পয়েন্টে বল ঠেলেই যুবি বললে—'কাম অন, হারি।'
চারটে মাত্র রান বাকি আর, সামনে ইতিহাস
কোথাও কোনও টুঁ-শব্দ নেই, উঠছে নাভিশ্বাস।

দ্বিতীয় বল, সামনে, ধোনি, একটা স্টেপ বাড়িয়ে
অবলীলায় উড়িয়ে দিলেন মাঠের সীমা ছাড়িয়ে।
প্রত্যেকে বাক্‌স্তব্ধ, কয়েক সেকেন্ড ঘোরের মধ্যে
কী রোমাঞ্চ! বোঝানো যায় এইটুকু এক পদ্যে!

পাখির মতন উড়ছে সচিন কোহলিদের কাঁধে
সকলের চোখ অশ্রুসজল, দুঃখ না, আহ্লাদে।
মনে পড়ছে তিরাশি-র জুন, লর্ডসের ব্যালকনি—
টিভি-র সামনে দু-বছরের মহেন্দ্র সিং ধোনি।

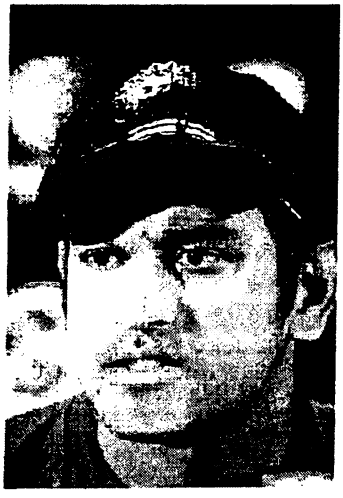

# গল্পের মজা : পাখিদের খোঁজা



মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

*( নিচের গল্পটিতে বেশ কয়েকটি পাখি লুকিয়ে রয়েছে—খুঁজে বার করতে হবে তাদের। এর মধ্যে আবার কয়েকটি পাখির সন্ধান মিলবে বাক্যের এদিক-ওদিক মিলিয়েও। খেয়াল রেখো সেটা। আর একটা কথা—গল্পটি লিখতে বসে দু-একটি বাংলা বানান সামান্য হেরফের করা হয়েছে পাখিদের চিনতে সুবিধে হবে বলে। মজার খেলায় এমনটা হয়েই থাকে। তাহলে আর দেরি নয়, গল্পটি মন দিয়ে পড়ে পাখিদের খুঁজে বার কর দেখি।)*

আমাদের পড়ার ঘরে খুব মশা। লিখতে বসেছি, মশাগুলো পায়ে যেন হুল ফোটাচ্ছে! আমার ভাই টুনটু নিজে থেকে কখনও পড়তে বসে না। মশারির মধ্যে পড়বে বলে বই নিয়ে গিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মুখ হাঁ। সবে রাত আটটা তখন।

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন বাবার এক বন্ধু। সুবল চন্দ না কী যেন নাম তাঁর। পরনে ধুতি আর ফতুয়া, কিন্তু পায়ে কোনও জুতো নেই—হাঁটু অবধি কাদা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি; পাগলাটে চেহারা। এককালে নাকি শিকার করতেন খুব। বন্দুক নিয়ে চলে যেতেন জলার ধারে কিংবা জঙ্গলে এমনকি চড়াই-উৎরাই পার হয়ে দূরের কোনও পাহাড়-পর্বতেও!

একবার খুব অসুখ হল তাঁর। নিমুনিয়া। জ্বরের ঘোরে কেবলই গেয়ে ওঠেন—'দিনগুলি মোর...'। গরমে সর্দিতে জ্বর আরও বাড়ল। ছট ফট করেন বিছানাময়। না ঘুম, না কিছু। দিনে যদিও নামে দু-পাঁচ মিনিটের লঘু ঘুম, রাত্রে একদমই নয়। চোখের কোলে কালি। একেবারে কাহিল অবস্থা। অথচ বকবকানির বিরাম নেই। গলার স্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই ভাবে কতদিন থাকা যায়?

সুবলকাকুর মেয়ে বুলবুলি খুব শান্ত। তাকে যতই বকো-ঝকো কিল-চড় মারো—একেবারে চুপচাপ। তার বন্ধু তিতি আমাদেরই ভাড়াটিয়া। তিতির বাবা মস্ত বড় কবিরাজ। তিনি পথ্য বলেদিলেন—দু'বেলা পুরোনো চালের হাঁড়ি চাঁচা নরম ভাত আর গোটা কয়েক সিদ্ধ করা জিওল মাছ। রাঙাকাকু বাজার থেকে নিয়ে এলেন সব কিছু। সামান্য ধনে শর্ষের তেলে ফেলে দিলেন আদার কুচি লবণ দিয়ে রান্না করে সাতদিন খাওয়ানো হ'ল। এই পথ্যেই সুবলকাকু সুস্থ হয়ে উঠলেন।

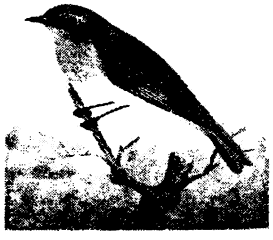



উত্তর :

১-শালিখ ২-টুনটুনি ৩-শারি ৪-হাঁস ৫-চন্দনা ৬-কাদা খোঁচা ৭-রক ৮-বাজ ৯-চড়াই ১০-মুনিয়া
১১-মোরগ ১২-ময়না ১৩-ঘুঘু ১৪-বক ১৫-বুলবুলি ১৬-কোকিল ১৭-টিয়া ১৮-তিতির ১৯-হাঁড়ি চাঁচা
২০-মাছরাঙা ২১-ধনেশ ২২-চিল

## অরুণ চট্টোপাধ্যায়

এই গল্প অনেকদিন আগের। তখন কোনও এক দেশে ছিল দুই বন্ধু। দুজনের পিঠেই ছিল মস্তবড় দুটো কুঁজ। একজন খুব সাদাসিধে, দয়ালু মানুষ। অন্যজন ঠিক তার উল্টো—হিংসুটে আর বদমেজাজী। সে কারও ভালো সহ্য করতে পারত না। তবু ওদের মধ্যে ভালোবাসার অভাব ছিল না। সব সময় ওরা একসঙ্গে থাকে, কেউ কাউকে ছেড়ে কাজে যায় না।

ওরা খুব একটা খাটাখাটনির কাজ করতে পারে না। পিঠে কুঁজ, তাই হাঁটাচলায় অসুবিধে, ভারী মালপত্র বইতে কষ্ট হয়। শরীরের কষ্ট তো আছেই, তার ওপর মনের দুঃখ—তাদের চেহারা নিয়ে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা সব সময় ঠাট্টা মসকরা করে। সে জন্য গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ের জঙ্গলে চলে যায় দু'জনেই। সেখানে সারাদিন ঘুরে বেড়ায় আর কাঠ কাটে। তারপর সন্ধের আগে ছোট্ট গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। একদিন নয়, দিনের পর দিন, প্রায় প্রতিদিন। হিংসুটে আর বদমেজাজী লোকটা কি করে জান? সে প্রায় রোজ একটা না একটা বাহানা হাজির করবেই। আজ খুব ক্লান্ত, কাল পিঠে ব্যথা তো পরের দিন বলবে, আজ আমার পা টনটন করছে, আমি একটু বিশ্রাম করি। তুমি আমার জন্য একটু কাঠ নিয়ো ভাই।

একদিন ভোরবেলা খারাপ লোকটা বলল বন্ধুকে, 'আজ ভাই আমার শরীরটা মোটেই ভালো নেই। তুমি একাই যাও কাঠ কাটতে, আজ না হয় দুজনের কাঠ তোমাকেই কাটতে হল, কাল আমি তোমার কাঠ কেটে দেব।'

ভালোমানুষ লোকটা জানে তার বন্ধু রোজই এক কথা বলে। কাল সে অন্য কোনও অজুহাত দেখাবে। এখন কী আর করবে সে, একা একাই ছোট্ট গাধাকে নিয়ে সে চলে গেল পাহাড়ের বনে। পিঠে কুঁজ নিয়ে এ-গাছ ও-গাছ করে শুকনো ডালপালা কাটতে কাটতে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। একটা গাছের গোড়ায় একটু জিরিয়ে নিতে বসেছে একটুক্ষণ। কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে ভালোমানুষ বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার।

সন্ধ্যা নেমেছে জঙ্গলে। পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়ে সূর্য টুপ্

করে ডুব দিয়েছে পশ্চিমে। এখন এই অন্ধকার পথে সে একা ফিরবে কেমন করে। তার গ্রামের বাড়ি তো এখান থেকে কম দূরে নয়। ডালপালার বোঝা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল। একটু দূরে ঝরণার ধারে গিয়ে একটা বড়সড় চওড়া শিলাখণ্ডের উপরে বসল ঝরণার শীতল জলে পা ডুবিয়ে। আঃ, কী আরাম! একটু ঝুঁকে চোখেমুখে কিছুটা জল ছিটিয়ে দিল। আঁজলা ভরে জল পান করল। ভালোমানুষের মন আরও ভালো হয়ে গেল। পাশে সমতল ভুঁয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

তখন গভীর রাত। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝিক্‌মিক্ করছে। হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। কোনও মানুষ না-কি কোনও জন্তু আশেপাশে বাসা বেঁধেছে? একটু পরেই তার ভুল ভাঙল। কানে ভেসে আসছে একটা গানের সুর। এমন কণ্ঠ, এমন সুমধুর সুরলহরী আগে কোনও দিন শোনেনি। এই গান মাটির মানুষের হতে পারে না। সে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল সেই গানের সুর লক্ষ্য করে। হঠাৎ তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল তীব্র আলোর ছটায়। সেদিকে তাকিয়ে দেখল ভালোমানুষ লোকটা, একদল পরী সেই অলোর বন্যা ঘিরে নাচছে, গান গাইছে—

'সোম, মঙ্গল, বুধে তিন
টইটম্বুর খুশির দিন...'

এই এক কথার গান, বার বার সুর করে তারা গাইছে। তাহলে পরীরা শুধু এই গানই জানে! ভালোমানুষ কাঠুরে ভাবল, এদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সে তখন আরও একটু এগিয়ে গেল, তখনই পরীরা তাকে দেখে ফেলেছে।

এক পরী বলল, 'ওহে পৃথিবীর মানুষ, এখানে কি চাও তুমি? আমাদের বিরক্ত করছ কেন?'

'কারণ আমি তোমাদের গানের সুর শুনে মুগ্ধ হয়েছি।' বলল কাঠুরে, 'এত মনোরম সঙ্গীত এর আগে আমি শুনিনি কোথাও। তবে একটা কথা কী জান, তোমরা একই পঙক্তি বারবার গাইছ। যদি এভাবে গান করো তো আরও ভালো হবে—

সোম, মঙ্গল, বুধে তিন
টইটম্বুর খুশির দিন
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি
ছয় বেহারার জয়ধ্বনি...

'ওঃ, দারুণ, চমৎকার!' আনন্দে আবার নেচে উঠল পরীরা। তারা খুব খুশি হ'ল। নাচ থামিয়ে দেখল তারা, ভালোমানুষ কাঠুরের পিঠে একটা মস্তবড় কুঁজ। এমন মানুষের এই দশা!

এক পরী বলল, 'তুমি হাঁটুমুড়ে বোসো তো একবার।'

কাঠুরে যেই বসেছে অমনি পরীদের রাণী একটা জাদুদণ্ড তার পিঠে ছুঁইয়ে দিল। অমনি কী অবাক কাণ্ড! তার অতবড় কুঁজ নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সে এখন সোজা ও শক্তসমর্থ এক যুবক।

সহসা পৃথিবী কেঁপে উঠল, প্রচণ্ড শব্দের ঝড় পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে পড়ল।

'মানুষখেকো দৈত্যরা আসছে এদিকে। তাড়াতাড়ি তুমি ওই গাছটায় উঠে লুকিয়ে পড়, আমরা চললাম আকাশে।' বলে পরীরা মেঘের আড়ালে চলে গেল। আর আগুনের জ্যোতিও মিলিয়ে গেল বাতাসে।

খুব তাড়াতাড়ি কাঠুরে গাছটায় উঠে ডালপালার ভিতর লুকিয়ে রইল। চোখের পলকে তিনটে কদাকার দৈত্য এসে সেই গাছতলায় এসে বসল। তারপর নিজেদের মধ্যে গল্প জুড়ে দিল।

'এবার বল, তোমার কথা। এই বছরে তুমি কী মহৎ কাজ করলে?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'এমন কিছু নয়, এই ধরো না গ্রামের সব লোককে আমি অন্ধ করে দিয়েছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!' বলল সে, 'আর তুমি, তুমি কী করেছ?'

এক দৈত্য বলল, 'ছোঃ, তোমার ওটা একটা কাজ হ'ল। আমি কী করেছি বলছি তাহলে। আমার রাজ্যে হইচই নেই, সবাই শান্ত, কেউ কথা বলতে পারে না। এমন কি শিশুরাও কান্না ভুলে গেছে!' দৈত্যরা একই সঙ্গে খুব জোরে জোরে হাসতে লাগল।

অন্য দৈত্য একটা বি-রা-ট হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'ভালো, খুব ভালো। একজন সবাইকে অন্ধ বানিয়েছে, আর এক বন্ধু গ্রামের সবাইকে বোবা করে দিয়েছে। আমি কী করেছি জান? আমার প্রজাদের সম্পূর্ণ বধির করেছি।'

এ কথা শুনে অন্য দুই দৈত্য আনন্দে নেচে উঠল। তারপর তিন দৈত্য আমোদে বিভোর হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেল। মানুষের দুঃখ কষ্ট ওদের মনে মজার খোরাক জোগায় যে!

তখন সেই দয়ালু কাঠুরে কী করছিল? সে তো ভয়ে জড়সড়, আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার বুক। ওরা যদি তার খোঁজ পেয়ে যায়? তাই সে ডালপালার আড়ালে চুপটি করে বসে থাকে। চোখ আর কান তার সজাগ রয়েছে

তখনও।

'তবে কী জান ভাইসব', বলল একজন, 'আমি যাদের অন্ধ করে দিয়েছি, সেই সব অভাগারা জানে না কত সহজে তারা আবার দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তবে ওদের বলব না কখনও সে কথা।'

'চমৎকার!' বলল আর একজন, 'তবে আমাদেরও তুমি বলবে না রহস্যটা কী?'

'তাহলে বলি শোন, এপ্রিল মাসের প্রথম সাতদিনের যে কোনও দিন ভোর বেলার শিশির চোখের দু'পাতায় লাগিয়ে দিলে ওরা আবার দেখতে পাবে পৃথিবীর আলো।' বলল একজন। 'এ কথা বলবে না আর কাউকে তুমি, কেমন?' বলল দ্বিতীয় শয়তান, 'খুব সোজা তোমার ঔষধ। আমি অত সহজ উপায় দেব না পাহাড়ী লোকগুলোকে। তোমরা নিশ্চয়ই ঘণ্টা পাহাড়ের নাম শুনেছ, সেখানের মানুষদেরই আমি বোবা করে দিয়েছি। ওদের ভালো হবার উপায় আরও কঠিন। সব লোকদের জড় হতে হবে ওই পাহাড়ের ধারে। তারপর একটা বড় হাতুড়ি দিয়ে পাহাড়ের গায়ে জোরে জোরে আঘাত করতে হবে। সেই আওয়াজ ওদের কানের পর্দাগুলো খুলে দেবে। তখনই ওরা আবার শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে।'

বাকি রইল আরেক শয়তান। সে বুক ফুলিয়ে বলল, 'তোমাদের ওসব কৌশল আমার কারসাজির কাছে তুচ্ছ।' আমার বধির প্রজাদের বাক্‌শক্তি ফিরিয়ে দিতে দরকার সেনিজো গাছের ফুল। এই ফুল ফোটে বর্ষাকালে। ফুল তুলে গরম জলে ফেলে সেদ্ধ করতে হবে। সেই জল পান করলে শুধু বধিরতা কেন সব অসুখই সারবে।'

তিন দৈত্য তখন হই হল্লা শুরু করে দিয়েছে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে ওদের খু-উ-ব মজা। আনন্দে তাই ধেই ধেই করে নেচে গেয়ে রাত কাবার করে দিল।

ভোরের আলো ফোটার আগে ভয়ংকর দৈত্যরা চলে যেতে যেতে বলল, 'ঠিক এক বছর পর এখানে আবার দেখা হবে বন্ধু।'

দৈত্যরা চলে যেতেই কাঠুরে গাছ থেকে নেমে এল। সে মনে মনে ভাবল, পরীরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছে। দৈত্যরা যাদের বোবা, অন্ধ আর বধির করে দিয়েছে তাদের দুর্দশা দূর করবে সে। এপ্রিল মাস আসতে অনেক দেরি, তাই আগে যেতে হবে বধিরদের কাছে। এখন মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছে। সেনিজো গাছে ফুল ফুটেছে নিশ্চয়ই।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক পথ পেরিয়ে অবশেষে কাঠুরে এল বধিরদের গ্রামে।সেখানে মাঠে মাঠে ফুটে রয়েছে সেনিজো ফুল। তরতাজা সবুজ ঘাস পেয়ে কাঠুরের গাধা ছুট্টে চলে গেল মাঠের ভেতর। কাঠুরে তার কোমরের থলিতে বোঝাই করে নিল সেনিজো ফুল। লোকদের সঙ্গে পরিচিত হল। তারপর ফুল দিয়ে চা বানিয়ে খেতে দিল বাড়ির সবাইকে। ওই গরম গরম চা খেয়ে ওরা কথা বলতে পারল। তখন ওই বাড়ির মেয়েরা এক হাঁড়ি চা বানিয়ে গ্রামের সব লোককে খেতে দিল। নিঝুমপুরী আবার কোলাহলমুখর হয়ে উঠল। এতদিন মূক থেকে সবাই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। গ্রামের মানুষরা সোনা-রূপো দামী দামী যা জিনিস ছিল একটা থলেতে ভরে কাঠুরের গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল।

এবার ভালোমানুষ কাঠুরে চলল বধিরদের দেশে। সেখানকার মানুষরা কেউ কারও কথা শুনতে পায় না। যত প্রচণ্ড শব্দই হোক না কেন ওদের বিচলিত করতে পারে না। তাই কথা বলতে ভুলে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে সে অনেক দিন পর পৌঁছে গেল সে দেশে। গ্রামের সব লোককে সে নিয়ে গেল ঘণ্টাপাহাড়ের কাছে। একটা বড় হাতুড়ি যোগাড় করে যেই সে পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা ঘা মেরেছে অমনি তারা চমকে উঠল। এই তো, এই তো ! আবার তারা শুনতে পাচ্ছে—ওই পাখিদের কিচির-মিচির, পশুদের চিৎকার, ঝরণার গান, মেঘের গর্জন! এখনই বৃষ্টি নামবে।

মোড়ল দৌড়ে এসে কাঠুরেকে জড়িয়ে ধরল। অন্য সবাই যে যার বাড়ি থেকে এনে দিল সোনার অলঙ্কার, রূপোর থালাবাসন।

কাঠুরে এবার যাবে অন্ধকারের দেশে। দেশটা আসলে আলো ঝলমলে। সেখানকার মানুষেরা চোখে কিছুই দেখতে পায় না, সব অন্ধকার। তাদের বড়ই দুর্দশা।

এপ্রিল মাস আসার কয়েকদিন আগেই কাঠুরে সে দেশে পৌঁছে গেল। সেখানে এক বাড়িতে গিয়ে সে কয়েকটা দিন থাকল। তারপর এপ্রিল মাসের প্রথম দিনই ভোরে ঘাসের ডগা থেকে শিশির নিয়ে মোড়লের দু'চোখে বুলিয়ে দিল সে। আর তখনই মোড়ল দু'হাত তুলে নেচে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'আঃ, কী সুন্দর এই পৃথিবী!'

অল্প সময়ের মধ্যে কাঠুরে সবার চোখে শিশিরের প্রলেপ দিয়ে অন্ধকার দূর করল গ্রামের মানুষদের। আবার সে সোনাদানা কতকিছু উপহার পেল গ্রামের মানুষের কাছ থেকে। সেসব গাধার পিঠে চাপিয়ে ফিরে এল তার

নিজের গ্রামে, নিজের ঘরে।

ভালোমানুষ কাঠুরেকে দেখে হিংসুটে কাঠুরে লাফিয়ে উঠে তাকে ঘরে নিয়ে গেল। সে খুব অবাক হয়েছে। গ্রামের লোকেরা ভেবেছিল কাঠুরেকে কোনও জন্তু মেরে ফেলেছে। না হলে প্রায় এক বছর হ'ল সে ফিরে এল না কেন?

হিংসুটে কাঠুরে গাধার পিঠে সোনা-রূপোর থলি দেখে এতটুকু আগ্রহ দেখাল না। ভালোমানুষ কাঠুরের রূপ দেখে সে হিংসায় জ্বলতে লাগল। কোথায় তার কুঁজ? তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভালোমানুষ কাঠুরে বুঝল তার মনের কথা। সে একে একে সব ঘটনা বলল বন্ধুকে।

বদমেজাজী মানুষটা নরম গলায় বলল তাকে, 'ভাই, তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু। এক্ষুনি আমাকে নিয়ে চল সেই গাছটার কাছে। এক্ষুনি!'

একটুও দেরি সহ্য হচ্ছিল না কুঁজো কাঠুরের। সে আবার বলল, 'দেরি করছ কেন বন্ধু, পরীরা আমার কুঁজ সারিয়ে দেবে, আমি তোমার মতো বড়লোকও হয়ে যেতে পারি।'

দয়ালু কাঠুরে তাকে নিয়ে গেল সেই গাছটার কাছে। আজই তিন দৈত্যের সেখানে আসার কথা। ভালোমানুষ কাঠুরে বলল, 'সন্ধে হতে আর বেশি দেরী নেই, আমি বন্ধু বাড়ির দিকে চললাম।'

সে চলে যেতেই হিংসুটে কাঠুরে তাড়াতাড়ি সেই গাছটার ওপর উঠে ডাল-পালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

হঠাৎ পৃথিবী কেঁপে উঠল, প্রচণ্ড শব্দের ঝড় আকাশে, বাতাসে, পাহাড়ে আছড়ে পড়ল। তিন মূর্তিমান দৈত্য এল ঝড়ের বেগে, এসেই বসে পড়ল সেই গাছতলায়। সবার মুখ গম্ভীর! এ ওর দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে রয়েছে, 'এই বন্ধুত্বের পরিচয়?' জিজ্ঞেস করল বড় দৈত্য, 'আমাদের মধ্যে কোনও একজন বিশ্বাসঘাতক। তার শাস্তি চাই। কেউ একজন অন্ধদের চোখ ভালো করে দিয়েছে! আমরা তিনজন শুধু জানতাম চোখ ভালো করার ঔষধ।'

'তা কেন হবে? আমাদের কেউ বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে না।' বলল আর এক দৈত্য। 'তাহলে কি করে আমার রাজ্যে বোবারা কথা বলছে?'

'এবং আমার বধির প্রজারা শুনতে পায়!' রাগে চিৎকার করে বলল, তৃতীয় দৈত্য। 'খবর পেয়েছি এক দুষ্টু কাঠুরে এসেছিল আমার রাজ্যে।'

অবশ্য দুই দৈত্য এক সঙ্গে বলে উঠল, 'ঠিক, ঠিক, আমাদের রাজ্যেও এসেছিল সেই কাঠুরে লোকটা।'

ওদিকে হয়েছে কী, দৈত্যেরা যখন এসব কথাবার্তা বলছে তখন পরীরা নেমে এসেছে মর্ত্যে। ওরা ভুলে গেছে

দৈত্যদের কথা। নাচে গানে মেতে উঠল তারা। গাইছে সেই গান--

সোম, মঙ্গল, বুধে তিন
টইটম্বুর খুশির দিন
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি
ছয় বেহারার জয়ধ্বনি...।

ওদের গান শুনে হিংসুটে কাঠুরে আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে ভাবল, এই পরীরাই তো ওর বন্ধুর কুঁজ সারিয়ে দিয়েছে। যেই পরীরা আবার গাইল—

সোম, মঙ্গল, বুধে তিন
টইটম্বুর খুশির দিন
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি
ছয় বেহারার জয়ধ্বনি...।

অমনি হিংসুটে কাঠুরে বলে ফেলল—

রোববার সাত একা বাস
চাইছে কে কার সর্বনাশ...।

মানুষের গলা শুনে তিন দৈত্য আর পরীরা বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল যেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পরীরা বলল, 'কে আমাদের সর্বনাশ চাইছে?' বলেই তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

আর সেই ভয়ানক দৈত্যরা? তারা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে ফেলল হিংসুটে কাঠুরেকে। সবচেয়ে বড় বিশালদেহী দৈত্য গাছটার কাছে গিয়ে কাঠুরেকে খপ্ করে ধরে মাটিতে নামিয়ে আনল। চিৎকার করে বলল, 'এই সেই কাঠুরে—এই সেই শয়তান লোকটা।'

আর এক দৈত্য বলল, 'তাহলে তুই ব্যাটা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছিলি আমাদের গোপন কথা। ছুঁচো, পাজি কোথাকার। এই নে তোর পুরস্কার।' এই বলে সে কাঠুরের পিঠে আর একটা কুঁজ বসিয়ে দিল।

**মেক্সিকোর লোককাহিনী* *ছবি : নীতিশ মুখোপাধ্যায়*


ছোট বড়ো সকলের মনের মতো বই-

হলদে পাখির পালক, পাদিপিসির বর্মিবাক্স...

লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র

মূল ছবিসহ প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড প্রতি খণ্ডের দাম : চার-শো টাকা

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে লা ল মা টি-র শ্রদ্ধাঞ্জলি

লীলা মজুমদারের 'এই যা দেখা' দাম : ৭০ টাকা

**প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত বিস্তারিত গ্রন্থ পরিচিতি সহ গল্পসমগ্র** রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পের একত্রে সংকলন

গল্পগুচ্ছ, লিপিকা, সে, তিন সঙ্গী, গল্পসল্প, এতাবৎ অগ্রন্থিত চারটি গল্প, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ও অন্যান্য দুর্লভ ছবি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: **রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়**। রয়্যাল সাইজ, জ্যাকেট, কাপড় বাঁধাই, ১০৪০ পৃষ্ঠার বই দাম : চার-শো টাকা

যামিনীকান্ত সোম-এর কবিদাদুর গল্প দাম : চল্লিশ টাকা

বিমল ঘোষ (মৌমাছি) **রবি-ছবি** দাম : এক-শো টাকা ও **শিশু রবি** (নাটক) দাম : পঁয়তাল্লিশ টাকা

**মৌমাছি রচনাসমগ্র** ১ম খণ্ড দাম চার-শো টাকা

**ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ছড়া সমগ্র ১**

**নারায়ণ দেবনাথের কমিক্স্সমগ্র** ও ৫০০টাকা

**বেস্ট অফ বাহাদুর বেড়াল** ৬০টাকা

বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বই ৫০টির অধিক ছোটো বড়ো গল্প নিয়ে

**নবনীতা দেব সেনের ছোটদের গল্প সমগ্র ১ম, ২য়** প্রতিটি : এক-শো পঞ্চাশ টাকা

**লালমাটি** ৫/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা-৭৩ দূরভাষ-৯৮৩১০২৩৩২২

# নামের খেলার কারসাজি

## অনন্যা দাশ

অতনু যখন কাকুর বাড়ির দরজায় কলিংবেল বাজালো তখন রাত সাড়ে এগারোটা। প্রথমে ভাবছিল কাকুকে এত রাতে বিরক্ত করবে না, কিন্তু তারপর মনে পড়ে গেল কাকু নিজেই বলেছিলেন যে উনি পড়াশোনা সেরে একটা দেড়টার আগে শোন না। তাই বলেই এল। দু'বার বেল দিতেই কাকু খুলে দিলেন, 'আরে অতনু, তুই এত রাতে?'

'দরজা খুলতে দেরি হল, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?'

'আরে না না, এত তাড়াতাড়ি ঘুমনোর তো প্রশ্নই ওঠে না। প্রথমবার বেলটা শুনে এসে ম্যাজিক আইতে চোখ দিয়ে দেখি চশমা পরতে ভুলে গেছি। আবার গিয়ে চশমা এনে তোকে দেখে তবে খুললাম। রাত-বিরেতে যদি উটকো কেউ হাজির হয়, তাই সাবধানতা।' বুঝিয়ে বললেন, ইতিহাসবিদ ছোটকাকু।

'না না, সেটা ঠিক। আজকাল যা কাণ্ড সব হচ্ছে, অচেনা দেখলে মোটেই দরজা খুলবে না।'

'তা তুই বল, এত রাতে কি মনে করে? হাতে আবার মোটা ব্যাগ। ধরে নিচ্ছি তোর দরকার আছে কিছু। দরকার না হলে তো আজকাল কাকুর বাড়ি অসিসই না তুই।'

'যাঃ, সেদিনই তো এলাম বিজয়ার প্রণাম করতে।'

'হুঁ, সেটা তিন মাস হয়ে গেছে খেয়াল আছে? নে বোস। এবার বল, কি দরকার। আমার আবার পরশুদিন একটা টক আছে। তার জন্য স্লাইড বানাচ্ছি বলে চারিদিকে বই ছড়ানো। কিছু মনে করিস না।'

'না না', বলে চেয়ার থেকে বইগুলো সরিয়ে পাশে রেখে বসে পড়ল।

'তুমি ঠিকই ধরেছ। কাজেই এসেছি তোমার কাছে। আমার এক বন্ধু আছে শংকর মেহতা।'

'কে? যে ওই মেহতাস অকশন্ হাউসদের ছেলে?'

'বাবা, সব মনে রেখেছেন দেখছি—শুধু চশমাটা যদি...' যাই হোক সে তো এখন পৈতৃক ব্যবসায় নেমে পড়েছে। লোকে ওদের কাছে জিনিস নিয়ে আসে। ওরা সেগুলো নিলামে তোলে। বিক্রি হলে ওরা মোটা কমিশন পায়। ওই শংকরই একটু আগে আমার কাছে এসেছিল। ওর একটা সমস্যা হয়েছে। সেটা নিয়ে তোমার কাছে আসা।'

'বল, ডিনার করে এসেছিস তো? চা-কফি কিছু খাবি? তাহলে জিতুকে ডেকে তুলবো।'

'না না, আমি ডিনার করেই এসেছি।'

'তাহলে বল।'

'শংকরদের অকশান হাউসে সামনের শনিবার কিছু জিনিস অকশান হওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে একটা ছবি রয়েছে। রাজিয়ার ভ্যানডার ওয়েডেনের আঁকা সেন্ট লিউক মা মেরির ছবি আঁকছেন। অয়েল পেন্টিং। ১৪৩৫-১৪৪০ সালে আঁকা বলে ধরা হয়।'

'রাজিয়ার ভেনডার বেডেন! ডাচরা ওয়েডেন না বলে বেডেন বলে। ব্রাসেলসে ছিলেন। ১৩৯৯ কি ১৪০০ সালে জন্ম, নেদারল্যান্ডের আর্লি স্কুলের বেশ নামী পেন্টার। বেশিরভাগ ছবিই খ্রিস্ট ধর্মের ওপর আঁকা। তখনকার দিনে অবিশ্যি বেশিরভাগ শিল্পীরাই তাই করতেন।'

'সত্যি কাকু! আপনি ঠিক ফেলুদার সিধু জ্যাঠার মতন! এতকিছু জানেন।'

'আরে বাবা, ইতিহাস আমার বিষয়, আর আর্ট আমার হবি। সেই দুটোর সূত্রেই অমি রাজিয়ার ভ্যান ডার বেডেন সম্পর্কে জানি। অন্য কিছু নিয়ে প্রশ্ন করলে মোটেই বলতে পারব না। তা সমস্যাটা কি বল তো?'

'শংকরের কাজের মধ্যে একটা কাজ হল অন্য অকশান হাউসে কি কি জিনিসের অকশান হচ্ছে সেটার খোঁজ খবর রাখা। ওর জন্যে বিভিন্ন অকশান হাউসের ক্যাটালগ আসে এবং ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলোকে দেখে। গতকাল নাকি আজ--গতকালই বলছি, কারণ রাত বারোটা প্রায় বেজে গেছে। যাইহোক, স্যামুয়েলসনস্ প্লেস বলে একটা অকশান হাউসের ক্যাটালগে শংকর দেখে রাজিয়ার ভ্যান ডার বেডেনের আঁকা সেন্ট লিউক মা মেরির ছবি অকশান হবে।'

'সে কি একই ছবি দু-দু'টো?'

'হ্যাঁ, শংকর তক্ষুনি নিজেদের ছবিটার অকশন বন্ধ করে এবং স্যামুয়েলসনদের ফোন করে ওদেরও অকশান বন্ধ করতে বলে। আমি তোমাকে আগাম বলে রাখতে এলাম। আজ দেরি হয়ে গেছে বলে শংকর এল না। কাল ও আর স্যামুয়েলসন দু'জনেই আসবে নিজেদের পেন্টিংগুলো নিয়ে, তুমি তৈরি থেকো, মেশিনটাও তৈরি রেখো। এবার আমি আসি, মা না ঘুমিয়ে বসে থাকবে। আমি যত বলি চাবি তো

রয়েছে, কিন্তু তাও জেগে থাকবে।'

'ঠিক আছে কালকে তুইও আসবি তো?'

'হ্যাঁ, বসকে বলেছি। অনেক ছুটি পাওনা আছে।'

অতনু কাকুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোটরসাইকেল স্টার্ট দিয়ে রওনা হল। কাকু ততক্ষণে রাজিয়ার ভ্যান ডার বেডেনকে নিয়ে রিসার্চ-এ ডুবে গেছেন।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ অতনু শংকর আর স্যামুয়েলসনদের প্রতিনিধি পঙ্কজ ওঝাকে নিয়ে কাকুর বাড়িতে হাজির হল।

শংকরের সঙ্গে কাকুর আগে থেকেই আলাপ আছে। ওরা আসবে বলে কাকু আগে থেকেই তৈরি ছিলেন। জিতু চা-মিষ্টিও দিয়ে গেল।

শংকর বলল, 'চাচাজী, আমাদের সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। বুঝতেই পারছেন অনেক টাকার ব্যাপার। কোনটা আসল কোনটা নকল না বুঝে কারও ঘাড়ে মিছিমিছি দোষ চাপিয়ে দিলে খুব কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। আমাদের লাইনে ক্লায়েন্ট চটালে বিপদ আছে।'

ওর কথা শুনে পঙ্কজ মাথা নাড়ল। সে বিহারের ছেলে কিন্তু বাংলা বোঝে।

শংকরের কথা শুনে কাকু বললেন, 'তোমরা পেন্টিংগুলো আলাদা লোকের কাছ থেকে পাচ্ছিলে তো? মানে আমি বলতে চাইছি সত্যি সত্যি দুটো ছবি আছে তো? নাকি একই লোক তোমাদের দু'জনকে ছবি দেবে বলেছে।'

শংকর বলল, 'না, আমার ছবিটা আমি পেয়েছি মিস্টার কর্মকারের কাছ থেকে। নব কর্মকার। নামী কালেক্টর। ইউরোপ, আমেরিকাতে অনবরত যাতায়াত করেন। ভালো ছবি বেচে দিতে চাইলে আমাদের অকশান করতে দেন। তাতে আমাদেরও লাভ ওনারও লাভ। এর আগেও আমরা ওঁর হয়ে অনেক ছবি নিলাম করেছি, কখনও কোনো সমস্যা হয়নি।'

'আর আপনার ছবিটা?'

'আমাদের ক্লায়েন্ট জগদেও সুতিহার। নেপালের লোক। বিশাল পয়সা। পেশায় ব্যবসাদার কিন্তু ভালো ছবি বা আর্টের কদর করেন। ইদানিং বয়স হচ্ছে, তাই কালেকশন কমাচ্ছেন। ওঁর ছেলে-মেয়েদের ইন্টারেস্ট নেই আর্টে, সেই জন্য। এই ছবিটা বছর দুই আগে কেনেন। তখনও উনি কেনার ফেজে ছিলেন, কিনেওছিলেন...' বলে পঙ্কজ ওঝা একটা ডাইরি বার করে দেখে বললেন, 'ইউরোপের কোনও এক মিস্টার বর্মনের কাছ থেকে। মিস্টার কারক বর্মন।'

'ঠিক আছে আপনারা ছবিগুলো এনেছেন তো?'

'হ্যাঁ, বলে দু'জনেই ছবি দুটো বার করলেন। দু'জনের ছবিই অসাধারণ দেখতে কিন্তু অবিকল এক। শিশু যিশুকে নিয়ে মা মেরি জানালার ধারে বসে রয়েছেন আর সেন্ট লিউক

সামনে নিচু হয়ে হাঁটু মুড়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের ছবি আঁকছেন। ছবির প্রতিটি টান একেবারে নিখুঁত। এতদিন পরেও রং দিব্যি উজ্জ্বল! চোখ ফেরানো যায় না। কাকু দুটো ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অসাধারণ! কোনটা আসল আর কোনটা নকল, খালি চোখে বলার উপায় নেই। নকলটাও আসলের মতনই সুন্দর সেটা মেনে নিতেই হবে।'

অতনু ডিজিটাল ক্যামেরা বার করে পটাপট ছবি তুলে ফেলল। এত সুন্দর ছবি সচরাচর দেখা যায় না।

কাকু বললেন, 'আমার কাছে একটা যন্ত্র আছে সেটার নাম ইনফ্রা রেড রিফ্লেক্টোগ্রাফ। ছবিগুলোকে আমি সেই যন্ত্রে ফেলে ছবি তুলব। আশা করছি তখনই বোঝা যাবে কোনটা আসল আর কোনটা নকল।'

অতনু জানে কাকুর ওই যন্ত্রটার সাংঘাতিক দাম। বিদেশে থাকার সময়ে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড যন্ত্র কিনেছিলেন যে ইউনিভার্সিটিতে প্রোজেক্ট করছিলেন সেখান থেকে। যন্ত্রটাকে দেশে নিয়ে আসতে কাকুকে যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল। কাকু বলেন, 'লোকে গাড়ি কেনে, আমি একটা পুরনো যন্ত্র কিনেছি।'

দুটো ছবির আই.আর. রিফ্লোক্টোগ্রাম করে ফেললেন কাকু। শংকরের ছবিটার তলায় আরও কি সব দাঁড়ি-টাঁড়ি, আঁকি-বুঁকি বেরোল। কিন্তু পঙ্কজেরটা দিব্যি পরিষ্কার।

কাকু বললেন, 'আই. আর. রিফ্লেক্টোগ্রামের বিশেষত্ব হল সেটা দিয়ে ছবির রঙের নিচের চারকোলে আঁকা রেখা দেখতে পাওয়া যায়। কারণ চারকোলের কার্বন ইনফ্রা রেড রেডিয়েশন অ্যাবসর্ব বা শুষে নিতে পারে, কিন্তু তেল রঙকে ভেদ করে বেরিয়ে যায় রেডিয়েশন। শংকরের ছবিটার তলায় চারকোলের আঁকিবুঁকি রয়েছে। এমন কি দূরে একজন এঞ্জেল আঁকা রয়েছে যেটা আর মূল ছবিতে রাখা হয়নি। তার উপর দিয়ে রঙ চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঙ্কজের ছবিটার পিছনে চারকোলের রেখা নেই। কারণ সেটা দরকার হয়নি। কপি করতে গেলে তো আর বার বার চারকোল ড্রয়িং করতে হয় না। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি শংকরের ছবিটা আসল। এই টেকনিক নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি। আর বেডেনের ছবিতে তলায় চারকোলের রেখা সব সময় পাওয়া যায় আমরা জানি। উনি রং দেওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছবিতে বদল করতেন। ওই এঞ্জেলটা যেমন স্কেচে এঁকেও মূল ছবিতে বাদ দিয়ে দেন।'

এতটা বলে একটু থেমে কাকু আবার শুরু করলেন, 'তবে তোমরা তোমাদের ক্লায়েন্টদের এখনই কিছু বোলো না। বুঝতেই পারছ কেউ একটা অপরাধ করেছে এবং পুলিশকে জড়াতেই হবে।'

শংকর আর পঙ্কজের মুখ কালো হয়ে গেল। ওদের বিজনেসে ওরা পুলিশকে যতটা পারে এড়িয়ে চলে।

শংকর আর পঙ্কজ চলে যাওয়ার পর অতনু কাকুকে জিজ্ঞেস করল, 'কাকু, আপনি ওদের ছবিগুলো দিয়ে দিলেন?'

'হ্যাঁ, কি করব ছবি নিয়ে? এখুনি তো ওসি জনার্দন ঘোষকে ওদের পেছনে লাগিয়ে দোব। দাঁড়া ফোনটা করে নিই।'

'জনার্দনদা, আমি প্রবীর বলছি। হ্যাঁ, প্রবীর সোম। হ্যাঁ, একটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে...'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। একটা মাস্টারপিস পেইন্টিং, অয়েল পেইন্টিং...তেল রঙ দিয়ে আঁকা ছবি। নকল করা হয়েছে। ১৪৩৫-৪০ সালের আঁকা ছবি...হ্যাঁ, অনেক দাম তো বটেই। দুটো অকশান হাউস জড়িত আছে। তাই একটু ডেলিকেটলি হ্যান্ড্‌ল্‌ করতে হচ্ছে। আপনাকে একটা অ্যারেস্ট করতে হবে।'

'আপনি কি করে বুঝলেন কাকু?' অতনু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তুই নামগুলো ঠিক করে দেখলেই বুঝতে পারবি।'

'নব কর্মকার আর জগদেও সুতিহার।'

'না না, জগদেও সুতিহার কার কাছ থেকে ওনার ছবিটা কিনেছিলেন? কারক বর্মন বলল না? অদ্ভুত নাম।'

'নব কর্মকার নামেতে যা অক্ষর আছে তাই দিয়েই ওই নামটা তৈরি। ইংরেজিতে যাকে বলে 'অ্যানাগ্রাম'।

নব কর্মকার

কারক বর্মন।'

মিস্টার কর্মকারের কাছে অরিজিন্যালটা ছিল নিশ্চয়ই। উনি সেটা থেকে নকল করিয়ে আসলের দামে জগদেও সুতিহারকে বিক্রি করেন। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর উনি নিজের আসল ছবিটা নিলামে তোলেন। দুর্ভাগ্য ওঁর যে একই সময় মিস্টার সুতিহারও সেই নকলটা বিক্রির জন্যে দেন। ইংরাজিতে একটা কথা আছে না, 'হ্যাভ ইয়োর কেক, অ্যান্ড ইট ইট'। মিস্টার কর্মকার সেটাই করতে চেষ্টা করেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন যে লোভ হল এমন একটা গহ্বর যেটাকে ভর্তি করতে মানুষ সীমাহীন পরিশ্রম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু কোনওদিন সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাই লোভীর পতন একদিন অবশ্যম্ভাবী।'

*ছবি: রাহুল মজুমদার*

# ছাতিম বুক্‌স্‌-এর বই

পরিবেশক : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

ন্যাড়া বটতলায় ক'বার যায়? — গৌতম ভদ্র ১৫০০.০০
ইন্দ্রমাধবের চীন ভ্রমণ— সরোজনলিনী জাপানের বঙ্গনারী— সম্পাদনা-সীমান্ত সেন ৩৫০.০০
বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য — গুরুসদয় দত্ত ৩৯৫.০০
সমাজ স্মৃতি সাহিত্য—অশোক মিত্র ২২৫.০০
বাংলার মুখ—রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৫.০০
ভাল মুসলমান মন্দ মুসলমান ইসলাম, আমেরিকা এবং সন্ত্রাসের বিশ্ব ব্যাপী যুদ্ধ—মাহমুদ মামদানি, *অনুবাদ : রজত রায়* ২৯৫.০০
এই পৃথিবীর তিন কাহিনী—(নারী নগরী, নোটন নোটন পায়রাগুলি, ভাসিলি) কেতকী কুশারী ডাইসন ৩৭৫.০০

# প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর বই

**ছোটদের বই:**

রূপকথা পশুকথা— দিব্যজ্যোতি মজুমদার ৬০্
চেকেদেশের রূপকথা—আশাপূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫্
একগুচ্ছ গল্প—নীলিমা ঘোষ ৭০্
Child's ABC+Nursery Rhymes নীলিমা ঘোষ ২৫্
শিশু রামায়ণ—নীলিমা ঘোষ ২৫্

**জীবনী গ্রন্থ:**

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—অনিলচন্দ্র ঘোষ ও সুবীরকুমার সেন ৭০্
আচার্য জগদীশচন্দ্র—অনিলচন্দ্র ঘোষ ও সুবীরকুমার সেন ১২০্
প্রমথনাথ বসু বাংলা রচনা সংকলন—সুবীরকুমার সেন ও দীপক দাঁ ১২০্
রবীন্দ্রনাথ—অনিলচন্দ্র ঘোষ ৪০্
বিবেকানন্দ—অনিলচন্দ্র ঘোষ ৪০্
রবীন্দ্রনাথ (বড় অক্ষরে ছাপা)—অনিলচন্দ্র ঘোষ ২৫্
বিবেকানন্দ (বড় অক্ষরে ছাপা) —অনিলচন্দ্র ঘোষ ২৫্
বিজ্ঞানে বাঙালী—অনিলচন্দ্র ঘোষ ১২০্
ব্যায়ামে বাঙালী—অনিলচন্দ্র ঘোষ ৮০্
বীরত্বে বাঙালী—অনিলচন্দ্র ঘোষ ৪০্
বাংলার ঋষি—অনিলচন্দ্র ঘোষ ১০০্
বাংলার বিদুষী—অনিলচন্দ্র ঘোষ ৩৫্
রাজর্ষি রামমোহন—অনিলচন্দ্র ঘোষ ৪০্
আর্থার কোন্যান ডয়েল-জীবন ও সাহিত্য— প্রসাদ সেনগুপ্ত ২৭৫্
বাঙালী হিন্দু জাতি পরিচয় — সন্তোষকুমার কুণ্ডু ২৯৫্

**সুসঙ্কলিত ও সর্বদা ব্যবহার্য আধুনিক বাংলা অভিধান:**

ব্যবহারিক শব্দকোষ—কাজী আব্দুল ওদুদ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ ৩৫০্
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ—জগদীশচন্দ্র ঘোষ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ ১০০্
জীবন গড়া—অনিলচন্দ্র ঘোষ ৩৫্
কর্মবাণী —জগদীশচন্দ্র ঘোষ ৫০্
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা—জগদীশচন্দ্র ঘোষ ৬০্
চাণক্য শ্লোক—জগদীশচন্দ্র ঘোষ ১৫্
ভারত আত্মার বাণী—জগদীশচন্দ্র ঘোষ ১৪৫্
শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী—রমেশচন্দ্র সরকার ১০০্
আমাদের নবী —আ.ন.ম. বজলুর রশীদ ৩৫্
কারবালা কাহিনী—আ.ন.ম. বজলুর রশীদ ৩৫্
গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষের
সুবিখ্যাত গীতা-গ্রন্থমালা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম —১৭০্
শ্রীগীতা(রাজসংস্করণ)— ৩২০্
শ্রীগীতা—বৃহৎ ২৩০্ শ্রীগীতা—সংক্ষিপ্ত ১৪০্
বৃহৎ পকেট গীতা(মূল অনুবাদ) ৬০্
ও গীতার অন্যান্য ছোট সংস্করণ

## প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ফোন : ২২৪১-৬১৩৮
E-mail : presidencylibrary@gmail.com

# যখন গ্রাহক ছিলাম

## দেবাশীষ দেব

প্রথমবারের জন্য যখন আমি সন্দেশ পত্রিকার গ্রাহক হই—সেটা ছিল ১৯৬৪ সাল। মনে আছে বাবার সঙ্গে ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের সামনের বাড়িটার দোতলায় উঠে একটা বড় ঘরে বসেছিলাম। পাশের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে এক মুখ হাসি নিয়ে যিনি ঢুকলেন, সেই নলিনী দাশ পরে শুধু যে আমার নলিনীদি হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়, ভীষণরকমের স্নেহপ্রবণ ওই মানুষটি আমাকে যে কত আপন করে নিয়েছিলেন তা বলে বোঝাতে পারব না।

গ্রাহক হয়েছিলাম ক্লাস ফোর-এ পড়ার সময়। তখন আমি যাকে বলে গল্পের বই-এর পোকা -তবে ছোটদের পত্রিকা কিছু বাড়িতে নিয়মিতভাবে আসত না।

বিখ্যাত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ'কে আবার বার করছেন এটা তখন একটা বড় আলোচনার বিষয়-আমার বাবা আবার দারুণ সত্যজিৎ-ভক্ত ছিলেন। আমিও 'হল'-এ গিয়ে 'অভিযান' আর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' দেখেছি। 'অভিযান' সিনেমার অ্যাকশনগুলো তো দারুণ লেগেছিল। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র গল্পটা অবশ্য আমি সেভাবে বুঝিনি ঠিকই কিন্তু শেষ দৃশ্যে ওই নেপালি ছেলেটার বসে বসে চকোলেট খাওয়াটা ভুলতে পারিনি।

ওই বয়েসে গ্রাহক হওয়া ব্যাপারটার মধ্যে একটা নতুনত্ব ছিল-প্রতিমাসে নলিনীদির হাত থেকে 'সন্দেশ' নিয়ে আসতে বেশ মজা লাগত। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ঠিকানায় যে বাড়িটা ওটাই ছিল সন্দেশের কার্যালয় (এবং আজও অছে)। হ্যাঁ...অফিসের জায়গায় এই সুন্দর শব্দটাই চিরকাল ব্যবহার হয়ে আসছে যা সন্দেশের বাইরে আমার আর কোথাও বিশেষ চোখে পড়েনি।

এইবারে আসল কথায় আসি—প্রথমবার মাত্র এক বছরের জন্যই গ্রাহক থাকতে পেরেছিলাম আমি—কারণ ১৯৬৫ সালের শেষদিকে বাবা বদলি হয়েচলেগেলেন গৌহাটিতে। আর আমরাও পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে দু'-বছরের জন্য চলে গেলাম আসাম প্রদেশের ওই শহরে, ফলে সন্দেশের সঙ্গ মন ভরিয়ে দিয়েছিল। তখন পর্যন্ত প্রিয় লেখক হিসেবে যাঁদের আমি বেছে নিয়েছিলাম, সেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী কিম্বা আশাপূর্ণা দেবী--এঁরা সেই সময় সন্দেশের জন্য নিয়মিত লিখছেন। ওই বছরেই নারায়ণবাবুর দুটো গল্প ছাপা হয়েছিল—'হনলুলুর মাকুদা' আর 'ওস্তাদে ওস্তাদে', বলা যায় দু'খানি মাস্টারপিস।

অন্যদিকে শিবরাম লিখেছিলেন প্রথম পুরস্কার আর

আশাপূর্ণা দেবীর 'নিজের হাতে'। একটা মজার ব্যাপার হল আশাপূর্ণা তাঁর এই সরস গল্পটির প্রধান চরিত্রের নাম দিয়েছিলেন 'ফেলুদাদু', সত্যজিৎ রায়ের লেখায় গোয়েন্দা ফেলুদা আত্মপ্রকাশের প্রায় দেড় বছর আগে। তাহলে কি সম্পাদক হিসেবে সত্যজিতের মনে ধরে ছিল নামটা? কে বলতে পারে!

ফেলুদার অনেক আগে থেকেই কিন্তু সত্যজিৎ সন্দেশের জন্য লিখতে শুরু করেছিলেন প্রফেসর শঙ্কুর সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার আর দারুণ একেকটা ছোট গল্প। ওই বছর কোনও গল্প না পেলেও আমি আগেই পড়ে ফেলেছিলাম ওঁর 'সেপ্টোপাসের খিদে'। সত্যজিৎ-এর লেখার সঙ্গে সম্ভবত সেটাই আমার প্রথম পরিচয়। এবার সন্দেশে পড়ে ফেললাম তিন তিনটে দুর্দ্ধর্ষ শঙ্কুর গল্প, 'ঈজিপ্সিয় আতঙ্ক', 'ম্যাকাও' আর 'আশ্চর্য পুতুল'। যার মধ্যে 'আশ্চর্য পুতুল' আজও আমার All time Favourite। ওই রকম ছোট্ট পুতুল হয়ে গিয়ে শেষে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার মতো ঘটনা শঙ্কুর জীবনে আর ঘটেছে কী?

সত্যজিৎ-এর পাশাপাশি আরেকজনের লেখা আমি সন্দেশেই প্রথম পড়ি...তিনি হলেন লীলা মজুমদার। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত দারুণ মজার সব 'ডায়লগ' আমার তো প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।

সন্দেশ হাতে পেয়ে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আরও একটা মজার ব্যাপারে আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল — পাতায় পাতায় যত ইলাস্ট্রেশন্ ছাপা হ'ত (সবই সাদা-কালো লাইন ড্রয়িং) সেগুলোকে রং পেন্সিল দিয়ে বসে বসে রঙীন করে দিতাম। সত্যজিৎ নিজে থাকলেও প্রথম দিকের বেশ কয়েক বছর সন্দেশের অধিকাংশ ছবি আঁকতেন নীতিশ মুখোপাধ্যায়। ফলে ওঁর ছবির ওপরেই আমার অত্যাচারটা বেশি পরিমানে হত—ছাড় পেত না বিজ্ঞাপনগুলোও। তখন এভারেডি টর্চের জন্য পাতা জোড়া কমিক্স্ ছাপা হত প্রতি সংখ্যায়( কে আঁকতেন সেটা অবশ্য জানতে পারিনি) দিলীপ ও তার দলবল হাতে পড়ে গোটা দলের চেহারা যে কতটা খোলতাই হয়ে উঠত- আমার কাছে বাঁধিয়ে রাখা সন্দেশের সব কটা সংখ্যা দেখলেই মালুম হবে।

আজও যখন পাতা উল্টে রঙমাখা কিম্ভুত ইলাস্ট্রেশন্গুলো দেখি তখন ভারি আফশোষ হয় এসব না করে কেন হাতপাকাবার আসর-এর জন্য ছবি এঁকে পাঠালাম না। পরে ক্লাস টেন-এ উঠে আবার বছরখানেকের জন্য গ্রাহক হয়েছিলাম—তখন বাবার উৎসাহে একবার একটা ভ্রমণ কাহিনী লিখে নলিনীদিকে দিয়েছিলাম, —না, দুঃখের বিষয় সেটা মনোনীত হয়নি, লেখাটা অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে গিয়েছিল বলে পড়াশোনার চাপে পড়ে সেটা আর কেটেকুটে ছোট করার সময় পাইনি। এর বেশ কয়েক বছর পর থেকে অবশ্য ঘটনাচক্রে আমি সন্দেশের কাজকর্মের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়তে শুরু করি...তবে সেটা একেবারেই অন্য গল্প।

# পাঁচ দশকের পাঁচালী

জীবন সর্দার

যে বয়সে ছোটরা প্রজাপতির পিছু ছোটে, ডোবাপুকুরে মাছ ধরে, গাছের ডালে দোল খায়, পাখিরা শিষ নকল করে—এই সব খেলার সঙ্গে বিজ্ঞান আগাগোড়া জড়িয়ে থাকে সে কথা কে জানত! ওই দলে প্রতিদিনের সঙ্গী হয়েও আমি জানতাম না। বুঝতাম না। কিন্তু যখন 'প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালায়' হাজিরা দিতাম, তখন ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলাম প্রকৃতির মধ্যে যে বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে সেই রহস্য খুঁজে বের করার শুভ আরম্ভের কাল হলো ছোটবেলা। 'সন্দেশ' ছোটদের পত্রিকায় সেই কাজটা শুরু করেছিল পঞ্চাশ বছর আগে।

১৯৬১ সাল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ। সে বছর বাংলার ছোটদের হাতে একটি সুন্দর সুখপাঠ্য উপহার তুলে দিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর শিল্পী সত্যজিৎ রায়--'সন্দেশ' মাসিক পত্রিকা। এমনটি আর হয় না। এবছর 'সন্দেশ' পঞ্চাশ ছুঁয়েছে।

এমনটি আর হয় না বলেছি কারণ, ছোটদের ভাল লাগার সকল বিষয়ে তা ছিল ভরপুর। ছোটদের লেখা ও আঁকার 'হাত পাকাবার আসর' ও ছিল তাতে। কিন্তু একটি বিষয়ের অভাব তারা অনুভব করেছিলেন-- দেশের গাছপালা-পোকা-পাখি চিনিয়ে বুঝিয়ে দেবার একটা বিভাগ। সেটা বইপড়া বিদ্যের পাতাভর্তি বিবরণ হবে না। হবে, ঘর থেকে বাইরে ঘুরে প্রকৃতির রূপগুণের চোখে দেখা স্পষ্ট বিবরণ। যেন অবন ঠাকুরের 'আপন কথা'র ঢং-এ লেখা। সম্পাদকের এমন ইচ্ছে আমার জানা ছিল না তখন।

আমার কবিবন্ধু অলোকরঞ্জন সে কথা হয়তো জেনেছিল। সে আমাকে বললে, তোমার দেখা পোকা-পাখির কথা একটা লেখা আমাকে দাও। ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় আমি যেতাম বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে। বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে। তাঁর কাছে পোকামাকড় , গাছ-মাছ-পাখি দেখার কায়দা-কানুন তালিম নিতে। সেখানেই প্রথম প্রণাম করেছিলাম আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। উনিই বলেছিলেন, 'গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার সবের মধ্যেই শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে। অজানাকে জানার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারলে সব কিছু সহজ হবে। ওই বয়সে শোনা সেকথা ভুলিনি।

তখন থেকেই দেশের মাঠ-বন-পাহাড়, মাছ-গাছ-পোকা-পাখি কোথায় কেমন দেখে বেড়াতাম। আর ছোটো ছোটো খাতায় মেঠো-খসড়ার মতো লিখে রাখতাম। তা থেকেই প্রজাপতির বিষয়ে মেঠো কথা লিখে দিয়েছিলাম, সন্দেশ-এর সম্পাদকের দপ্তরে জমা দেবার জন্য কবি-বন্ধুকে। মনে আছে, সুন্দর এক ঝাঁক প্রজাপতির ছবি তাতে এঁকেছিল কার্টুনিস্ট অমল। আমার সঙ্গে ঘাটে মাঠে ঘোরা তারও শখ ছিল। সে লেখা ছাপা হলো পরের বৈশাখে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক পেলাম সন্দেশ সম্পাদকের। দেখা হতেই বললেন, 'প্রজাপতির লেখাটায় যতটা বিজ্ঞান রয়েছে ততটা তোমার চোখে দেখার ভাবটা নেই। আমাদের যে চোখ-কান, হাত-মাথা, মনটা রয়েছে সেই কথা মনে রেখে লিখবে। প্রকৃতি না শেখালে কেউ তা শেখাতে পারে না। প্রকৃতির পাঠশালার পুঁথিগুলি আমাদের সামনে মেলা রয়েছে। ঘুরে ঘুরে সেই পুঁথির পাতাগুলো পড়ে নিতে হবে।' এত কথা এত আলোচনার শেষে পাঁচ দশক আগে 'সন্দেশ' ছোটদের পত্রিকায় প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর চালু করার সিদ্ধান্ত হলো।

অর্থাৎ আমাকে এবার বাইরে ঘুরে দেখা সব গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, জলে-ডাঙার সবার কথা লিখতে হবে, লিখতে হবে কী সম্পর্ক একের সঙ্গে অন্যের, এবং মানুষের সঙ্গে সকলের, ঠিকঠাক যা দেখব যখন তাই-ই লিখব। মানে ইকো বিদ্যার সার কথাটাই জানাতে হবে ছোটদের। এবং সে লেখা চলতেই থাকবে। কয়েক মাস পরেই দেখা ও লেখার সঙ্গে সঙ্গে চালু হলো 'প্রকৃতি-পড়ুয়ার-পাঠশালা'। মাসে একদিন প্রথম রোববার।

এক দশক, দুই দশক, তিন দশক—'দপ্তর' যেমন, প্র.প. পাঠশালাও তেমন চলছিল ছোটোমোটো ভাবে। তিন দশক পূর্ণ হতে পায়নি প্রকৃতি পড়ুয়াদের ডাক পড়ল সারা ভারত শিশু বিজ্ঞান উৎসবে প্রকৃতির-শিবির পরিচালনার জন্য। 'সন্দেশ'-এর প্রকৃতি পড়ুয়ারা বিজ্ঞানাচার্য বসুর কাছে তাদের মেঠো বিজ্ঞান শিক্ষার বহর দেখিয়ে এসেছিল। এতে বিজ্ঞান মহলে প্রকৃতি পড়ুয়াদের বেশ নামডাক হয়ে গেল। অবশ্যই সন্দেশের কল্যাণে।

আসলে প্রকৃতির একটা জিনিস শুধু চোখের দেখা নয়- একটা গাছ বা পোকা বা পাখির দিকে তাকিয়ে দেখাই শেষ নয়। তার চালচলন, হাবভাব জানতে বুঝতে হলে সময় দিতে হবে। দিন-মাস-বছর, ঋতুর পর ঋতু যাবে দেখে দেখে। অমন করে দিন কাটানো বেশ আনন্দের কিন্তু কী অসীম ধৈর্য নিয়ে সে কাজ প্রকৃতি পড়ুযারা করছে দেখে দেখে আনন্দ আমার ধরে না।

চার দশক পার হয়ে 'প্রকৃতি -পড়ুয়ার দপ্তর' পাঁচ দশকে পা-ফেলতেই তার সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেল।

দিনে দিনে প্রকৃতি -পড়ুয়ার পাঠশালায় সর্দার পড়ুয়াদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বড়ো হয়ে ইকো-বিদ্যায় পণ্ডিত হয়ে বাংলার গাছ-মাটি-মাছ-জল-হাওয়া নিয়ে তারা বইপত্র লিখছে। এখন রাজ্যে শ'য়ে শ'য়ে বিদ্যালয়ে ইকো-ক্লাব হয়েছে। ক্লাবের সভ্যদের বলা হয়ে থাকে প্রকৃতি-পড়ুয়া। সব ক্লাব মিলে হয়েছে বাংলার 'সবুজ-বাহিনী'। নিজেদের চারপাশটা জানার আগ্রহ ওদের মধ্যে খুব বেশি। এই পৃথিবীটাকে সকলের জন্য চিরস্থায়ী সুখের একটা ঘর বানাতে সবাই উদ্যোগী। এটাই আমার আশা ছিল। এতেই আমার আনন্দ।

# বাউল কবি

সুদীপ আচার্য

ভাবছি বসে আজ সারাদিন
ভেবেছিলাম অনেক আগে
ছন্নছাড়া বাউল নিয়ে
মনে অনেক প্রশ্ন জাগে।
চালচুলোহীন বাউল তোমার
বরফ -সাদা চুলের ঝুঁটি
গুন্‌গুন্‌ স্বর একতারা তার
ধরে থাকে বজ্রমুঠি।
নাচছে ঝুমুর, দুলছে গলায়
রঙিন পাথর নাচের তালে
মাঠ-নদী-বন মৌনমুখর
বাউল কবির সুরের জালে।
পলাশ মাটি নক্‌শা ছাপা
পালকি পায়ের আলপনাতে
ছন্দে-সুরে দুলছে লালন
ভাসছে রবির কল্পনাতে।
দুঃখ সুখের ছন্দে রঙিন
আলখাল্লা তোমার লালন—
সহজিয়া সুরের ছোঁয়ায়
পাগল কবির একতারা-মন।

# বাড়ি থেকে

সোমনাথ ভট্টাচার্য

আমাদের বাড়ি থেকে
পুবদিকে গেলে,
ছোট্ট যে মাঠ, তাতে
ছোটোরা-ই খেলে।

আমাদের বাড়ি ছেড়ে
দক্ষিণ দিকে
টলটলে দিঘি এক
আজো আছে টিকে।

বাড়িটাকে ফেলে যদি
পশ্চিমে যাই,
গাড়িঘোড়া ছোটাছুটি
করে সাঁই-সাঁই।

উত্তরমুখো হলে
বাড়িটার থেকে,
ইস্কুলে গেছে পথ
কিছু এঁকেবেঁকে।

*ছবি : রাহুল মজুমদার*

# সবার চেয়ে আলাদা

দেবাশিস সেন

"ফিফটি প্লাস"! হ্যাঁ, অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে অনেক বাধা-বিপত্তি পার করে নবপর্যায় বা তৃতীয় পর্যায়ের সন্দেশ পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি করে ফেলেছে। ১৯১৩ তে উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় যাত্রা শুরু করেছিল সন্দেশ। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুবিনয়ের নেতৃত্বে সন্দেশ চলেছিল ১৪ বছর (১৩২০-১৩৩৩)। দ্বিতীয় পর্যায়ের সন্দেশের আয়ু ছিল আরো কম। সুধাবিন্দু বিশ্বাস ও সুবিনয় রায় এর (আশ্বিন ১৩৩৮-চৈত্র ১৩৪০) যুগ্ম সম্পাদনা এবং পরবর্তী ধাপে (বৈশাখ ১৩৪১—ভাদ্র ১৩৪২) সুধাবিন্দুর একক সম্পাদনায় এই সন্দেশ চলেছিল মাত্র চার বছর। ১৯৬১তে (বৈশাখ ১৩৬৮) সত্যজিৎ রায় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর যুগ্ম সম্পাদনায় শুরু হয়েছিল বর্তমান বা তৃতীয় পর্যায়ের সন্দেশের পথ চলা। তৃতীয় পর্যায়ের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তির মাইলস্টোন পার করে সন্দেশ এগিয়ে চলেছে উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশের শতবার্ষিকীর দিকে।

সন্দেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগের বয়সও হয়ে গেল বছর পঁচিশেক। এই পঁচিশ বছরের যোগাযোগে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে সন্দেশ আর পাঁচটা শিশু-কিশোর পত্রিকা থেকে একেবারে আলাদা। গত পঁচিশ বছরে সন্দেশের প্রায় সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই অল্প বিস্তর জড়িয়ে থেকেছি। আর এই জড়িয়ে থাকার সুবাদেই এই সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধে হয় নি যে সন্দেশ অনন্য।

সন্দেশের প্রায় প্রথম থেকেই চলছে দুটি বিভাগ 'হাত পাকাবার আসর' ও 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'। পত্রিকার অল্পবয়সী গ্রাহক পাঠকদের অপরিণত লেখা, ছবি থাকে অনেক পত্রিকাতেই। সেই অর্থে হাত পাকাবার আসর-এর অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই (অবশ্য এই হাত পাকাবার আসরেই লেখা ছাপা হয়েছিল আজকের বিখ্যাত সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রীর (তখন চট্টোপাধ্যায়) প্রখ্যাত সাংবাদিক—লেখক স্বাতী ভট্টাচার্যের (তখন বন্দ্যোপাধ্যায়), ছবি ছাপা হয়েছিল বিখ্যাত শিল্পী ঈলিনা বণিকের)। কিন্তু প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের মতো বিভাগ বাংলার আর কোন কিশোর পত্র পত্রিকা কখনো ভেবেছে কি? আর সন্দেশের অনুষ্ঠান? বইমেলায় খোদ সম্পাদক লেখক গ্রাহকের একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বই বিক্রি? এছাড়াও রয়েছে সাহিত্য পাঠের আসর। রয়েছে সেলিব্রিটিদের সঙ্গে আড্ডা। এছাড়াও নির্ভেজাল আড্ডা, মজলিশতো আছেই। সন্দেশের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে এই কার্যকলাপগুলির আঁচ পেতাম গল্পসল্প আর চিঠিপত্রের উত্তরগুলির দৌলতে। আর আশির দশকের শেষভাগ থেকে স্বশরীরেই স্বাদ পেলাম মনকাড়া ওই কর্মকাণ্ডগুলির।

**সন্দেশ উৎসব**

১৯৮৭ তে সন্দেশী হবার পর প্রথম দিকে যেতাম শুধু নিউস্ক্রিপ্টের আড্ডায়। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ভেতরে নিউস্ট্রিপ্টের সামনের ছোট্ট গলিতে তখন জমজমাট আড্ডা বসত। পরে বিমল করের স্মৃতিকথায় (আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা) জানতে পেরেছিলাম নিউস্ক্রিপ্টের সাহিত্য আড্ডার সূচনা বহুবছর আগে হয়েছিল ওঁদেরই হাতে। আড্ডা বসত রোজই। আমি যেতাম শুধু শনিবারের বিকেলে। সেই সময় আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন শিশির কুমার মজুমদার। অধিকাংশ সময়ে শ্রোতার ভূমিকায় থেকে শুনতাম রজতজয়ন্তীপূর্তি অনুষ্ঠানের নানান গল্প। এর মধ্যে একদিন ঢাকে কাঠির বোল শুনলাম। সুকুমার রায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নাকি জমজমাট অনুষ্ঠান হবে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের হল ঘরে। আবার হবে গ্রাহক লেখকদের মিলনোৎসব। শনিবারের আড্ডায় হাজির হলেই খবর পেতাম অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বের নানান সরস কাণ্ডকারখানার।

অনুষ্ঠানের কদিন আগে সব গ্রাহকদের মতো আমার কাছেও পৌঁছল আমন্ত্রণ পত্র—ছাপানো 'ইনল্যাণ্ড লেটার'-এ। চিঠি খুলতেই আঁচ পেলাম সন্দেশের অনন্যতার। নিরস আমন্ত্রণ পত্র আদৌ নয়। মণ্ডে ক্লাবের যোগ্য উত্তরসূরীর ছাপ সেখানে। দারুণ সরস এক ছড়ায় গ্রাহকদের সেদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

দিনটা ছিল ৫ই জুলাই, ১৯৮৭। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেলের দিকে এগোচ্ছে তখন শুরু হল প্রবল বৃষ্টি।

কিন্তু সন্দেশীদের সঠিক সময়ে হল ঘরে পৌঁছনোর জন্য সে তাড়াতাড়িই পাততাড়ি গোটাল। হল ঘরের সামনে পৌঁছে দেখি গ্রাহক, পাঠক, অভিভাবক, কর্মকর্তারা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রায় কাউকেই চিনি না। কলেজ স্ট্রীটের আড্ডার যে কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তারা তো সকলেই মঞ্চের ধারে কাছে, সকলেই বেজায় ব্যস্ত। এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। অনুষ্ঠান শুরু হতে গুটিগুটি পায়ে আসন দখল করলাম।

পরের ঘণ্টা দুয়েকে পুরোপুরি মজে গেলাম সন্দেশী অনুষ্ঠানে। খুদে খুদে গ্রাহক গ্রাহিকারা কেউ সুকুমার রায়ের কবিতা আবৃত্তি করল। কেউ সুকুমার রায়কে নিয়ে নিজেদের লেখা পড়ল। কিন্তু মাতিয়ে দিল সেই সব গ্রাহক গ্রাহিকারা, যারা সুকুমার রায়ের বিভিন্ন চরিত্র সেজে অভিনয় করল। কাতুকুতু বুড়ো, কুমড়োপটাশ, চণ্ডিদাসের খুড়ো, হেড অফিসের বড়বাবু, ভূতের ছানার মা, বোম্বাগড়ের রাজার পিসি আর রানী, রানীর দাদা, পাগলা জগাই, ন্যাড়া, তিন আহ্লাদি, এবং আরো অনেক চরিত্র স্টেজে দাপিয়ে বেড়াল। অনুষ্ঠানের আরেকটি অভিনবত্ব ছিল মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে চটজলদি সরস ছড়ায় প্রতিটি চরিত্রকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন ভবানী প্রসাদ মজুমদার ওরফে সন্দেশীদের ভবানীদা।

পরের বছর অবনমহলে হল সুকুমার শতবর্ষ সমাপ্তি উৎসব। পাঁচই জুলাই-এর অনুষ্ঠানটা গ্রাহকদের হ'লে ২রা এপ্রিল ১৯৮৮ এর অবনমহলের অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি লেখকদের। সেদিন ভবানীদা পেলেন সুকুমার পদক, আলো-ধ্বনিতে প্রদর্শিত হলেন সুকুমার রায়। কিন্তু সেদিনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল লেখকদের অভিনীত 'ঝালাপালা'।

প্রথম অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম পুরোপুরি দর্শক। এক বছরে কলেজস্ট্রীটে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে অনেকটাই পদোন্নতি হল। অবনমহলের অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পেলাম দ্বাররক্ষক-এর। সঙ্গী ভবানীপ্রসাদ দে। আমার ওপর কড়া হুকুম জারি হয়েছিল আমন্ত্রণপত্র না থাকলে যেন কাউকেই ঢুকতে না দিই। খুব দায়িত্ব সহকারেই কাজটা করছিলাম। একটা মাছিকেও গলতে দিচ্ছিলাম না। কিন্তু একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডার থেকে নেমে দীর্ঘদেহী সেই ভদ্রলোক যখন সিঁড়ির ধাপগুলো ধীর পায়ে অতিক্রম করে আমার সামনে দিয়ে হল ঘরে ঢুকে গেলেন তখন আমার সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ জেগেছিল। আমন্ত্রণ পত্র দেখতে চেয়ে ওঁর দিকে হাত বাড়াতে পারিনি। সন্দেশ সম্পাদকও আমার মতো অর্বাচীনকে গ্রাহ্যও করেননি। ফেলুদা বলেছিল প্রথম বার কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন এক অন্যরকম অনুভূতি। কিন্তু প্রথমবার ফেলুদা-স্রষ্টা দর্শনের অনুভূতি যে প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের চেয়ে কোন অংশে কম নয় তা বোধহয় প্রদোষ মিত্তিরও জানতেন না।

*সন্দেশীদের অনুষ্ঠান*

এর পরের বড় অনুষ্ঠান সন্দেশের ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। ১লা এবং ২রা জুন, ১৯৯০, সন্দেশ দপ্তরের উল্টোদিকে শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই উৎসব। প্রথম দিন ছিল লেখকদের, দ্বিতীয় দিন গ্রাহকদের। লেখকরা করেছিলেন শ্রুতিনাটক আর গ্রাহকরা পড়ল নিজেদের লেখা গল্প ছড়া। হরেক সাজে সেজে অভিনয় করল। আর ১৯৮৭-এর 'হেড অপিসের বড়বাবু' ছোট্ট ঈশা মুখার্জী চার বছরে অনেক পরিণত হয়ে শঙ্কু আর গণ্ডালুদের নিয়ে একটা ছোট্ট নাটক লিখে ফেলে অন্য সন্দেশীদের সঙ্গী করে অভিনয়ও করে ফেলল। এরই সঙ্গে শরৎ সদনের দেওয়ালগুলি জুড়ে ছিল গ্রাহকদের আঁকা রঙিন ছবির প্রদর্শনী। এই অনুষ্ঠানেই প্রথম গাওয়া হয়েছিল "সন্দেশী সঙ্গীত" (রচনা ভবানী প্রসাদ মজুমদার, সুর স্বপন কুমার ঘোষ)। ততোদিনে আমিও সন্দেশের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছি। সন্দেশের দপ্তরে অনুষ্ঠানের মহড়ায় নিয়মিত হাজির থাকতাম। লেখক গ্রাহকদের ভিড়ে দোতালার ঘরটা যেন সবসময়েই জমজমাট। এই অনুষ্ঠান-গুলির পরিচালনা ও মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সলিল লাহিড়ী। তার দুই সুযোগ্য সহকারী রাহুলদা (রাহুল মজুমদার) ও ভবানীদা। ছবি (এবং সাজসজ্জা) এবং ছড়ায় অনুষ্ঠান মাতাতেন গ্রাহকদের এই দুই প্রিয় শিল্পী ও কবি।

রজত জয়ন্তী উৎসবের গল্প অনেক শুনেছি। শুনেছি সেই সময় বিশাল সংখ্যার গ্রাহক গ্রাহিকা যোগ দিয়েছিল সন্দেশী উৎসবে। পরের পাঁচ বছরের তিনটি অনুষ্ঠানেও কিন্তু গ্রাহকদের উৎসাহের ঢল দেখেছি। কিন্তু ১৯৯২ এবং ১৯৯৩ তে সত্যজিৎ রায় এবং নলিনী দাশের মৃত্যু এবং সলিল লাহিড়ীর সাময়িক অনুপস্থিতি সন্দেশী অনুষ্ঠানে খানিক ভাটা এনেছিল। কিন্তু তারপরেও সন্দেশের দারুণ আকর্ষণীয় কিছু উৎসব হয়েছে। শরৎ সদন, নন্দন, বিড়লা আকাদেমীর সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে বেশ কিছু অনুষ্ঠান। ১লা মে সন্দেশ দপ্তরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে সত্যজিৎ জন্মোৎসব। অংশ নিয়েছে খুদে খুদে গ্রাহক গ্রাহিকারা। বিভিন্ন বছরে পরিচালনার ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন সোমা ঘটক, প্রণব মুখোপাধ্যায় ও রমিতা সেনগুপ্ত। এমনকি সুকুমার জন্ম শতবার্ষিকীতে অংশ নেওয়া দুই খুদে গ্রাহক (দেবেশী চক্রবর্তী, ঈশা মুখার্জী) পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠান পরিচালনাও করেছে। অভিনীত হয়েছে হযবরল, রূপ প্রতিযোগিতা (লীলা মজুমদার), হাউই (সত্যজিৎ রায়), পাপাঙ্গুল, আরো কতকিছু। গত কয়েক বছর কোন অনুষ্ঠান হয়নি ঠিকই, কিন্তু অনেক সন্দেশীই সলতে পাকাচ্ছে নতুন উৎসবের আয়োজনের।

**বইমেলায় সন্দেশ**

সন্দেশের অনুষ্ঠানগুলি অন্য পত্রিকা থেকে সন্দেশকে ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু আরেকটি ব্যাপারেও সন্দেশ প্রায় অন্য সব পত্রিকা, প্রকাশনা সংস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হ্যাঁ, আমি বইমেলায় সন্দেশের স্টলের কথাই বলছি। বইমেলায় প্রায় সব ছোট বড় স্টলেই থাকে পেশাদার কর্মীরা। কিন্তু বইমেলায় সন্দেশের স্টল সাজানো থেকে শুরু করে বই নিয়ে আসা, বই বিক্রি করা থেকে কাজ কর্ম বছরের পর বছর প্রবল উৎসাহে করে আসছেন সন্দেশের নামী অনামী লেখকরা এবং নানান বয়সী সন্দেশের গ্রাহক গ্রাহিকা এমনকি তাদের অভিভাবকরাই। সন্দেশের পেশাদার কর্মীরাও (সংখ্যায় তাঁরা সিন্ধুতে বিন্দু ফোঁটা) তাদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার। আমি নিজে সন্দেশী হবার পর প্রথম সাত আট বছর দপ্তরের কাজকর্মের (সম্পাদকীয় এবং প্রশাসনিক) সঙ্গে খুব একটা যুক্ত ছিলাম না। তখন কলেজ স্ট্রীটের আড্ডা আর অনুষ্ঠান

*বইমেলায় শিবশঙ্করের তৈরী সন্দেশের স্টল*

ছাড়া প্রবল উৎসাহে যে কাজগুলি করতাম তা হল বইমেলার কাজ। বিখ্যাত সাহিত্যিক শিশির কুমার মজুমদারকে দেখেছি দুহাতে ভারী বইয়ের প্যাকেট নিয়ে বইমেলার গেট থেকে ষ্টল অবধি অনেকটা দূরত্বই হাসিমুখে ঘামতে ঘামতে নিয়মিত অতিক্রম করতে। দেখেছি ওই একই মানুষটিকে বইয়ের মলাটে বইমেলার বিখ্যাত ধুলো অবলীলায় নিজের পাঞ্জাবীতে মুছে নিয়ে ক্রেতার দিকে এগিয়ে দিতে। আরেক বিখ্যাত সাহিত্যিক মঞ্জিল সেনকে দেখেছি নিয়মিত বই বিক্রির আসরে মেতে থাকতে। সম্পাদক নলিনী দাশকেও দেখেছি নিয়মিত হাজিরা দিতে। আরেক সাহিত্যিক পরেশ দত্তকে দেখেছি মাঝে মাঝেই টিফিন ক্যারিয়ারে করে বাড়ি থেকে সবার জন্য লুচি আলুর দম নিয়ে আসতে। পুরোনো সন্দেশীদের মুখ থেকে (এবং গল্প সল্পর পাতা থেকেও) জানতে পেরেছি শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় সন্দেশের স্টলে লেখকদের নানান মজার অভিজ্ঞতা। সূচনায় এধরনের অভিজ্ঞতা হলে যে কোন সাহিত্যপ্রেমীই চাইবে সন্দেশের স্টলের কাজকর্মে যুক্ত হতে। পরের কয়েক বছরের বহু স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে। বইমেলার স্টলের কথা বলতে গেলে তিন জনের কথা আলাদা করে বলতেই হবে। প্রথমেই বলি রাহুল মজুমদারের কথা শিল্পী রাহুল মজুমদারকে সন্দেশের স্টলে কোন দিন বসতে দেখেনি। সারাক্ষণ পায়চারী করছে আর নজর রাখছে বই বিক্রির দিকে। যেই কোন খুদে ক্রেতা বইয়ের প্যাকেট হাতে পেল অমনি ওর পকেট থেকে বেরিয়ে আসত মার্কার পেন। খুদে ক্রেতার হাতের কাগজের প্যাকেটের ওপর চটজলদি তার মুখের ছবি এঁকে দিত। বাড়তি উপহার পেয়ে তখন খুদে ক্রেতার মুখে একগাল হাসি। আরেক শিল্পী শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য। সন্দেশের স্টল সাজানোর অন্যতম কারিগর। থার্মোকল কেটে, প্লাইবোর্ডের সাহায্যে স্টলের বাইরের এবং ভেতরের অসাধারণ সাজসজ্জা তৈরি করত। ১৯৯৫-এর বইমেলার কথা কোন দিন ভুলব না। সেবার শিবুদা (শিবশঙ্করকে সন্দেশীরা ও নামেই ডাকে) সারা রাত জেগে ময়দানে সন্দেশের স্টল সাজিয়ে ছিল। কাঠবিড়ালীর ভূমিকায় ছিলাম আমি, শুভজিৎ, সুনীল ভক্ত আর অশোক বেরা। বইমেলার উদ্বোধনের আগে সেই রাত, ময়দানের খোলা আকাশের নীচে কনকনে ঠান্ডায় আগুন পোহানো, এদিকে ওদিক কাঠে পেরেক ঠোকার আওয়াজ, মাঝে মাঝেই শিবুদাকে কাজে সামান্য সহযোগিতা.....স্মৃতি সততই সুখের। সব শেষে বলি তরুণদার কথা। তরুণ কুমার চক্রবর্তী—দুই সন্দেশী গ্রাহকের অভিভাবক হিসেবে সন্দেশে আবির্ভাব। কিন্তু গত পনের বছরে বইমেলায় সন্দেশে সেরা বিক্রেতা। প্রতিটি বইমেলায় (শুধু কলকাতা বইমেলা নয়, সন্দেশের জন্য তরুণদা দূর-দূরান্তের জেলার বইমেলাগুলিতে হাজিরা দিয়েছেন) প্রবল উৎসাহ সন্দেশ বিক্রিতে মেতে থাকেন। কেউ কেউ বলেন কোন এক বইমেলায় তরুণদা পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে একই ক্রেতার কাছে একই বই দুবার বিক্রি করেছিলেন—এমনই তাঁর বাকনৈপুণ্য। তরুণদা অবশ্য ঘটনাটার সত্যতায় প্রবল প্রতিবাদ করেন। ফেব্রুয়ারীর প্রথম রবিবারে সন্দেশ দপ্তরে প্রকৃতি পড়ুয়ার আসরের শেষে জীবন সর্দার খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে হাজির হতেন বইমেলায়। নিমেষে সন্দেশ স্টলের দখল নিয়ে নিত ওরা তরুণদাও ওদের কাজে লাগিয়ে দিতেন। ধরিয়ে দিতেন ওদের হাতে গোছা গোছা লিফলেট। প্রবল উৎসাহে পারলে প্রায় হাত ধরে টেনে ক্রেতাদের স্টলে নিয়ে আসত ওই খুদে গ্রাহকরা। স্বাভাবিক ভাবেই বিক্রির পারদও চড়ত।

সন্দেশী উৎসব অনিয়মিত হয়ে গেলেও বইমেলায় সন্দেশের স্টল নিয়ে সন্দেশীদের উৎসাহ কিন্তু আজো কমেনি। লিফলেট বিলোনর খুদে গ্রাহক অবশ্য কমে গেছে অনেকটাই। এই বইমেলায় একা কুম্ভ থুড়ি দুই কুম্ভ ছিল বৃতি দাশ ও অহনা বেরা।

**সাহিত্য পাঠের আসর**

সন্দেশে যোগ দেবার পরেই শুনেছিলাম মাসের শেষ রবিবার সন্দেশের দপ্তরে সাহিত্য পাঠের আসর বসে। প্রথম পরিচয়েই শিশিরদা বলেছিলেন নিয়মিত সেই আসরে হাজিরা দিতে। সঙ্গে এও হুমকি দিয়েছিলেন লেখা না নিয়ে গেলে পাঁচ টাকা ফাইন দিতে হবে। মাসের শেষ রোববার তখন সন্দেশী লেখকরা স্বরচিত গল্প, কবিতা, ছড়া পড়তেন। মধ্যমণি ছিলেন নলিনীদি। চেয়ারে বসে চোখ বুজে বসে থাকতেন। কিন্তু শুনতেন প্রতিটি শব্দ লেখা পাঠের পর কিন্তু শুধুই প্রশংসাসূচক কথা থাকত না। রীতিমতো সমালোচনা করা হত। একজন তরুণ লেখকের গল্পের মান বিচারের আদর্শ জায়গা ছিল সেটি। আর পূজোর মাসদুয়েক আগের সেই দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষা করতাম। যেদিন নলিনীদি তাঁর পুজোর গণ্ডালু অভিযানের গল্পটা পড়তেন। পাঠ শেষে মতামত চাইতেন সবার কাছেই। প্রয়োজনে লেখার সংশোধনও করতেন।

**সন্দেশী আড্ডা**

সালটা ১৯৯৮। সত্যজিৎ রায়, নলিনী দাশ চলে গেছেন। লীলা মজুমদার অসুস্থ। সন্দেশের প্রকাশনা অনিয়মিত। কার্যকলাপ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সেই সময় মূলত অমিতানন্দ দাশের প্রস্তাবনায় এবং সুগত রায়ের প্রবল উৎসাহে শুরু হল সন্দেশে সেলিব্রেটি আড্ডা। বিভিন্ন ক্ষেত্রের নামী মানুষজন মাসে একদিন হাজিরা

*সন্দেশের প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর*

দিতে শুরু করলেন সন্দেশের কার্যালয়ে। আড্ডায় অংশ নিলেন তাঁরা সন্দেশের গ্রাহক পাঠকদের সঙ্গে জানা গেল কত অজানা তথ্য এবং উঠে এল তাঁদের জীবনের কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আর সেই বিখ্যাত মানুষগুলির সান্নিধ্যে মুগ্ধ হলাম আমরা। সন্দেশের টানে (হ্যাঁ ওঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন সন্দেশ অনন্য) ওঁরা সাগ্রহে উপস্থিত হয়েছেন সন্দেশের এই ছোট্ট ঘরে। সূচনায় সুগত এবং ওর সঙ্গী (অভিক কুমার মৈত্র) হয়তো খানিকটা দ্বিধাগ্রস্থ ছিল বিখ্যাত মানুষেরা আদৌ আসবেন কিনা। তাই আড্ডা শুরু হয়েছিল ঘরের মানুষকে দিয়েই। সন্দেশ সম্পাদক সন্দীপ রায় ছিলেন সন্দেশী আড্ডায় প্রথম অতিথি। এরপর একে একে এসে আসর মাতিয়েছেন গৌতম ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ ঘোষ; অনিতা অগ্নিহোত্রী, ভূমেন্দ্র গুহ, সুরজিত সেনগুপ্ত, রাজা মুখার্জী, ভি. বালসারা, তাপস সেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, রঞ্জন প্রসাদ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ঘ সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (সরোদিয়া), মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, যোগেশ দত্ত, হিমানীশ গোস্বামী, অমিতাভ চৌধুরি, দেবাশীষ দেব, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

**সন্দেশের লেখকগোষ্ঠী**

তিন পর্যায়ের সন্দেশে বাংলা শিশুসাহিত্যের নামজাদা প্রায় সব লেখকই ছড়া কবিতা গল্পে রঙিন করে তুলেছেন সন্দেশের পাতা। রায়বাড়ির লেখকদের কথা ছেড়েই দিলাম, এর বাইরে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুনির্মল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে হাল আমলের সুনীল, শীর্ষেন্দু, মহাশ্বেতা, নীরেন্দ্রনাথ, নবনীতা, সঞ্জীব সিরাজ.....কে লেখেননি সন্দেশের পাতায়। একই সঙ্গে সন্দেশ তৈরি করে নিয়েছিল তার নিজস্ব লেখক গোষ্ঠীও। পাশাপাশি সন্দেশের গ্রাহক পাঠকদের মধ্যে থেকেও উঠে এসেছে অনেক দূর্দান্ত সাহিত্যিকেরাও। পুরনো সন্দেশে এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম সুনির্মল বসু। লেখার শুরুতে নবপর্যায়ের সন্দেশের তিন গ্রাহকের উল্লেখ করেছি। যারা পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত লেখক শিল্পী। সন্দেশের ২নং গ্রাহক সন্দীপ রায়ের লেখা গল্প এবং কমিকস প্রকাশিত হয়েছিল হাত পাকাবার আসরেই। দুই গ্রাহক দেবাশীষ দেব এবং শিবশঙ্কর ভট্টাচার্যের ছবি হাতপাকাবার আসরে প্রকাশিত না হলেও খুব অল্প বয়সেই এই দুই প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর হাতে খড়ি হয়েছিল সন্দেশের সাধারণ বিভাগের পাতায়। গত কয়েক বছরে সন্দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে উল্লেখ করতে পারি কয়েকটি নাম। খুব ছোটো থেকেই ওরা সন্দেশের গ্রাহক। হাতপাকাবার আসরে সূচনা করে ওরা সাধারণ বিভাগেও প্রবল সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। সুলগ্না ঘটক, হিমন মুখোপাধ্যায়, দীপাঞ্জন রায়, রাকা দাশগুপ্তদের লেখা গল্প সন্দেশের পাঠকদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পেলেছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের। অকালমৃত্যু হিমনকে আমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে। সুলগ্না এবং দীপাঞ্জন গবেষণা এবং চাকুরীর দৌলতে লেখক সত্ত্বাকে বিদায় (??) জানিয়েছে (এই লাইনটি ভুল প্রমাণিত হলে সত্যি খুব খুশি হব)। একমাত্র রাকা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে সাহিত্য সৃষ্টি (এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি রাকার ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত ছড়া, নাটিকা "ন ভূতো" পড়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওর সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহ্য প্রকাশ করেছিলেন)। সুলগ্না, রাকাদের উত্তরসুরী গ্রাহকদের (সংখ্যায় অনেক কম হলেও) কয়েকজনের লেখা কিন্তু আজও সন্দেশের হাত পাকাবার আসরে সাড়া ফেলছে।

**শেষ কথা**

এই মুহূর্তে সন্দেশের প্রকাশ অনিয়মিত, সন্দেশের পরিচালক মন্ডলী প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সব প্রতিকূলতা কাটাতে। আমরাও আশাবাদী। হয়তো উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশের শতবার্ষিকীতেই স্বমহিমায় সন্দেশ ঘুরবে সব বাঙালির হাতে।

# আমার স্মৃতিতে 'সন্দেশ' ও সত্যজিৎ

## সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মনে পড়ে যায় সন্দেশ-এর নব পর্যায়ের প্রথম দিকের দিনগুলোর কথা। পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাই বছর পঞ্চাশ পিছনে। সত্যি কথা বলতে কি ছোটদের নিয়ে আলাদাভাবে লেখার পরিকল্পনা কোনোদিনই তেমনভাবে ছিল না। প্রথম ছোটদের নিয়ে লেখা শুরু 'রোশনাই' পত্রিকাতে, উপন্যাস 'ভুতুড়ে জাহাজ'। এর বেশ কয়েক বছর পরে 'আনন্দমেলা'-য় দু-কিস্তিতে বের হয় 'কোদণ্ডের

টঙ্কার'। নীরেনদা জানান প্রথম কিস্তি পড়েই মানিকদা প্রশংসা করেছেন। পুরো উপন্যাসটা প্রকাশিত হওয়ার পরে মাণিকদা সপ্রশংস চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন কিশোর গোয়েন্দা রচনার ধারা কিভাবে পুষ্ট হয়েছে আমার লেখার মাধ্যমে। একই সময়ে 'সন্দেশ'-এ লেখার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন মাণিকদা। আজ মনে হয় মাণিকদা'র কাছে. উৎসাহ ও প্রশংসা না পেলে এবং পাশাপাশি 'সন্দেশ'-এ লেখার তাগিদ অনুভব না করলে হয়তো আমার আর কোনোদিনই কিশোর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হত না। সন্দেশের জন্য প্রথম লিখেছিলাম 'টাক ও ছড়ি রহস্য'। সঙ্গে ছবি এঁকেছিলেন মাণিকদা স্বয়ং। ছবিতে কর্ণেলের কমিক্যাল চরিত্র যথাযথভাবে ফুটে উঠেছিল।

'সন্দেশ'-এ এরপরে আর কর্ণেল লিখিনি। কিন্তু ভূতের গল্প লিখেছি, সাড়ে তিন বছরের নাত্‌নীকে নিয়ে গল্প লিখেছি 'পুপুর জঙ্গলে'। এ গল্পে ফুটে উঠেছে তারই কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গী, শিশুর চোখ দিয়ে চারিপাশকে দেখার অভিজ্ঞতা।

সন্দেশে প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়ের গল্প 'খগম' খুবই ভাল লেগেছিল। গল্পের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন নীতি উপদেশ—অকারণে কোনও প্রাণীর ক্ষতি না করা—রহস্য রোমাঞ্চের সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

লীলাদির চিঠি পেয়েছি যখন, সন্দেশে লেখার অনুরোধ জানিয়ে, তখনও লিখেছি। মনে আছে, দূরদর্শনে একবার সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগে আমরা অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলাম—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ছিলেন—সেখানে লীলাদি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কর্ণেল মাঝে মাঝে ন্যাকামী করেন কেন?' প্রশ্নটা শুনে খুব মজা পেয়েছিলাম। লীলাদি'র লেখা 'হলদে পাখির পালক', 'পাকদণ্ডী' এখনও আমার প্রিয় লেখাগুলোর অন্যতম।

একবার সত্যজিৎ রায়ের আমন্ত্রণে 'শাখাপ্রশাখা' ছবিটি দেখতে যাই। আমার বেশ ভালোই লেগেছিল। আরো মজার ব্যাপার হল ছবি শেষ হওয়ার পরে বেশ কয়েক মিনিট ওঁর সঙ্গে আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল গোয়েন্দা গল্প লেখার পদ্ধতি নিয়ে। উনি বলেছিলেন গল্পকে তার মত এগোতে দিতে হয়, আগে থেকে গল্পের শেষটুকু ভাবতে নেই। গোয়েন্দা গল্পের টানটা কিভাবে ধরে রাখা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে আমি একবারই গিয়েছিলাম তবে সে সময়ে ওঁর কোনো একজন আত্মীয় মারা যাওয়ায় উনি বাড়িতে ছিলেন না। তবে ফোনে ওঁর সঙ্গে বহুবার কথা হয়েছে।

ছোটোদের জন্য লেখা প্রিয় বই বললে আমার মতে উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' এবং বিভূতি গুপ্তের 'বেড়াল ঠাকুরঝি'। সুকুমার রায়ের লেখাও আমার খুব ভালো লাগে, তবে তাঁর লেখা আমার কোনোভাবেই ছোটোদের লেখা বলে

মনে হয় না। তিনি অত্যন্ত বড়মাপের স্রষ্টা, তাঁর লেখাও সেইভাবে বহুস্তর বিশিষ্ট।

সত্যজিৎ রায়ের তৈরী ছবির মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। উপেন্দ্র কিশোরের রচনা যেন সত্যজিতের নিপুণ শিল্পবোধের ছোঁওয়ায় সুকুমারের লেখার মতই বহু স্তর বিশিষ্ট ছবি হয়ে উঠেছে।

*অনুলিখন : বিনীতা ঘোষ*

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে এসেছেন। সঙ্গী ছিলেন রাণী মহলানবীশ। তখন জুন মাস। ইউরোপে বসন্তকাল। মাঠঘাট ফুলে ফুলে ভরে আছে। রেলগাড়ির কামরা থেকে তাঁরা দেখছেন, কেমন করে শহর, গ্রাম, মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রাণী দেখলেন, যতোদূর দেখা যায় একেবারে লালে লাল—কেউ যেন পৃথিবীর গায়ে আবীর ঢেলে দিয়েছে। কাছে যখন এলেন তখন দেখলেন, লাল রঙের পপীর জঙ্গল—এদের কেউ যত্ন করে ফোটায়নি—তবু কী অপরূপ শোভা নিয়ে চারদিকে সুন্দর হয়ে নিজেদের আলো করে রেখেছে এরা! কিন্তু এসব রাণী একাই দেখলেন, তাঁর লেখা বইতে লিখলেনও। আর তাঁরই পাশে বসে থাকা রবীন্দ্রনাথ এসব দেখে কি বললেন? এসব দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়াই-বা কী হল?

রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলেন আর বললেন ঃ তুমি লাল রং ভালোবাসো? এটা হল মৃত্যুর রং। যদিও দেখতে সুন্দর—কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ওদের আয়ু ফুরিয়েছে।

আসল খবরটা আরও আশ্চর্যের। লাল রঙটা রবীন্দ্রনাথের চোখেই পড়তো না। সবুজের সঙ্গে সেটা গুলিয়ে ফেলতেন। কিন্তু নীল রঙ সম্বন্ধে তাঁর চোখ অত্যন্ত সজাগ ছিল। সামান্য নীলের




একটুখানি ছিটেও তাঁর চোখ এড়াতো না। গরমের সময়ে ঘাসের মধ্যে জংলী ভায়োলেট ফুলের ছড়াছড়ি। ঐ অজস্র নীল ফুল চারদিকে দেখতে পেয়ে কী আনন্দ তাঁর। বলতেন : দ্যাখ্ দ্যাখ্। আহা! চোখ জুড়িয়ে গেল। বিস্তীর্ণ বাগানে কোথায় ঘাসের মধ্যে ছোট্ট একটা নীল রঙের জংলী ফুল ফুটে আছে—সেটাও তাঁর চোখে পড়তো। অথচ অন্যেরা হাজার লক্ষ্য করেও ফুলটা খুঁজে পেতে হিমসিম খাচ্ছে। তখন রবীন্দ্রনাথ হাসতেন আর বলতেন ঃ কী আশ্চর্য। এত স্পষ্ট জিনিষটা দেখতে পাচ্ছো না? অথচ আমি তোমাদের লাল রঙটা ভালো দেখতে পাইনে বলে আমাকে ঠাট্টা করো।

রবীন্দ্রনাথের কাছে লালরঙটা ছিল রক্তের রঙ, আগুনের রঙ—অতএব প্রলয়ের রঙ এবং মৃত্যুর রঙ। কাজেই তিনি বলতেন বেশী দেখতে না পেলে ক্ষতি কি? অথচ নীল রঙকে বলতেন : এ যে পৃথিবীর রঙ, আকাশের শান্তির রঙ—তাই ওটার মধ্যে আমার চোখ ডুবে যায়।

একটা বিদেশী গল্পের বইতে পড়েছিলাম, তার ষোল বছরের নায়ক বলছে : আমার ভারী দুঃখ হয়। যখন দেখি আমাদের চারপাশে এত সুন্দর সব জিনিষ ছড়িয়ে আছে—বেশীরভাগ লোকই এদের দেখতে পায় না। আমি আর্টিস্ট। আমার কাজ এগুলোকে দেখা, আর সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া।

তার মানে হচ্ছে, আমাদের তো সবাইকারই চোখ রয়েছে দেখবার। কিন্তু যা দেখছি, যা চোখের সামনে নিত্য ঘটছে, সেগুলো দেখবার পরও যদি আগের মতই থেকে যাই, যদি না মনে হয়—এই যে নদীতে নৌকো ভাসছে, ঘাসে ফুল ফুটছে, ভোরবেলায় সূর্য উঠছে, সন্ধ্যেবেলায় ডুবছে—এদের প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা আলাদা সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে—তবে বৃথাই আমার চোখ থাকা, বৃথাই আমার দেখা।

রবীন্দ্রনাথও কিন্তু এই দেখাকে বলতেন হৃদয় দিয়ে দেখা। বলতেন ঃ হৃদয় দিয়ে দেখা—চোখ দিয়ে দেখারই মত। এটা বলে বোঝানোর ব্যাপার নয়। বলতেন ঃ কত জন্মান্ধ হৃদয় দিয়ে না দেখতে পেয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এরা আমাদের দেশের সেই আলোটিকেই দেখলে না যাকে দেখলে আর সবকিছুকে অনায়াসেই দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিরজীবনের একটা অভ্যেস ছিল, আকাশের আলোর দিকে তাকিয়ে তবে বিছানা ছেড়ে উঠতেন। সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত চুপ করে নিজের মনে পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকতেন। তারপর সূর্য ওঠা দেখে মন দিতেন অন্য কাজে। কেননা, সূর্য, আলো, আর চোখের দেখা তাঁর কাছে, তাঁর জীবনে খুব বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো। সেই ছোটবেলা থেকে আমৃত্যু। এঁর সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ। একেই তিনি বলতেন ঃ প্রাণের লীলা। বলতেন ঃ চোখের মধ্যে আলো যাবার আনন্দ আছে—তাইতো চোখ আলো পায়। চোখ যে আলোর জন্য লালায়িত। আলোও প্রতিদিন আমাদের একটিমাত্র কথাই বলছে ঃ দেখ। একবার চেয়ে দেখ। আর কিছু নয়। আমরা চোখ মেলি, দেখি। কিন্তু সে দেখাটুকু দেখার একটি কুঁড়িমাত্র। এখনো আমরা তো অন্ধ। বিকশিত, ভরপুর দেখা এখনও দেখিনি।

ভরপুর দেখা, বিকশিত দেখা কাকে বলেন রবীন্দ্রনাথ? সেই দেখা কিন্তু তাঁর শিশুকাল থেকেই। তবু তাঁর এই আক্ষেপ। ভাবছেন অসম্পূর্ণ। ভাবছেন, সূর্যের আলোর ধারা নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। সূর্যের মত সেই মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে এত রঙ, এত ভাব, এত রূপ, এত রস। রবীন্দ্রনাথ আজীবন সেই জ্যোতিস্বরূপকে দেখার জন্য চোখ মেলে রেখেছেন। চেয়েছেন, যেন তাঁর পরিচয় ঐ আলোয় আলোয় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর দেখা ভরপুর দেখা হয়ে ওঠে।

এইসব নিয়ে যখন তাঁর ভাবনার মধ্যে টানাপোড়েন চলছে—তখনও তিনি ছবি আঁকা শুরু করেননি। অথচ ইচ্ছে জেগেছে ছবি আঁকবার। কিন্তু তখনও হাত তৈরী হয়নি। রেখা আর রঙ দিয়ে চোখের দেখা আর হৃদয় দিয়ে দেখাকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করবার ইচ্ছে—কিন্তু সে উপায় ছিল না তাঁর হাতে। ছিল কেবল কথা আর ছন্দ। অথচ পাশে বসে জ্যোতিদাদা তখন ছবি এঁকে যাচ্ছেন। পারিবারিক পত্রিকা 'বালক'-এও তাঁরই লেখার ছবি আঁকলেন বন্ধু হরিশ্চন্দ্র হালদার আর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যে, কবিতায় তখন ফুটে উঠছে ছবির মত সব প্রবহমান কারুকাজ। ছবি আঁকতে পারার অভাব তবু পূরণ হচ্ছে না দুর্দান্ত ছবিতে ভরপুর এইসব গদ্য কবিতার মধ্যে দিয়েও। অথচ এ তো শুধু আজকের কথা নয়—সেই ছোটোবেলা থেকেই তাঁর ছবি দেখার আরম্ভ। দুপুরবেলাটাকে সেই বয়সেই যখন মনে হত যেন 'দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগী হয়ে যাবার সময়।' রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে রাস্তার লোক চলাচলই শুধু চোখে পড়তো না। 'কলকাতার মাথার ওপর দিয়ে পা ফেলে তখন মন চলে যেত সেখানে—যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে।' এমনি করে একলা বসে চলতো তাঁর মনের মধ্যে তাঁরই খেয়ালে তৈরী অচল পাল্কি—পথ থেকে পথে, দূরে দূরে, দেশে দেশে। রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে দেওয়ালের গায়ে সাদাকালোর আলোর রেখাতেও ছবি দেখতেন। বড়দের মজলিশ থেকে কানে আসতো তখন 'জোছনায় ফুল ফুটেছে'। যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়তো, তখনও তাঁর চোখে ঘুম আসতো না। কেন না, তখনও অন্ধকারে শোনা যেত 'রিমঝিমনি ধারা/রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথ হারা।'

১৭ বছর পাঁচ মাস বয়সে প্রথমবার বিলেত গেলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ। তখনও একটা সুন্দর দৃশ্য দেখলেই ছবির কথা মনে আসে তাঁর। 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'-তে লিখছেন ঃ দূরে ছবির মত শহর দেখা যাচ্ছে, একটি লোকও তখনও ওঠেনি.....রৌদ্ররঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন অতি স্পষ্ট একটি ছবির মত আঁকা।'

সেই ছোটবেলায় 'জল পড়ে পাতা নড়ে' দিয়ে যাঁর কবিজীবনের আরম্ভ সেই রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সেও আবার

একবার আকস্মিকভাবে ছোটবেলার দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। তখনকার 'ছড়ার ছবি, শিশু, সেঁজুতি, আকাশ-প্রদীপ—এসবের মধ্যেও ছবির পর ছবি—নানা সময়ের, নানা ঋতুর, নানা মানুষের। বৃষ্টির একটা সুন্দর ছবি আছে শিশু ভোলানাথে ঃ ঐ ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামে/ মাঠের পারে দূরের গ্রামে / ঝাপসা বাঁশের বন / গোরুটা কার থেকে থেকে / খোঁটায় বাঁধা উঠছে ডেকে / ভিজছে সারাক্ষণ।

১৮৮৪-তে 'ছবি ও গান' লেখবার সময়ে ছবি আঁকবার আকাঙ্খাকে আরও জোরগলায় বলতে শুনলাম রবীন্দ্রনাথকে। বললেন ঃ যদি তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারতাম, তবে পটের ওপর রেখা আর রঙ দিয়ে উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করতাম।

বউঠান কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর গভীর দুঃখ তাঁকে আরও ছবি আঁকার মন তৈরী করবার দিকে এগিয়ে দিলো। ছবির মত তাঁর একাকীত্ব, শূন্যতাবোধ ফুটে উঠলো তাঁর কলমে ঃ 'বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বনধ। তার তালাতে মরচে ধরেছে—তার চাবি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যেবেলা সে ঘরে আলো জ্বলে না.....'

১৮৮৮-তে জে. আর্চার নামে একজন চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর বড়মেয়ের ছবি এঁকেছিলেন। রঙিন ক্রেয়ন দিয়ে। একবছর পরে দেবেন্দ্রনাথেরও ছবি এঁকেছিলেন জে. আর্চার। সেটা অবশ্য 'অয়েল পেন্টিং'। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটা দিন দাঁড়িয়ে তাঁর আঁকা দেখতেন। বউঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর ১৮৯০-তে আবার একবার বিলেত গেলেন রবীন্দ্রনাথ। সেবার ন্যাশান্যাল গ্যালারীতে ছবি দেখলেন—প্যারিসে নানা এক্সজিবিশন দেখলেন—ফরাসী আর্টিস্ট করোল্যু দ্যুরীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ১৯০০-তে বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠি লিখলেন; তিনি স্কেচবুক নিয়ে বসে ছবি আঁকছেন। কিন্তু সত্যিকারের ছবি তখনও রবীন্দ্রনাথের হাতে ফুটে ওঠেনি। তার জন্যে আরও অনেকগুলো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে।

আমাদের দেশের আর্টিস্টরা তখন পুরাণ পুঁথি এসব নিয়েই ছবি আঁকতে ব্যস্ত ছিলেন—তাঁরা ছিলেন 'বেঙ্গল স্কুল' নামে এক রকমের শিল্প আন্দোলনের ফসল। অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরেই এই আন্দোলন গড়ে ওঠে—তবু অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকলেন স্বদেশ আর বিদেশকে মিলিয়ে মিশিয়ে—নিজের একটা একেবারে আলাদা ধারা তৈরী করে নিলেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা ঐ অতীতের পুরাণে, পুঁথিতেই আটকে রইলেন। তখন আবার ইউরোপে শিল্প আন্দোলনের নতুন স্রোত বইছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯১২-তে আবার বিদেশ গেলেন—যাত্রাপথে আর্ট সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন : ব্যবসায়ী আর্টিষ্ট বাস্তবকেই শুধু চোখ দিয়ে দেখে, আর গুণী আর্টিষ্ট সত্যিকে দেখে মন দিয়ে। বাইরের রূপটাকে, রবীন্দ্রনাথ সাহসের সঙ্গে বললেন, এটাই সব নয়—এটাই চরম নয়—এটা সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র। তার মানে বারে বারেই তাঁর মন ফিরে আসছে সেই চোখের দেখা আর মন দিয়ে দেখার টানাপোড়েনে। তাঁর মন 'মনের দেখা'কেই বড়ো করে দেখতে চাইছে—চোখের সামনে যা দেখছি, হুবহু তাকেই অনুসরণ করা থেকে তাঁর মন সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

আরব সমুদ্রপথে এইসব অস্বচ্ছ জটপাকানো ভাবনার জাল থেকে মুক্ত হল মন—ইংল্যান্ডে এসে যখন রোটেনষ্টাইন, ষ্টপফোর্ড ব্রুক, ইয়েটস এর মত আরও গুণী শিল্পী আর লেখকদের দেখা পেলেন—তখন। ষ্টপফোর্ড ব্রুক-এর ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ এইসব ছবি প্রদর্শনী লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে নয়—এগুলো মনের লীলা।

এই ১৯১২-তেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'জীবন স্মৃতি'-র মত অপরূপ আত্মকথা—যে আত্মকথা শুধু ইতিহাস নয়—বারবার যেখানে চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ আর্ট সম্বন্ধে যা ভাবছিলেন প্রায় সেই কথাই বললেন ঃ জীবনস্মৃতি যে অদৃশ্য চিত্রকরের নিজের হাতের রচনা, সেই চিত্রকরও যা কিছু ঘটেছে, তার হুবহু নকল রাখবার জন্যে তুলি হাতে বসে নেই। সেই চিত্রকরের আঁকা ছবিতে নানা জায়গায় যে রঙ পড়েছে—তা বাইরের প্রতিবিম্ব নয়—সে রঙ তার নিজের ভান্ডারের।

১৯১৩-তে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন—আর এই পর্বেই তাঁর জীবন গভীরভাবে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠলো। দেশে বিদেশে তিনি একজন অপরিহার্য মানুষ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ছবি আঁকবার ভাবনা মন থেকে গেল না। গরমের ছুটিতে রামগড় পাহাড়ে ছুটি কাটাতে গেলেন—সঙ্গে নিয়ে গেলেন মুকুল দে-কে। অল্পবয়সী আর্টিষ্ট তিনি। শিলাইদহ-তে নিয়ে গেলেন পল্লীজীবন আর গ্রামীণ দৃশ্যের ছবি আঁকতে তিনজনকে। নন্দলাল বসু নিশ্চয়ই তাঁদের একজন।

তারপর জাপান। সেখানে শিমোসুরার আঁকা 'অন্ধের সূর্যবন্দনা' ছবিটি আর টাইকানের নীল রঙের প্রাধান্য দেওয়া আঁকা ছবি দুটি নকল করিয়ে দেশে আনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। গগনেন্দ্রনাথদের চিঠি লিখলেন ঃ গগন, তোমরা কবে ঘর ছেড়ে একবার বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়বে? আরও লিখলেন। এঁরা ইউরোপের নকল করেন না, এঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছেন।

জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা গেলেন—প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের এই দুই দেশ তাঁর ভাবনাকে আরও অনেকটা পথ এগিয়ে দিলো। তখনও রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ 'চিত্রবিদ্যা তো আমার বিদ্যা নয়—যদি তা হত তাহলে

একবার দেখতুম আমি কি করতে পারতুম।' জাপানের 'ওকাকুরা'র স্কুলের আর আমেরিকায় সিয়াট্‌লের স্টুডিওর কর্মযজ্ঞই কি তাঁকে ভাবিয়ে তুললো শান্তিনিকেতনে 'কলাভবন'-এর প্রতিষ্ঠা করবার কথা?

এই 'কলাভবন' প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ—আর তারপরেই একজন চিত্রকর হয়ে উঠবার দিকে অতি দ্রুত এগিয়ে গেলেন কয়েকবছরের মধ্যেই। এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার জগতে অবতীর্ণ হয়ে 'বিশ্বভারতী'র আদর্শে সমস্ত দরজা খুলে দিলেন—শান্তিনিকতনে শিল্পের মুক্তি ঘটলো রামকিংকর বেজের হাত ধরে। আধুনিক ভাস্কর্য থেকে আরম্ভ করে অয়েলপেন্টিং—সব কিছুই জাতীয়তাবাদের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লে একেবারে শিল্পের ভেতরমহলে।

আর রবীন্দ্রনাথ? পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করে একটা অল্পসল্প ছবি চিহ্ন ফুটে উঠছিল বহু দিন বহু বছর ধরেই। সেই ১৯০৫-এ লেখা 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি'-র পাতায় ছিল লতাপাতার ফর্ম—আকার। ১৯২৩-এ 'রক্তকরবী' নাটক লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেল অপরূপ সব কাটাকুটির ছবির প্রজাপতি—একটা গোটা ছবির দিকে যাত্রা যেন—আবির্ভাব হল নতুন আগন্তুকের—এতদিন এতবছর যার প্রত্যাশায় বসে ছিল মন—মনের অব্যক্ত আকাঙ্খা—সব।

এইসব কাটাকুটি থেকে উঠে আসা ছবি দেখে চমকে উঠেছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামের আর্জেন্তেনীয় এক মহিলা—সালটা ১৯২৪-আর্জেন্তিনার নামকরা সাহিত্যিক তিনি। এরপর ১৯২৬। ইউরোপ থেকে ঘুরে আসার পর রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তা ছবি আঁকার জগতে আছড়ে পড়লো। ১৯২৭-এ রাণী মহলানবীশকে চিঠি লিখলেন ঃ এবার আমার জীবনে নতুন পর্যায় আরম্ভ হল। একে বলা যায় শেষ অধ্যায়। আমার বীণায় অনেক বেশি তার—সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড় কঠিন। .....আমি বুঝতে পারি, কবিধর্মই আমার একমাত্র ধর্ম নয়.....তাই আমার ভেতরে মুক্তির জন্যে এমন প্রবল কান্না।'

এতদিন রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবিই ছিল সাদা-কালোয় আঁকা—যাকে বলে 'মোনোক্রোম'। 'রক্তকরবীর' কাটাকুটিতে প্রথম যোগ হল রঙ—কালোর সঙ্গে গাঢ় লাল রং-এর ব্যঞ্জনা।....পেরু সরকার নিমন্ত্রণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, কিন্তু জাহাজেই অসুস্থ হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন বুয়েনাস আইরেসে দীর্ঘ তিনমাস বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছিলেন—এবং সেটা মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোরই আতিথ্যে। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে বসে ২৬টি কবিতা লিখলেন—'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের।

এই 'পূরবী'-তেও কবিতার ভুলগুলো কাটাকুটি করতে করতে সুন্দর অপরূপ সব 'মোটিফ' বেরিয়ে পড়ত তাঁর কলমে—রবীন্দ্রনাথ কি তা জানতেন? ওকাম্পো জানতেন—দেখেই চমকে উঠে বললেন ঃ এসব যে অদ্ভুত। অভিনব। .....সেই তিনি ১৯৩০—প্যারিসে এক্সিজিবিশন করলেন-১২৫ খানা ছবি নিয়ে—সমঝদাররা বললেন ঃ আমরা সবেমাত্র যা ভাবছি, কী করে এত সহজে আপনি সেই জিনিষকে চোখের সামনে এনে দিলেন? কলাবিশেষজ্ঞরা বললেন ঃ আগামী যুগের আর্ট। পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ 'ছবি হল আমার শেষ বয়সের প্রিয়া।' আরও বললেন ঃ 'কেবলমাত্র এই আগ্রহে দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে—একটা নিভৃত কোণে রঙীন কালি দিয়ে আপনমনে রঙমহল সৃষ্টি করতে থাকবো।' যখন বললেন তখন তাঁর বয়স সত্তর ছুঁই ছুঁই।

রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন ৮০ বছর তিন মাস। এই সুদীর্ঘ জীবনে রঙের আসর সাজিয়ে দিয়ে গেছেন নানাভাবে। নানা দিকে। যেন একটা নদীর বহু স্রোত। কোনও একটা বিশেষ স্রোতে হাত দিয়ে বলা যাবে না—এই-ই তিনি। গল্পে, গানে, কবিতায়, নাটকে, উপন্যাসে, ছবি আঁকায়—শিল্পের নানা স্রোতে তিনি তাঁর রঙের আসনটি পেতে রেখেছেন। অথচ এমন মানুষ নিজেকে বলতেন 'রঙ-কানা'। ডাক্তারী ভাষায় তাঁকে বলা হত 'প্রোটীয়ান' মানে যাঁরা রঙ দেখতে ভুল করেন। রবীন্দ্রনাথ লাল সবুজে গুলিয়ে ফেলতেন—সে কথা আগেই বলেছি।

অথচ এই 'প্রোটীয়ান' মানুষটি অক্সফোর্ডে মানুষের ধর্ম নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন—সেই তিনিই পদ্মার চরে আলু চাষে মগ্ন হয়েছেন। যিনি হিজলী হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন, তিনি কুষ্টিয়ায় আখের কল খুলেছেন। তিনি বার্নার্ড শ', রোমা-রোলাঁ-র মত মনীষীদের সঙ্গে সত্য সুন্দর নিয়ে আলোচনা করছেন, সেই তিনিই চাষীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, কৃষিঋণ ব্যাঙ্ক, দারিদ্র্য থেকে গ্রামকে মুক্তির পথ তৈরী করতে ব্যস্ত। যিনি গেয়েছেন, আমর সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন—সেই তিনিই বলছেন ঃ অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, /চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।

এই রবীন্দ্রনাথ আসল রঙগুলোর প্রধান দুটি রঙ দেখতে পেতেন না? সেটাও আবার লাল আর সবুজ? তা হোক—তবু তিনি এত রঙে রঙীন। সারাটা জীবন এমন নানা রঙের নেশায় মেতে থাকতে পৃথিবীতে আর কাকেই বা পাওয়া গেছে? এমন নানা বিষয় নিয়ে নানা রঙের খেলা আর কেই বা খেলেছেন? এমন খেলা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এবং একজীবনে। তিনি রবীন্দ্রনাথ—তিনিই রঙমহলের রাজা।।

*ছবি ঃ লেখক*

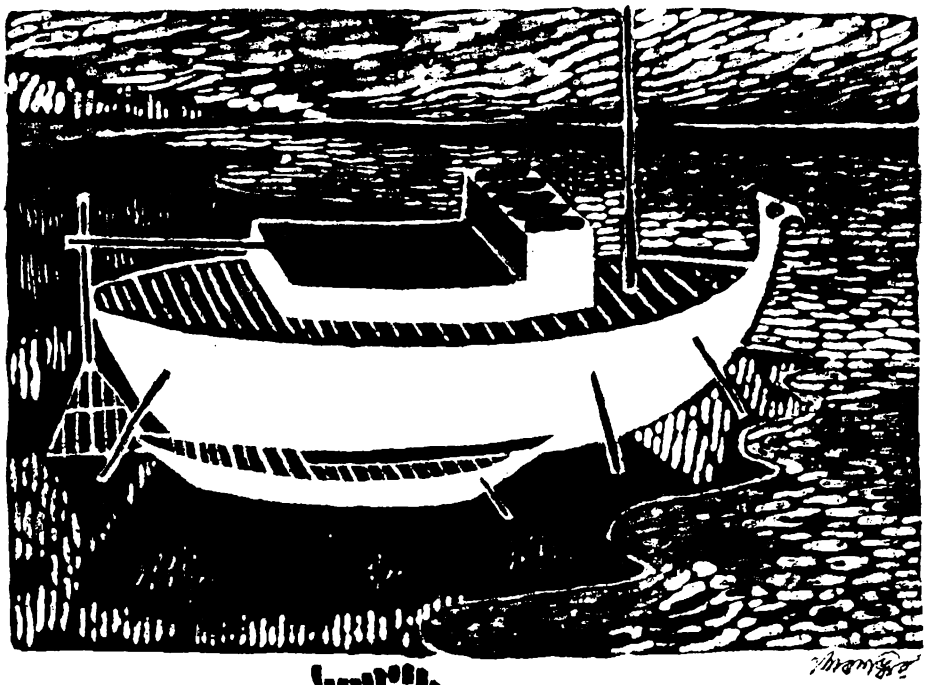

# তারা দুই ভাই

অরুণিমা রায়চৌধুরী

তারা দুই ভাই। পাশাপাশি শুয়ে আছে। নদীর ঢেউ তাদের দোলা দিয়ে যায়। জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তারা নেচে ওঠে।

নদীর ধারে অনেক দিনের পুরোনো মস্ত বড় একটা বাড়ি ছিল। নাকি কোন জমিদারের বাড়ি। বাড়ির সামনে বিরাট বাগান। কত যে নানা রকম গাছ ছিল সেখানে! তারপর কী যে হল! বুড়ো জমিদারবাবু, সে বাড়ির কর্তামা, সবাই একে একে চলে গেলেন। অনেক সমারোহ করে তাদের ছেলেপিলেরা শ্রাদ্ধ-শান্তি করল। তারপর একে একে তারাও দেশের বাড়ি-টাড়ি ছেড়ে নানান্ দেশে ছড়িয়ে পড়ল। সে বাড়ির দেয়ালে ফাটল ধরল। বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়ে গেল। বর্ষার পরে প্রাচীরের কোণে কোণে শ্যাওলা জমে গেল। বাগানটায় অনেক ঝোপ-ঝাড়। তবুও মাঝে মাঝে শীতকালে ছুটির দিনে পাড়ার ছেলেমেয়েরা সেখানে চড়ুইভাতি করত।

একদিন গ্রামের লোকেরা দেখল কারা যেন সব অনেকে

মিলে এসে সেই বট-অশ্বত্থ-জড়ানো বাড়িটা, বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। মাপ-জোকও করছে। তারপর একদিন কোদাল, কুড়ুল, শাবল, গাঁইতি ঝুড়ি নিয়ে অনেক মানুষ এল। ধুমধাম, ঝন্‌ঝন্‌ ঠন্‌ঠন্‌ আওয়াজ করে বাড়ির দরজা জানালা, দেয়াল, ছাদ ভেঙে পড়তে লাগল। একী ব্যাপার? অনেকেই যাতায়াতের পথে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দ্যাখে। কেউ কেউ বলে,—আহা, এতদিনকার বাড়ি, এভাবে ভেঙে ফেলছে কেন গো? অনেকে বলে—ও বাড়িটা থেকেই বা কী হত? ও তো ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। রাত্তিরে চোর-ছ্যাঁচড়ের আড্ডা। তার চেয়ে জমিদারবাবুর নাতিপুতিরা বাড়িটা বেচে দিয়েছে, ভালই করেছে। বাড়িটা ভেঙে ওখানে কী হবে গো? কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে। বিজ্ঞ লোকেরা জানায়,—ফ্ল্যাটবাড়ি হবে, মস্ত বড় ফ্ল্যাটবাড়ি। চোদ্দ কি পনেরো তলা।

বাগানের বড় বড় গাছগুলো কিন্তু রেখেই দেওয়া হল। একদিকে শিউলি, গন্ধরাজ, কৃষ্ণচূড়া, আর একদিকে আম লিচু আর জামগাছ। শুধু একটা বড় গাছ কাটতে হল। বাড়ির পেছন দিকে সীমানার প্রাচীর ঘেঁষে একটা মস্ত বড় শালগাছ। এ গাছ নাকি অনেকদিন ধরেই ছিল। জমিদারবাবু যখন জমি কিনে এ বাড়িটা তৈরি করেছিলেন, তখন এ গাছটা ওঁর বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যেই ছিল। তিনি এ গাছ কাটেননি, রেখেই দিয়েছিলেন। জমির নতুন মালিকরা কিন্তু এ গাছ কেটে ফেললেন। কারণ বাড়ির পেছনে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের জন্য গাড়ি রাখার জায়গা করতে হবে।

গাছটাও বিক্রী হয়ে গেল। অনেক লোক এল কুড়ুল দড়ি আর ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে। তারপর তারা গাছটাকে টুকরো টুকরো করল যাতে ঠ্যালা গাড়িতে তোলা যায়। শেষে গাছসমেত ঠ্যালাটা চলে গেল কাঠগোলায়।

তারপর সেই শালকাঠ দিয়ে কত কীই যে তৈরি হল। একটা টেবিল, দুটো দরজার পাল্লা, একজন ধনী ব্যবসায়ী অর্ডার দিয়ে তৈরি করলেন একটা মস্ত বজরা। তাঁর অনেক দিনের শখ অবসর পেলে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সবাইকে নিয়ে বজরায় চড়ে নদীতে বেড়াবেন। অত বড় বজরার পর যা কাঠ রইল তাতে একটা ছিপ্‌ছিপে চেহারার ডিঙি ছাড়া আর কিছু হল না।

বজরাটার গায়ে খুব সুন্দর করে লিখে দেওয়া হল ময়ূরপঙ্খী। ছিপছিপে ডিঙিটা অবশ্য তেমনই রইল। কাঠগোলার ভেতরে দুজনে বেশ পাশাপাশিই রয়েছে। মাঝে মাঝে ডিঙিটা নড়ে ওঠে। ময়ূরপঙ্খী বজরা ফিসফিস করে বলে কীরে কাঁদছিস কেন? ডিঙি বলে, আমি তো তোমার মত ভারী নই। তাই একটু হাওয়ার ঝাপটা লাগলেই কেঁপে উঠি। বজরা বলে, কেমন দেখতে হয়েছে রে আমাকে?

—কী জানি, কেমন যেন বিদ্‌ঘুটে। পাতাগুলোও নেই, ফুল-টুল কিছু নেই। বজরা বলে—আমরা বেশ ছিলাম কিন্তু বাগানটায়। বর্ষার সময় ঝিরঝির করে বৃষ্টি এসে স্নান করিয়ে দিত। বসন্তে দক্ষিণের হাওয়ায় পাগলের মত সেই দুলে দুলে ডালপালা নাড়ানো। পাখিগুলো কী চমৎকার গাইত। ডিঙি বলে একটু সবুর করো। দেখবে কদিন বাদেই ঠেলে ঠেলে তোমাকে জলে ভাসাবে। বজরা রাগ করে বলে—ইঃ! জলে ভাসালেই হল! আমি কি জলে ভাসবার জন্য জন্মেছিলাম? দেখুক না ঠেলে। আমি নড়বই না।

এরপর সত্যিই একদিন বজরার মালিকের লোকজন এল চাকা লাগানো একটা মস্ত কাঠের পাটাতন নিয়ে। তারপর সাত আটজন মানুষ মিলে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বজরাটাকে ঠেলে ওই কাঠের পাটাতনটার ওপর তুলতে চেষ্টা করল। সেটা কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়ল না। বজরার মালিকও এসেছিলেন। যখন তৈরি হচ্ছিল, তখনও তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। তৈরির কাজ যত এগোত, দেখে দেখে তারিফ করে বলতেন—এ তো নৌকা নয়, জাহাজ!

আজ কিন্তু তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, এরকম ধুমসো একটা নৌকো বানাতে কে বলেছিল? এটা নড়াতেই যে হাতি লাগবে একটা। ঘণ্টাখানেক পরে ষন্ডা ষন্ডা পাঁচজন মানুষ এসে হাত লাগল। কিন্তু নৌকোটাকে একচুলও নড়াতে পারল না।

দারুণ চটে গেলেন বজরার মালিক। ছুতোর মিস্ত্রিদের সঙ্গে প্রচন্ড কথা কাটাকাটি করে চলে গেলেন। পরপর দুদিন আর এলেনই না।

সেই ছিপছিপে ডিঙিও বিক্রী হয়ে গেল। দুজন মাছমারা জেলে এসে ডিঙিটা তুলে নিয়ে গেল। বজরার পাশেই ছিল ও। নিয়ে যাবার সময় বজরার গায়ে একটু ঠেকে গেল। ডিঙি বলল—যাচ্ছিরে! বজরাটা হঠাৎ কেঁপে উঠে বলল—চলে যাচ্ছিস?

কাঠগোলায় লোকরা একটু অবাক হয়ে বলল,—আরে! বজরাটা যেন একটু নড়ল! আয় তো দেখি এটাকে ওই চাকাওলা পাটাতনটার ওপর ওঠাতে পারি কিনা! আশ্চর্য! অতগুলো ষন্ডা ষন্ডা জোয়ান যাকে একচুলও নড়াতে পারেনি,—কাঠগোলার চারপাঁচ জন রোগা রোগা মানুষ তাকে একটু ঠেলতেই সে দিব্যি উঠে গেল পাটাতনটার ওপর। কী কাণ্ড! কাঠগোলার মালিক বলল—শিগগির

বজরার মালিককে খবর দে।

এবার আর কোনো অসুবিধেই হল না। গড় গড় করে গড়িয়ে গেল বজরা। ঝপ্ ঝপ্ ঝপাস করে নেমে গেল নদীর জলে। বজরার মালিক তার ছেলেপুলেদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা মহানন্দে চেঁচিয়ে বলল—নেমেছে, নেমেছে। আমাদের বজরা এবার নদীতে ভেসেছে। ছোটরা বলল, —বাবা চল আজই আমরা বজরায় চড়ে বেড়াই।

—আজ থাক। সারাদিন নদীতে ভাসব। তারজন্য জোগাড়যন্ত্র করতে হবে তো! খাবার দাবার নিতে হবে। কাল ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ব।

পরদিন ভোরবেলায় সে কী হৈহৈ! কর্তাবাবু এলেন, সঙ্গে গিন্নিমা। পাঁচজন খোকাখুকু। দুজন রাঁধুনী। বজরার ছাদে রান্নার জায়গা। তার মাথার ওপর একটা ত্রিপল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাজা হচ্ছে লুচি, বেগুনবাজা। এক কড়াই আলুর দম নেমে গিয়েছে। চট্‌পটে ছোকরা চাকর মোহন সবাইকে খাবার ডিশ পৌঁছে দিল। মাঝি মাল্লা আছে চারপাঁচ জন। কিন্তু তারা দাঁড় টানছে না। একালের বজরা চলে মোটরে।

সারাদিন কেটে গেল দারুণ হৈ হৈ করে। নদীর পাড়ে শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়ানো কুমিররা, জঙ্গলের ভেতর ঘুরে ঘুরে ঘাস খাওয়া হরিণের দল, উঁচু গাছের ডালে হনুমান আর বাঁদরদের কিচিমিচি—এমনি কত কী যে দেখা হল!

বিকেল নাগাদ বজরার সারেঙ বলল,—বাবু এবার ফিরি। অনেকটা চলে এসেছি। এখন না ফিরলে রাত হয়ে যাবে। পৌষের বিকেল। একটু পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। খোকাখুকুদের একটু মন খারাপ হল, —এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে! এত তাড়াতাড়ি যাব না-আ-আ! চেঁচিয়ে উঠল সবাই!

—চুপ চুপ! সারেঙ চাপা গলায় বলল—মোহন, ওদের একদম চুপ করতে বল্। বজরা একটু এগোতেই সবার চোখে পড়ল পশ্চিমদিকে একটা খাঁড়ি ঢুকে গ্যাছে। তার দুপাশে ঘন জঙ্গল। খাঁড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ তীব্রবেগে একটা ছিপছিপে ডিঙি ছুটে এল। মাঝিরা ছাড়াও সে নৌকোয় বসে আছে আরো কিছু মানুষ। তাদের হাতে বন্দুক। সেই বন্দুক বজরার দিকে তাক্ করে তারা বলল, —বজরা থামাও নইলে এখুনি গুলি ছুঁড়ব। আমাদের নিশানা ভুল হয় না। সারেঙ ভয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। মোটর গেল থেমে। গিন্নীমা পাঁচ ছেলেমেয়েকে জাপটে ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। কর্তাবাবু ভয়ার্ত গলায় বললেন—এরা কারা? মোহন কাঁপাগলায় বলল—ওরা ডাকাত। বড় নৌকো দেখলেই এরকম ডাকাতি করে।

ডিঙি নৌকোটা তীরবেগে ছুটে আসতে লাগল তাদের দিকে। ডাকাতরা বন্দুক তাক করে আছে। মাঝিরা দাঁড় টানছে দ্রুত হাতে। সারেঙ হঠাৎ বুদ্ধি করে বাজিয়ে দিল তার বাঁশি। ভোঁ ভোঁ করে সে বাজতে লাগল, যেন চেঁচিয়ে বলছে—বাঁচাও, বাঁচাও!

হঠাৎ কী যে হল! ডাকাতদের ছিপছিপে ডিঙি বাঁইবাঁই করে ঘুরতে লাগল, যেন ঘূর্ণিজলে পড়ে পাকখাচ্ছে। ততক্ষণে জোয়ার এসে গ্যাছে। মাঝিরা প্রাণপণে চেষ্টা করল তাদের নৌকা সামলাতে। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে নৌকো হেলে গেল তারপর গেল উল্টে, এইবার 'বাঁচাও বাঁচাও' বলার পালা ডাকাতদের। সাঁতার অবশ্য সবারই জানা। উলটানো নৌকোর তলায় চাপা পড়েছিল কেউ কেউ। কিন্তু তারাও হাঁকপাঁক করে কোনোরকমে নৌকোর নিচ থেকে বেরিয়ে সাঁতার দিয়ে তীরের দিকে পালাবার চেষ্টা করল। ডাকাতদের হাত থেকে বন্দুক গেল ছিটকে।

বজরার সারেঙ-এর মধ্যেই মোটর চালু করে দিয়েছিল। সোঁ সোঁ করে চলতে শুরু করল সে। ফিরতে ফিরতে রাতই হয়ে গেল। উঃ বাপরে! কী বিপদেই পড়া গিয়েছিল! কর্তা বললেন, আর বজরায় চড়ে কোথাও যাচ্ছি না।

ডিঙি নৌকোটা সেই থেকে উপুড় হয়ে জলের ঢেউয়ে দোল খেতে লাগল, শেষ পর্যন্ত জল-পুলিশেরা এসে তুলে ফেলল তাকে। নদীর ঘাটে বজরা বেঁধে রেখে সারেঙ আর মাঝি-মাল্লারা যখন চলে গিয়েছে—তখন জল-পুলিশের লঞ্চ দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে এল সেই ডিঙি নৌকো। কার নৌকো? খোঁজ খোঁজ! মালিকের দেখা নেই। জল-পুলিশের লোকেরা বলল, এ নৌকো এখন আমাদের জিম্মায় থাকবে। কিন্তু থানার বড়বাবু বললেন, —থানায় নৌকো রাখবার জায়গা কোথায়? ওখানেই থাক।

দুই নৌকো পাশাপাশি শুয়ে রইল। বজরা বলল, হঠাৎ এমন ঘুরপাক খেলি কেন? ডিঙি বলল,—বাঃ, তুমি যে বললে বাঁশি বাজিয়ে—'বাঁচা বাঁচা, ভাইরে!' ঘুরপাক না খেয়ে পারি?

*ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য*

প্রথম কিস্তি



ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

রোজউড গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সামনের বিশাল হ্রদের দিকে তাকিয়ে ছিল সুদীপ্ত। হ্রদতো নয়, যেন সমুদ্র! 'লেক-তাঙ্গানিকা!' আফ্রিকা মহাদেশের ভুবন বিখ্যাত হ্রদ। সুদীপ্ত ভূগোলের বইতে কত পড়েছে এই হ্রদের কথা! আজ তার চোখের সামনে সেই হ্রদ! থর হেরম্যান কখন যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা খেয়াল করেনি সুদীপ্ত। তিনি তার কাঁধে হাত রাখতেই সুদীপ্ত একটু চমকে উঠে পিছনে ফিরে তাকালো। হেরম্যান তাঁর দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'কি, রাতে তাঁবুতে ঘুম ভালো হয়েছিল তো?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'ভালো। আপনার?'

তিনি বললেন, 'আমি মাঝরাতে উঠে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে তুত্সি কুলিদের সঙ্গে বসে ছিলাম। চাঁদের আলোয় কত জন্তু দলে দলে জল খেতে এল হ্রদে! জেব্রা, ওয়ার্টহগ, ইম্পালা, কুডু! একবার ভাবলাম তোমাকে ডাকি, তারপর মনে হল, তোমার দু-দিন টানা ধকল গেছে। বিশ্রামের দরকার। তাছাড়া, আজ থেকে আমাদের হাঁটা শুরু হবে। তোমাকে তাই ডাকিনি। এরপর তিনি হ্রদের ও পাশে দিক-চক্রবালের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'হ্রদের ও পাড়ে হল, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো।' আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি রিপাব্লিক অফ বুরুন্ডির পশ্চিম সীমানায়। এই হ্রদই হল দু-দেশের সীমারেখা।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'আমরা কোন দিকে এগোব?'

হেরম্যান বললেন, ''বুরুন্ডির ম্যাপটা তাহলে তোমাকে আগে বলি, 'মধ্য আফ্রিকার ভূখন্ড বেষ্টিত এই দেশের উত্তরে অবস্থিত আরও এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র 'রোয়ান্ডা।' আর তার ওপাশে, উগান্ডা। বুরুন্ডির পূর্ব থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সবটাই তাঞ্জেনিয়ার সীমানা ঘেরা। দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে তাঙ্গানিকা, আর উত্তর পশ্চিমে রয়েছে রুজিজি নদী। তাঙ্গানিকার মতো রুজিজি নদীর ওপাশেও, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। আমরা প্রথমে এগোব, আরও পশ্চিমে রুজিজির জলধারা যেখানে তাঙ্গানিকার সাথে মিশেছে সে দিকে। তারপর রুজিজির তীর বরাবর কিছুটা পশ্চিম ঘেঁসে উত্তরে- গ্রেট রিফট্ পার্বত্য অঞ্চলের উদ্দেশ্যে এগোব আমরা। ঐ পার্বত্য অঞ্চলের পিছনেই আছে গভীর অরণ্য আচ্ছাদিত অনেক মালভূমি। তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে রুভুভু

নামের এক নদী। ঐ নদীর পশ্চিম উপত্যকাই আমাদের গন্তব্য স্থল। কঙ্গো, রোয়ান্ডা, আর বুরুন্ডি—এই তিন দেশ দিয়ে ঘেরা সে জায়গা। গোরিলাদের বাসস্থান। আর মানুষ বলতে আদিম পিগমি জনজাতি।'

সুদীপ্ত তাঁর কথা শুনে বলল, 'আপনি, ও অঞ্চলে গেছেন এর আগে? আগেও তো আপনি আফ্রিকাতে এসেছেন বলে শুনেছি!'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আগে আমি একবার এ দেশে এলেও, এমন কি কঙ্গোতে গেলেও, গ্রেট রিফ্‌ট উপত্যকার দিকে যাইনি। আসলে, সেবার এসেছিলাম নিছক পর্যটক হিসাবে, আর এবারের আসা সত্যিকারের অভিযাত্রী হিসাবে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে লুকিয়ে থাকা রহস্যের সন্ধানে। এই বলে হাসলেন হেরম্যান।

সুদীপ্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি হেরম্যান। আমি নয় এখানে আপনার সাথে এসেছি বহু আকাঙ্খিত আফ্রিকা দেখব বলে। আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন, যা দেখাবেন, তা সবটাই আমার কাছে নতুন, সবই আমার ভালো লাগবে। নতুন কোন জায়গাতে বেড়াতে গেলে যেমন লাগে। কিন্তু আপনার ব্যাপারটাতো ঠিক তেমন নয়, আপনি যার সন্ধানে এবার এ দেশে এসেছেন, তার ব্যাপারটা নিছক গল্প কথা নয়তো?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর হেরম্যান বললেন, 'সম্ভবত ব্যাপারটা তা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, গত পঞ্চাশ বছর ধরে তার কথা বিভিন্ন সময় শোনা গেছে। শুধু স্থানীয় মানুষেরাই নয়, বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান ইওরোপীয় অভিযাত্রীও দূর থেকে তাকে দেখেছে। এঁরা সকলে মিথ্যে কথা বলবেন, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।'

হেরম্যান এ প্রসঙ্গে আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কিছু দূরে তাঁবুর কাছ থেকে তুত্‌সি কুলিদের সর্দার ও পথ প্রদর্শক টোগো বলে লোকটা ডাক দিল তাঁকে। হেরম্যান তার ডাক শুনে সুদীপ্তকে বললেন, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখো, আমি ওদের কাছে যাই। আর আধঘন্টার মধ্যেই যাত্রা শুরু করব আমরা। তার আগে কুলিদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।' এই বলে তাঁবুর দিকে এগোলেন হেরম্যান।

তাঙ্গানিকার বিপুল জলরাশির দিকে তাকিয়ে মনে মনে হেরম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সুদীপ্ত। তিনি তাঁর সঙ্গী হবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ না জানালে বহুশ্রুত এই রহস্যময় মহাদেশে পদার্পণের সৌভাগ্য হত না সুদীপ্তর। হেরম্যান থাকেন মিউনিখে আর সুদীপ্ত কলকাতাতে। কত দূরত্ব দুই শহরের মধ্যে। সুদীপ্ত একটা বেসরকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। ভ্রমণের শখ আছে তার। একলা যুবক, সময় পেলেই সে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। বছর দু-এক আগে বন্ধুদের সাথে নেপালে বেড়াতে গেছিল সে। সেখানে কাঠমান্ডুর এক হোটেলের লবিতে হেরম্যানের সাথে কাকতালীয় ভাবে সুদীপ্তর পরিচয় হয়। সাতদিন সে হোটেলে এক সঙ্গে থাকাতে সুদীপ্তর সাথে অসম বয়সী বছর পঞ্চাশের হেরম্যানের সম্পর্ক প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আসলে, হেরম্যান তাকে প্রচন্ড ভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। সেই সম্পর্ক গত দু-বছর ধরে ফোন মারফৎ আলাপ ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও দৃঢ় হয়, যার ফলশ্রুতি সুদীপ্তকে তাঁর বুরুন্ডি অভিযানের সঙ্গী হবার জন্য আমন্ত্রণ ও তাতে সাগ্রহে সাড়া দিয়ে সুদীপ্তর এই অচেনা দেশে আসা। একে তো আফ্রিকা ভ্রমণ, তার ওপর আবার হেরম্যানের সাহচর্য্য! এ দু-এর অমোঘ আকর্ষণ সুদীপ্তকে এনে দাঁড় করিয়েছে এই লেক তাঙ্গানিকার ধারে।

হেরম্যানের প্রতি সুদীপ্তর যে আকর্ষণ তাদের দুজনের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে, সে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল হেরম্যানের অদ্ভুত শখ বা কৌতূহল, যা তারুণ্যে ভরপুর পঞ্চাশ বছরের যুবক অকৃতদার হেরম্যানকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে। হেরম্যান কিন্তু সে অর্থে নিছক গ্লোবট্রটার নন। ''আমি একজন 'ক্রিপটজুলজিস্ট'-এ ভাবেই সুদীপ্তর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন হেরম্যান। 'জুলজিস্ট' শব্দের অর্থ সকলের মতো সুদীপ্তর জানা থাকলেও 'ক্রিপটোজুলজিস্ট' শব্দের অর্থ তার জানা ছিল না তার। হেরম্যানই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন চমকে দেবার মতো বিষয়টা। ক্রিপটোজুলজি নিয়ে যারা চর্চা বা অনুসন্ধান করেন তাদের বলা হয় 'ক্রিপটোজুলজিস্ট।' 'ক্রিপটোজুলজি' এ শব্দের প্রবক্তা জীববিজ্ঞানী বার্নাড হুভেলম্যানস। এ শব্দের অর্থ ধাঁধা প্রাণীবিদ্যা।' ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। এই বিশাল পৃথিবীর আনাচে কানাচে অনেক সময় এমন অনেক জীবের কথা শোনা যায় প্রচলিত জীববিজ্ঞান যাদের উপস্থিতি প্রমাণের অভাবে স্বীকার করে না। পর্যটকদের বিবরণ, স্থানীয় উপকথা, বা গল্প কাহিনীতে ঐ সব জীবের খোঁজ মেলে। কিন্তু তাদের উপস্থিতির কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। যেমন, হিমালয়ের 'ইয়েতি', ক্যালিফর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের ইয়েতির সমগোত্রীয় 'বিগফুট'। বা মালয়ের জঙ্গলের 'লোমশ মানুষ', স্কটল্যান্ডের লেক নেসির লম্বা গলার জলদানব 'নেসি', আফ্রিকার মাউন্ট কিলম্যানজারোর পাদদেশের জঙ্গলের ডাইনোসরের মতো ভয়ঙ্কর প্রাণী

'বুনিপ' এ সবই হল সে সব প্রাণীর উদাহরণ যাদের অনেকেই দেখেছেন বলে দাবী করেন, কিন্তু কেউ কোন দিন তাঁদের খাঁচায় পুরে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলের সামনে হাজির করতে পারেন না। কাজেই প্রচলিত জীব বিজ্ঞান এই সব প্রাণী বা 'ক্রিপটিড'দের মানে না, এবং যাঁরা তাদের অন্বেষণ করে বেড়ান, তাঁদেরকেও প্রাপ্য সম্মান দেয় না। হেরম্যানের মতো ক্রিপটোজুলজিস্টরা এমনকি অনেক সময় পাগল বা প্রবঞ্চক বলেও আখ্যায়িত হন। ক্রিপটোজুলজিস্টদের ভাগ্যে অর্থ বা সম্মান কোনটাই জোটে না। তাঁরা এ কাজ করেন এ ব্যাপারে আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। যেমন এই হেরম্যান। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন একদা। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটা ডিগ্রি আছে তাঁর। অনায়াসে তিনি একটা অধ্যাপনার চাকরি জোটাতে পারতেন। অথবা পৈত্রিক ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যবসাতে মন দিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে সব কিছু না করে পৈত্রিক কারবার বেচে দিয়ে সেই পয়সাতে 'ক্রিপটিড' নামের আলেয়ার পিছনে ধাওয়া করে বেড়ান সারা পৃথিবী। কাঠমান্ডুতে যেবার সুদীপ্তর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল সেবার তিনি গিয়েছিলেন 'প্যাংবোচে মনাস্ট্রিতে' ইয়েতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহর জন্য। নেপাল হিমালয়ের বেশ কিছুটা অঞ্চলও তিনি চষে বেড়িয়েছিলেন ইয়েতির খোঁজে! এ ছাড়া জাভার জঙ্গলে প্রগৈতিহাসিক উড়ুক্কু দানব 'আ-হুল', আর ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকাতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া এক মানবগোষ্ঠীর সন্ধানে অভিযানে গেছিলেন তিনি। হেরম্যানের এই আশ্চর্য কর্মকান্ডই তাঁর প্রতি সুদীপ্তর আগ্রহ বা আকর্ষণের কারণ। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। খুব সুন্দর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী বলতে পারেন হেরম্যান। এ ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই সুদীপ্তর দুর্বলতা আছে। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী পড়তে শুনতে ভালোবাসে সে। এটাও তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠার পিছনে কাজ করেছে।

ইতিপূর্বে হেরম্যান যতগুলো অভিযানে গেছেন, তার কোনটাতেই তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কোন ক্রিপটিডেরই সাক্ষাৎ পাননি তিনি। শুধু মালয়ের জঙ্গলে এক বিকালে কোন এক অজানা প্রাণীর গম্ভীর ডাক শুনেছিলেন। গাইড জানিয়েছিল ওটাই 'আ-হুল' এর ডাক! ব্যস এ পর্যন্তই। হেরম্যানের এবারের অভিযানও এক ক্রিপটিডের সন্ধানে। বুরুন্ডির উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গ্রেট রিফট উপত্যকায় রুভভু নদীর বনাঞ্চলে নাকি এক দানবাকৃতির সবুজ বানর আছে। মানুষের মতো নাকি দু-পায়ে চলাফেরা করে সে। বুরুন্ডি দেশটা হল পিগমিদের আদি বাসস্থান। সর্বত্রই তাদের কমবেশী দেখা মেলে। যে গহীন বনাঞ্চলে ঐ সবুজ বানর থাকে, সে অঞ্চলে নাকি পিগমিদের একটা অসভ্য গোষ্ঠী বাস করে। তারা পূজো করে ঐ প্রাণীকে। বিষাক্ত তীর হাতে ঐ বনাঞ্চলে পাহারা দেয়। বাইরের কোন মানুষকে তারা সে অরণ্যে প্রবেশ করতে দিতে চায় না। আফ্রিকার এ হেন দুর্গম অঞ্চলে ঐ সবুজ বানরের সন্ধানে হেরম্যানের সঙ্গী হয়ে অভিযানে অংশ নিতে চলেছে সুদীপ্ত। পদব্রজে এই অভিযান। হেরম্যান সুদীপ্তকে বলেছেন, গাইডের কথা অনুসারে জায়গাটায় পৌঁছতে দিন চারেকের মতো সময় লাগার কথা।

হেরম্যান চলে গেলেন তাঁবুর দিকে। সুদীপ্ত দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। লেকের ধারে কাদা মাটিতে নানা ধরণের জন্তুর পায়ের ছাপ আঁকা হয়ে আছে। বিচিত্র সব চিহ্ন! সুদীপ্ত দেখতে লাগল সেগুলো। একটু পরেই হেরম্যান হাঁক দিলেন তাকে। সুদীপ্ত ফিরল তাঁবুর দিকে। তুতসি কুলিরা ততক্ষণে তাঁবু গোটাতে শুরু করেছে। সুদীপ্ত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে একজন লোক তার আর হেরম্যানের জন্য প্রাতরাশ সাজিয়ে আনল। বেশ বড় একছড়া কলা, অনেকগুলো মোটা মোটা মিষ্টি রুটি আর কফি। প্লেটে খাবারের পরিমাণ দেখে সুদীপ্ত বলল, 'এই ভোর বেলা এত খাবার খাব কি করে?'

হেরম্যান বললেন, 'যতোটা পার খেয়ে নাও। এটা নিছক প্রাতরাশ নয়। সারা দিন এর ওপর ভরসা করেই কাটাতে হবে আমাদের। সন্ধ্যায় তাঁবু পড়ার পর আবার খাবার মিলবে। এ পথে একটু কষ্ট করতে হবে আমাদের। আশা করি এ ব্যাপারটা একটু মানিয়ে নেবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'না না, আপনি এ সব ব্যাপার নিয়ে ভাববেন না। আমার কোন অসুবিধা হবে না। একটু কষ্ট না থাকলে যে কোন অভিযানের আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়।'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। কষ্ট, রোমাঞ্চ যদি না থাকে, তাহলে আবার অ্যাডভেঞ্চার কিসের?'

এরপর একটা রুটি ছিঁড়ে মুখে দিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে তিনি বললেন, 'যত ভোর ভোর যাত্রা করা যায় ততই ভালো। আফ্রিকার সূর্য বড় প্রখর। যত বেলা বাড়বে, এগোতে তত বেশি অসুবিধা হবে আমাদের।' এরপর আর কথা না বলে খেতে শুরু করল সুদীপ্তরা।

তাদের যখন খাওয়া শেষ হল, ততক্ষণে তাঁবু গুটিয়ে ফেলেছে কুলিরা। সুদীপ্তদের এরপর আরও মিনিট দশেক সময় লাগল একদম তৈরি হয়ে নিতে। যাত্রা শুরুর আগে সকলে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল একটা গাছের নিচে। সব মিলিয়ে দলে দশ জন লোক। হেরম্যান, সুদীপ্ত ছাড়া, অভিযানের পথ প্রদর্শক টোগো, চারজন তুতসি মালবাহক কুলি আর চারজন হুটু বন্দুকধারী রক্ষী বা আস্কারি। সুদীপ্ত

লক্ষ করে দেখল, আস্কারি চারজন ছাড়াও অন্যদের কাছেও কিছু না কিছু অস্ত্র আছে। পথ প্রদর্শক টোগোর কাঁধে একটা নতুন রাইফেল। মনে হচ্ছে সবাই যেন যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। অবশ্য আফ্রিকার অরণ্য প্রদেশে অভিযানে যেতে হলে সঙ্গে অস্ত্র রাখাটা একটা আবশ্যিক ব্যাপার। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে টোগো, কিসোয়াহিলি ভাষাতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কি যেন বলল, কুলি আর আস্কারিদের উদ্দেশ্য। সম্ভবত যাত্রা শুরুর আগে সে প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলো জানিয়ে দিল সকলকে। এরপর একজন তুতসি একটা মাটির সরাতে ধুনো জাতীয় কোন কিছু জ্বালিয়ে গাছের গুড়ির নিচে নামিয়ে রাখল। অন্য তুতসিরা কি যেন বলতে বলতে ডান হাতে গাঁছের গুঁড়িটা ছুঁয়ে বার তিনেক গাছটাকে প্রদক্ষিণ করল। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'কোন লৌকিক দেবতার উদ্দেশ্যে পূজো নিবেদন করল ওরা।' তারপর কুলিরা মালপত্র উঠিয়ে নিল পিঠে। এক সুন্দর সকালে যাত্রা শুরু হল সুদীপ্তদের। তাঙ্গানিকার ধার ঘেষে পায়দলে এগোতে থাকল সবাই। বাঁ পাশে হ্রদ, ডান পাশে ঘাসে ছাওয়া দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে কিছুদূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ। কিছু ঝোপঝাড়ও আছে। সার বেঁধে চলেছে সবাই। সবার প্রথমে পথপ্রদর্শক টোগো আর দু-জন আস্কারি। নিজেদের মধ্যে কিসোয়াহিলি ভাষায় অবিরাম কথা বলে চলেছে তারা। তারপর সুদীপ্ত আর হেরম্যান। আর তাদের পিছনে তুতসি কুলিরা ও অন্য দুজন আস্কারি। হেরম্যান বেশ উৎফুল্ল। মাঝে মাঝে তিনি গুন গুন শব্দে গান করছেন। পথ চলতে চলতে এক সময় তিনি বললেন, 'অজানার উদ্দেশ্য এই পথ চলার মধ্যে কিন্তু আলাদা একটা আনন্দ আছে। কত কিছু জানা যায়, শেখা যায়! অনেক অভিযান হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ ঘরে ফেরে তাকে কাঞ্চন মূল্যেও পরিমাপ করা যায় না। সেই অভিজ্ঞতাই মানুষকে আবার উৎসাহিত করে ঘর ছাড়তে, প্রস্তুত করে নতুন অভিযানের জন্য।'

এরপর তিনি বললেন, 'দেখ সুদীপ্ত, আমরা যারা ক্রিপটিডের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই তাদের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা অনেকেই বিদ্রুপ করেন, এমন কি পাগল পর্যন্তও বলে থাকেন। কিন্তু এই জীবজগতে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের সন্ধান কিন্তু আমার মতন ভবঘুরে ক্রিপটোলজিস্টরাই 'ঘরে বা ল্যাবরেটরিতে বসে পুঁথি পড়া বা টেস্টটিউব ফানেল নিয়ে নাড়াচাড়া করা' পন্ডিত বিজ্ঞানীকুলকে প্রথম দিয়েছিলেন।

সুদীপ্ত উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা কি রকম?'

হেরম্যান উৎসাহের সাথে বলতে শুরু করলেন, 'যেমন ধর সিলাকান্থ মাছের কথা। এক চল্লিশ কোটি বছরের প্রাচীন জীবাশ্মতে তার খোঁজ পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর প্রথমেও পুঁথিপড়া জীব বিজ্ঞানীরা বলতেন ও মাছ বহুকোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! কিন্তু কোমোরো দ্বীপের জেলেদের কাছ থেকে ক্রিপটোজুলজিস্টরা যখন প্রথম এ মাছের কথা জানতে পেরে তা পৃথিবীর কাছে বললেন, তখন 'এ ব্যাপারটা নাকি সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজী!' এমনই মত প্রকাশ করলেন পুঁথি পড়া বিজ্ঞানী মহল। তাঁদের কেউ কেউ আবার বিবর্তনবাদের কূটব্যাখ্যায় বুঝিয়ে দিলেন কেন পৃথিবীতে আর টিকে থাকতে পারে না তারা! অথচ কোমোরো দ্বীপের নিরক্ষর জেলেরা কিন্তু বংশপরম্পরায় জানতো তাদের কথা! সেই জেলারা ও-মাছকে ডাকত 'গামবোসা' বলে। অর্থাৎ 'দানব মাছ'। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালে সে মাছ হাজির করা হল পন্ডিত প্রবর বিজ্ঞানীদের সামনে। তখনও তারাও কিন্তু, 'কিন্তু-কিন্তু' করছেন। ১৯৮৮ সালে জলের তলায় গিয়ে যখন তাদের জীবন্ত ছবি তুলে আনা হল, তখন বিজ্ঞানীরা পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন ব্যাপারটা। অথচ এরাই একদিন বলে ছিলেন, ক্রিপটোলজিস্টরা প্রতারিত করতে চাইছে বিজ্ঞানী মহলকে। বোঝ একবার ব্যাপারটা!

একই রকম ব্যাপার বলা যায় অক্টোপাসের দানবীয় রূপ 'জায়েন্ট স্কুইড' সম্বন্ধে যারা মানুষকে জেলে ডিঙি থেকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে টেনে নিয়ে হত্যা করতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গভীর সমুদ্রে যাওয়া নাবিকরা বলে আসছিল তাদের কাহিনী। গল্পগাথায় তাদের কথা চিত্রায়িতও করে আসছিল। আর তাদের কথা বার বার করে বলে আসছিল ক্রিপটোজুলজিস্টরা। প্রচলিত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকুল জায়েন্ট স্কুইডের ব্যাপারটাকে ভাবতেন রূপকথা বর্ণিত কোন প্রাণী। তাঁরা হেসে উড়িয়ে দিতেন তার কথা। ২০০৪ সালে জাপানের 'ন্যাশানাল সায়েন্স মিউজিয়ামের' একদল লোক যখন গভীর সমুদ্রে গিয়ে প্রথম জায়েন্ট স্কুইডের ছবি তুলে আনলেন তখন বোবা হয়ে গেল বিজ্ঞানী মহল। পরের এক্সপিডিশনটা হল ২০০৬ সালে। মুভি ফিল্ম তুলে আনা হল জায়েন্ট স্কুইডের। ক্রিপটোজুলজিস্টরা যদি বার বার তার উপস্থিতির কথা না বলতেন, তাহলে নিছক রূপকথার প্রাণী হয়েই থেকে যেত জায়েন্ট স্কুইড।

'রূপকথা'র কথা শুনে সুদীপ্ত চলতে চলতে বলল, 'জানেন, আমাদের রূপকথাতে 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী' বলে দুটো পাখির কথা আছে। যারা নাকি মানুষের মতো কথা

বলতে পারত! গল্প করতে পারতো।'

হেরম্যান বললেন, 'তাই নাকি! এটা আমার জানা ছিল না। টিয়া, কাকতুয়া ইত্যাদি প্যারাকিট প্রজাতির পাখিরাতো এমনিতেই মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করতে পারে। হয়তো সেই পাখি সত্যি গল্পও করতে পারত। শতাব্দী প্রাচীন রূপকথা যারা সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের কল্পনার কোন ভিত্তি থাকে। এমনি এমনি কল্পনা করা যায় না। হয়তো সে পাখি সত্যি একদিন ছিল বা এখনও আছে। আমরা তার খোঁজ জানি না। সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে কোন ক্রিপটোলজিস্ট তুলে ধরবে তার কথা। সে পাখি হাজির হয়ে চমকে দেবে পৃথিবীকে। পাথফাইন্ডার বা ইন্টারনেটের যুগ হলেও যে জীবজগতের সব রহস্য আমরা জেনে গেছি এমন ভাবা ভুল। ইন্দোনেশিয়ার দানবাকৃতির সরীসৃপ 'কোমোডো ড্রাগন' বা তাসমেনিয়ার হংসচঞ্চু ডিমপাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী 'প্লাটিপাস'-এর প্রথম খোঁজ পাওয়া গেছিল রূপকথাতেই। পরবর্তীকালে সত্যিই এদের সন্ধান মিলল। আর এ ব্যাপারে ক্রিপটোলজিস্টরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। রূপকথার প্রাণী বাস্তবে আবির্ভূত হয়েছে, এমন আরও উদাহরণ আমি তোমাকে দিতে পারি।'

সুদীপ্ত এরপর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথাটাও বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা বড় বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে ভেবে আর বলল না।

হেরম্যান সুদীপ্তকে এ সব প্রসঙ্গে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন,, হঠাৎ অগ্রবর্তী টোগো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আঙুল তুলে কি যেন দেখাল। দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। সুদীপ্তদের যাত্রাপথের কিছু দূরে একটা বিরাট গাছ দাড়িয়ে আছে। সকালের নতুন সূর্যের আলোয় লম্বা গলা বাড়িয়ে গাছটার মগডাল থেকে কচিপাতা খাচ্ছে দুটো জিরাফ! এখানে এসে এই প্রথম ওয়াল্ড লাইফ দেখতে পেল। সকলে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। হেরম্যান বললেন, 'কি সুন্দর দৃশ্য!' সুদীপ্ত রুকস্যাক খুলে ক্যামেরা বার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভোরবেলা এই দুপেয়ে প্রাণীগুলোর অবাঞ্ছিত উপস্থিতি মনে হল পছন্দ হল না জিরাফ দুটোর। সুদীপ্তকে ছবি তোলার সুযোগ না দিয়ে, লম্বা লম্বা পা

ফেলে ঘাসবনের ভিতর দিয়ে তারা ছুটতে শুরু করল মাঠের অন্য দিকে।

সুদীপ্ত একটু আক্ষেপের সুরে বলল, 'ইস এত সুন্দর ছবিটা তোলা গেল না!

হেরম্যান বললেন, 'আক্ষেপ কর না। এমন আরও অনেক দৃশ্য আমাদের যাত্রা পথে পড়বে।'

আবার চলতে শুরু করল সবাই। সুদীপ্তদের এক পাশে তাঙ্গানিকার কাদামাটি মাখা পাড়, অন্যপাশে ঘাসবন, প্রান্তরের সীমারেখা। মাঝের একচিলতে শক্ত মাটি ধরে এগোচ্ছে তারা।

চলতে চলতে সুদীপ্ত এক সময় প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা এখানে সিংহ আছে?'

প্রশ্নটা সে হেরম্যানকে করলেও টোগো তা শুনতে পেয়ে বলল, 'সিংহতো আফ্রিকার সব জঙ্গলেই কম বেশী আছে। তবে আমরা এখন যে পথে হাঁটছি তার খুব কাছাকাছি নেই বলেই মনে হয়। ওরা সাধারণত বড় জলাশয় থেকে দূরে দু-একটা গাছওলা ফাঁকা জমিতে দল বেঁধে ঘোরে। ছোট ঘাসওলা শক্ত জমি তাদের পছন্দ। আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে প্রচুর সিংহ আছে।'

এরপর একটু থেমে বলল, 'কিন্তু এই ঘাসবনে চিতা আছে। মাঝে মাঝে মাটিতে ওদের পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। তবে সচারচর এই রকম ফাঁকা জায়গাতে দিনের বেলায় ওরা মানুষকে আক্রমণ করে না। আফ্রিকার সিংহ গোরিলা আর হাতি ছাড়া জঙ্গলের অন্যসব প্রাণী মানুষকে কমবেশী ভয় পায়। ঐ তিন প্রাণীর কথা অবশ্য আলাদা। আপনার হাতে রাইফেল থাকলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় না সত্যিকারের কে শিকারী আর কেই বা শিকার? নিজের বনে ওরা হল রাজা।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ঐ তিন রাজার মধ্যে লড়াই বাঁধে না?'

টোগো জবাব দিল, 'হাতি আর গোরিলার মধ্যে সাক্ষাত হয় না বললেই চলে। গোরিলা থাকে গভীর অরণ্য আচ্ছাদিত পাহাড়ের ঢালে বা তার পাদদেশের অরণ্যে। হাতি সেখানে যায় না। কিন্তু সিংহর গতিবিধি সর্বত্র। মাঝে মধ্যেই তার সাথে অন্য দুই প্রাণীর সাক্ষাত হয়ে যায়। কলেবরে হাতির শক্তিবেশী। স্বভাব সুলভ রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে চলে। সচরাচর অহেতুক কোন প্রাণীকে সে আক্রমণ করে না। গোরিলার মধ্যে কিন্তু হিংস্রতা আর আক্রমণের প্রবণতা আছে। নিজের রাজ্যে তারা অন্য কারো উপস্থিতি সহ্য করে না। আর সিংহ যেমন হিংস্র তেমনই ধূর্ত। সর্বত্রই এ প্রাণীর অবাধ গতিবিধি। মাঝে মাঝেই অন্য দুই প্রাণীর সাথে তার সাক্ষাত হয়ে যায়। তখন প্রলয় ঘটে। বনের সব প্রাণী জেনে যায়, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে। সে লড়াই চলে আমৃত্যু।'

এগিয়ে চলল সুদীপ্তরা। সময় যত এগিয়ে চলল সূর্যের তেজও তত বাড়তে লাগল। আফ্রিকার প্রখর সূর্য! তাও আবার মধ্য আফ্রিকা! সুদীপ্তদের সকলেরই পরনে হালকা পোশাক, কিন্তু তাও ঘামে ভিজে যেতে লাগল। একটা গাছের তলায় এরপর দুটো অ্যান্টিলোপ চোখে পড়ল তাদের। আফ্রিকার ঝলসানো ধূ ধূ প্রান্তরে প্রচন্ড সূর্যের তেজ থেকে বাঁচতে গাছের ছাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে ওরাও। সুদীপ্ত দেখল তার ঘড়িতে সবে দশটা বাজে। অর্থাৎ মাত্র ঘন্টা তিন চারেক হেটেছে তারা। এর মধ্যেই এই অবস্থা! তবে টোগোর কথা বলার বিরাম নেই। সে আস্কারির সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে সুদীপ্তদের এটাও ওটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। তাতে পথশ্রমের ক্লান্তি তাদের কিছুটা লাঘব হচ্ছে। আরও বেশ কিছুটা চলার পর একপাল হিপো দেখতে পেল তারা। লেকের পাড়ের কাদামাটিতে গা ডুবিয়ে বসে ছিল দলটা। সুদীপ্তরা তাদের কাছাকাছি যেতেই প্রাণীগুলো প্রথমে উঠে দাঁড়াল। গোল গোল লাল চোখ দিয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল তাদের। একটা প্রাণী একবার একটা বিরাট হাঁ করল। ততক্ষণে অবশ্য তাদের বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিয়েছে সুদীপ্ত। টোগো বলল, 'বিরাট কলেবরের হলেও এ প্রাণীগুলো সাধারণত অন্য প্রজাতির প্রাণীদের সাথে ঝঞ্ঝাটে যায় না। তবে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই লড়াই করে। ওভাবে মারাও যায় অনেকে। জলহস্তিগুলোকে দেখায় ও তাদের ছবি তুলতে পারায় প্রচন্ড গরমের মধ্যেও সুদীপ্তর চলার একটা উৎসাহ ফিরে এল। চারপাশে তাকাতে তাকাতে টোগোর পাশে পাশে তাকে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে করতে এগোল সে।

বেলা বারোটা নাগাদ একটা গাছের তলায় বিশ্রামের জন্য তারা থামল। আধ ঘন্টার জন্য একটু জিরিয়ে নেওয়া, একটু জলপান, তারপর আবার পথ চলা। এবার সূর্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য যতদূর সম্ভব ঝোপঝাড় ঘেঁসে

চলতে থাকল সকলে। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে চলছে টোগো, সামান্য কোন শব্দ জঙ্গলের মধ্যে শুনলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। থেমে যাচ্ছে অন্যরাও। এ দফায় পথ চলতে একটু যেন সতর্ক টোগো। হেরম্যান তার কারণ জানতে চাওয়াতে সে বলল, 'এখানে চিতার আড্ডা আছে। মাটিতে মাঝে মাঝেই পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।' তার কথা শুনে সতর্ক হয়ে গেল সকলে। আস্কারিরা বন্দুক কাঁধ থেকে হাতে নিল। ঘন্টা তিনেক চলার পর এক সময় সূর্য্যের তাত কমে এল। টোগো হেরম্যানকে বলল, 'এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে 'হুটু' উপজাতীয়দের একটা গ্রাম আছে। এ তল্লাটে আমাদের যাত্রা পথে ওটাই শেষ গ্রাম। তাড়াতাড়ি পা চালালে সন্ধ্যার আগেই ওখানে পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে। তাহলে আর জঙ্গলে তাঁবু ফেলার হ্যাঙ্গামা থাকে না। জায়গাটা জঙ্গলের তুলনায় নিরাপদও বটে। তবে সেখানে যেতে হলে তাঙ্গানিকার পাড় ছেড়ে সামান্য পুবে এগোতে হবে। তাতে কাল সকালে শুধু সামান্য বাড়তি হাঁটতে হবে আমাদের।'

হেরম্যান শুনে বললেন, 'তাহলে তাই চলো। এদিককার কিছু খবরও পাওয়া যেতে পারে সেখানে গেলে।'

তাঁর সম্মতি পাওয়ার পর সামান্য গতিপথ পরিবর্তন করল টোগো। তারা এবার এগোল ঝোপঝাড় ছেড়ে ঘাসে ভরা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। তাদের সাথে সাথে মাথার ওপর সূর্যদেবও পশ্চিমে পরিক্রমণ শুরু করলেন। চলতে চলতে বড় ঘাসের জঙ্গল অতিক্রম করে এক সময় তারা এসে উপস্থিত হল এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। সূর্যের আলো নরম হয়ে এসেছে তখন। সুদীপ্ত আশ্চর্য্য হয়ে দেখল, অসংখ্যা জেব্রা, আর অনেকটা বড় বাছুরের মত দেখতে দাড়িওলা প্রাণী চরে বেড়াচ্ছে সেখানে। দূর থেকে দুটো জিরাফও চোখে পড়ল তার। টোগোর মুখ থেকে সুদীপ্ত শুনল, ঐ দাড়িওলা প্রাণীগুলোর নাম নাকি 'উইল্ডা বিস্ট' (wilde beest)। আফ্রিকার অন্য প্রদেশের সর্বত্রই প্রায় এদের দেখা মেলে। তবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পাশের রাজ্য তাঞ্জেনিয়ার সেরেঙ্গেটিতে। জুলাই মাস নাগাদ আফ্রিকার তৃণভোজী প্রাণীদের বিখ্যাত মাইগ্রেশন পর্ব শুরু হয়। সে সময় হাজার হাজার 'উইল্ডা বিস্ট' সার বেঁধে সেরেঙ্গেটি থেকে যাত্রা শুরু করে কেনিয়ার মাসাইমারা অরণ্যের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ সেই যাত্রাপথে তাদের একটা বড় অংশ নদী পার হতে গিয়ে কুমিরের পেটে আর সাভানাতে সিংহ চিতার পেটে যায় বলে বাঁচোয়া। নইলে নাকি ঐ প্রাণীতে সারা আফ্রিকা ছেয়ে যেত!

জেব্রা আর উইল্ডা বিস্টের দঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সেই প্রান্ত অতিক্রম করতে ঘন্টাখানেক সময় লাগল। অবশেষে তারা এসে উপস্থিত হল সেই গ্রামের কাছে। গ্রাম মানে, তিনটে বড় গাছের নিচে গোটা পনেরো মাটির দেওয়াল আর শন ছাওয়া ঘর। তাকে বেষ্টন করে গাছের গুঁড়ির প্রাচীর। সুদীপ্তরা গ্রামের বাইরে উপস্থিত হতেই গ্রামের ভিতর থেকে পিল পিল করে লোক বেরিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল তাদের। তার মধ্যে বৃদ্ধ-নারী-শিশু সবই আছে। অধিকাংশর পরনে মলিন বস্ত্র, খালি পা, শিশুগুলো উলঙ্গ। দেখলেই বোঝা যায় এরা ভীষণ গরীব। শুধু তার মধ্যে একজন বিশালবপু মানুষের পোশাক একটু ঝলমলে। গলায় নানা রঙের পাথরের মালা। একটা চিতার মাথা সমেত ছাল সে শালের মতো জড়িয়ে রেখেছে উর্ধাঙ্গে। তার গা ঘেঁসে একজন বর্শাধারী রক্ষীও আছে। সুদীপ্ত লক্ষ করল লোকটার পায়ে একজোড়া নতুন হাই হিলবুট। টোগো লোকটাকে ইশারায় দেখিয়ে বলল ঐ লোকটাই এ গ্রামের মোড়ল ও পুরোহিত। লোকটা বেশ কিছুক্ষণ সতর্ক চোখে দেখল সুদীপ্তদের, তারপর সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলল! টোগো তার জবাব দিল, তারপর পোশাকের ভিতর থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স বার করে সেটা খুলল। তার মধ্যে সাজানো আছে চুরুট। সুদীপ্ত টোগোকে ধূমপান করতে দেখেনি। সে একটু অবাক হল বাক্সটা দেখে। টোগো এরপর বাক্সটা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেটা ধরল মোড়লের সামনে। লোকটা একটা চুরুট তুলে নাকের কাছে নিয়ে কিছুক্ষণ শুকল, তারপর চুরুটের বাক্সটা তার হাত থেকে নিয়ে টোগোর সাথে অজানা ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। সুদীপ্তরা তাদের দুজনের কিছু দূরে দাড়িয়ে রইল। সুদীপ্ত, হেরম্যানের দিকে তাকাতেই, তিনি চাপা স্বরে বললেন, 'চুরুটগুলো ওকে খুশি করার জন্য টোগো উপঢৌকন দিল। তামাক জিনিসটা এরা ভারী পছন্দ করে। আফ্রিকার বনাঞ্চলে তামাক চাষ হয় না। তাই অরণ্য উপজাতিদের কাছে তামাক বড় লোভনীয়। একটা সময় ছিল, যখন ইওরোপীয়রা এ সব গ্রামে ঘুরে ঘুরে আদিবাসীদের সিগার বা চুরুট উপহার দিত। আর সামান্য তামাকের পরিবর্তে তারা এদের কাছ থেকে কি পেত জানো? আনকাট ডায়মন্ড! যার মূল্য লক্ষ টাকা! টোগো মিনিট পাঁচেক ধরে কথা বলল মোড়লের সাথে। সে লোকটা কথা বলতে বলতে তুতসি কুলিদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে টোটোকে কি যেন বলল, তার নতুন জুতো পরা পাটাও তুলে টোটোকে একবার দেখালো।

টোটো তার সঙ্গে কথা শেষ করে সুদীপ্তদের কাছে এগিয়ে এসে হেরম্যানকে বলল, 'মোড়ল আমাদের আজ রাতে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে। তবে ওরা কুলিদের গ্রামে ঢুকতে দেবে না। ওদের বাইরে থাকতে হবে।'

সুদীপ্ত তার কথা শুনে প্রশ্ন করল, 'ওদের ঢুকতে দেবে না কেন?'

'ওরা তুতসি বলে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল টোটো।

উত্তরটা সুদীপ্তর কাছে পরিষ্কার না হওয়ায় সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকলো হেরম্যানের দিকে।

তিনি ব্যাপারটা ধরতে পেরে সুদীপ্তকে বুঝিয়ে বললেন, 'বুরুন্ডিতে হুটু-তুতসি, এ দুই উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ভয়ঙ্কর বিরোধ চলছে। বুরুন্ডির আদি অধিবাসীরা হল পিগ্‌মি। হুটু গোষ্ঠীরা বাইরে থেকে প্রথমে এখানে এসে চাষাবাদ-বসবাস শুরু করে। তাদেরও পরে উগান্ডা থেকে তুতসিরা এ ভুখন্ডে আসে। তারা আসার পরপরই বিরোধ শুরু হয় উভয়ের মধ্যে। বুরুন্ডি প্রথমে জার্মানীর, পরে বেলজিয়ামের দখলে ছিল। ১৯৬২ সালে মূলতঃ তুতসিরাই এ দেশের স্বাধীনতা আনে। কিন্তু তারপর থেকেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রবল লড়াই শুরু হয় দুই উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে। উভয়েরই বহু রক্ত ঝরে এতে। ১৯৮৮ সালে তুতসি সেনারা, তিন হাজার হুটু পরিবারকে হত্যা করে। হুটু উপজাতির ষাট হাজার মানুষকে সে সময় দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। ১৯৯২ সালে এ দেশে নতুন সংবিধান রচিত হয়। রাষ্ট্র সংঘ এ দেশে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু করে, কিন্তু তবুও আজও এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা বর্তমান। মাঝে মাঝেই চোরা-গোপ্তা খুনোখুনি হয় উভয় উপজাতির মধ্যে। এ জন্যই ওরা তুত্‌সিদের গাঁয়ে প্রবেশ করতে দেবে না।'

হেরম্যান আর টোগো এরপর কর্মপন্থা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিল। ঠিক হল, কুলিরা বাইরেই থাকবে তাঁবু ফেলে। তাদের আর মালপত্রের নিরাপত্তার জন্য দুজন আস্কারিও তাদের মধ্যে থাকবে। টোগো সঙ্গের লোকদের বিষয়টা বুঝিয়ে দিল। তারপর মোড়লের পিছন পিছন দুজন আস্কারিকে নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করল। তাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা গাছের নিচে শনের নিচু ছাদওলা কুটিরে। তার ঠিক সামনেই মাটিতে পোঁতা একটা লম্বা খুঁটিতে টাঙানো আছে বিরাট সিংহসহ একটা হরিণ জাতীয় প্রাণীর সাদা খুলি। আশেপাশের অন্য ঘরগুলোর সামনেও খুঁটির মাথায় এ জাতীয় নানা প্রাণীর খুলি টাঙানো আছে। সম্ভবত এটা এদের গ্রাম সাজানোর রীতি। সুদীপ্তদের তাদের থাকার আস্তানাটা দেখিয়ে দিয়ে, টোগোর উদ্দেশ্যে কি যেন বলে মোড়ল পা বাড়াল অন্যত্র। তাদের পিছনে আসা বয়স্ক লোকরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল নানা দিকে। শুধু বাচ্চারা সুদীপ্তদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে কৌতুহলি চোখে দেখতে লাগল। নানাবয়সী বাচ্চা, অপুষ্টিতে ভোগা দেহ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা উদর। যারা একটু বড় তাদের পরনে নাম মাত্র বস্ত্রখন্ড, আর ছোট শিশুরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'এ দেশটা খুব গরিব। পৃথিবীর সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর একটি। অল্প সংখ্যক শহরবাসী শুধু খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ পায়। যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। পুরুষদের গড় আয়ু মাত্র ৪৩ বছর। নারীদের সামান্য বেশী ৪৬।' হেরম্যান এরপর একটু আক্ষেপের সুরে বললেন, 'আগে এখানে আসব জানলে অন্তত সামান্য লজেন্স-টজেন্স, আনতাম এই বাচ্চাগুলোর জন্য। খুশি হত ওরা।'

হঠাৎ বাচ্চাদের দঙ্গলের ভিতর থেকে একটু বড় একটা ছেলে এসে দাঁড়াল সুদীপ্তদের সামনে। ছেলেটার কোলে অদ্ভুত দেখতে ছোট্ট একটা প্রাণী। প্রাণিটার মুখ ও লেজ বেজির মত, তবে শরীরের গঠনটা অন্য ধরনের। প্রানীটাকে দেখিয়ে ছেলেটা কি যেন বলল সুদীপ্ত হেরম্যানের উদ্দেশ্য।

টোগো সুদীপ্তদের বলল, 'ও বলছে এই প্রাণীটা ওর পোষা। আপনারা চাইলে ও প্রাণীটাকে আপনাদের কাছে বিক্রি করতে পারে।'

সুদীপ্ত প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'এটা কি প্রাণী?'

টোগো বলল, ''এরা একে 'মোয়া' বলে ডাকে। বন বিড়াল ও বেজির সংকর। এ রকম অনেক উদ্ভট প্রাণীর দেখা মেলে আফ্রিকার অরণ্যে।

সুদীপ্তদের ঐ প্রাণীর প্রয়োজন নেই শুনে একটু হতাশ হয়ে অন্যদিকে চলে গেল ছেলেটা। বাচ্চাদের দঙ্গলটাকে এরপর হটিয়ে দিল টোগো। ঘরের ভিতর ঢুকল সুদীপ্তরা। মেঝেতে খড়ের বিছানা পাতা। ভিতরে ঢুকেই সেখানে শুয়ে পড়ল সুদীপ্ত। টোগো বলল, 'আপনারা বিশ্রাম নিন। আমি মোড়লের কাছে গিয়ে দেখি, আমরা যে দিকে যাচ্ছি সে দিক সম্বন্ধে কোন খবর সংগ্রহ করা যায় কিনা? তাছাড়া রান্নার ব্যবস্থাও করতে হবে।' এই বলে টোগো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে সন্ধ্যা নামছে। সারা দিন অনেক পরিশ্রম গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খড়ের বিছানাতে ঘুমিয়ে পড়ল সুদীপ্ত।

হেরম্যানের ডাকে সুদীপ্ত যখন উঠে বসল, তখন রাত ন'টা বাজে। খাবার নিয়ে এসেছে টোগো। আর তার সঙ্গে বাইরের তাঁবু থেকে একটা ছোট পেট্রোম্যাক্স বাতি। তারই আলোতে তিনজন খাবার নিয়ে বসল। খাওয়া শুরু করার পর টোগো বলল, 'কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু করব আমরা। কুলিদের সেই মতো তাঁবু গোটাতে বলে এসেছি। ভোরে রওনা হলে আমরা ঘন্টা তিনেকের মধ্যে রুজিজি নদীর মোহনায় পৌঁছে যাব। তারপর ঠিক মত চলতে পারলে সন্ধ্যা নাগাদ 'গ্রেট রিফট্' উপত্যকার মুখে পৌঁছে যাব। অন্তত ঘন্টা দশ-বারো কাল হাঁটতে হবে। গ্রেট রিফটের কাছে জঙ্গলটা ভালো নয়। সিংহের উৎপাত

খুব! যতটা সম্ভব দিনের আলো থাকতে থাকতেই ওখানে পৌঁছতে হবে।'

হেরম্যান বললেন, 'পরিশ্রম করতে আমার আপত্তি নেই। যে ভাবেই হোক গন্তব্যে পৌঁছতে হবে আমাকে। তার জন্য জীবন বাজী রাখতেও রাজি।'

টোটো জানালো, রুজিজি নদীর মোহনা অতিক্রম করার পরই, কার্যত সভ্য পৃথিবীর সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তারপর শুধু আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল গহীন অরণ্য আর দুর্গম পাহাড়। সে সব অতিক্রম করে তবে পৌঁছন যাবে পিগমিদের সেই রহস্যময় উপত্যকাতে।

রুটি খেতে খেতে হেরম্যান এরপর তাকে বললেন, 'মোড়লের সাথে আর কোন কথা হল? কিছু জানতে পারলে ওদিককার খবর?'

টোগো বলল, 'হ্যাঁ হয়েছে। একটা আশ্চর্য্য খবর পেলাম। সেটাই আপনাকে দিতে যাচ্ছিলাম।'

খাওয়া থামিয়ে হেরম্যান বললেন, 'কি খবর?'

টোগো বলল, ''আমরা যে দিকে যাচ্ছি, গতকাল একটা বেশ বড় দল গেছে সে দিকে। জনা পঁচিশেকের দল। একজন খুব লম্বা আফ্রিকান্ডার ঐ দলের নেতা। পনেরো জন মাসাই আস্কারি আছে ঐ দলে। গতকাল দুপুরে গ্রামের ঠিক বাইরে বিশ্রামের জন্য থেমে ছিল দলটা। তখন মোড়লের সঙ্গে কিছু কথা-বার্তা হয় তাদের দলনেতার সঙ্গে। মোড়লের পায়ের নতুন জুতোটা ঐ আফ্রিকান্ডারই উপহার দিয়েছে। সে নাকি গ্রেট রিফট উপত্যকার জঙ্গলে সিংহ শিকারে যাচ্ছে। আফ্রিকান্ডার নাকি ঐ অঞ্চল সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করছিলেন মোড়লের কাছ থেকে। আশ্চর্য্যর বিস্ময় হল সে লোকটা নাকি সবুজ দানব বানরের সম্বন্ধেও বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে মোড়লকে! যদিও সে ব্যাপারে মোড়ল কোন জবাব দিতে পারেনি তাকে কারণ, মোড়ল বা এ গ্রামের কোন লোক ওদিকে কখনও যায়নি। লোকমুখে আমাদের মতই ঐ বানরের কথা শুনেছে মাত্র, তার বেশী মোড়লের কিছু জানা নেই।'' একটানা কথাগুলো বলে থামল টোগো।

''আফ্রিকান্ডার' কাদের বলে?' জানতে চাইল সুদীপ্ত। এ শব্দটা প্রথম শুনল সে।

হেরম্যান প্রথমে সুদীপ্তর কথার জবাবে বললেন, 'আফ্রিকাজাত শ্বেতকায় ব্যক্তিদের বলা হয়, 'আফ্রিকান্ডার'। এদের পূর্বপুরুষরা প্রায় সকলেই ভাগ্যান্বেষণে ইওরোপ থেকে এদেশে এসেছিলেন।' এরপর তিনি টোগোকে বললেন, 'ও লোকটা সবুজ বানরের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিল কেন? সিংহ শিকারের সাথে সবুজ বানরের সম্পর্ক কি?

টোগো জবাব দিল, 'জানি না। গল্পটা সে কোথাও শুনেছে। এমনও হতে পারে ও দিকে সে যাচ্ছে বলে নিছক কৌতূহলবশত বানরের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছে মোড়লের কাছে।'

সুদীপ্ত এরপর বলব না বলব না করেও বলেই ফেলল, 'ব্যাপারটা এমন নয়তো যে, ঐ লোকটাও আমাদের মতনই ঐ সবুজ বানরের খোঁজে যাচ্ছে? যদি সত্যিই ও প্রাণী ওখানে থেকে থাকে, আর ঐ আফ্রিকান্ডার আমাদের আগেই তার খোঁজ পেয়ে যায়, তাহলেতো আমাদের পরিশ্রমটাই মাটি হবে।'

সুদীপ্তর কথা শুনে হেরম্যান কয়েক মুহূর্ত্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মৃদু হেসে বললেন, 'আমার মতো পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশী নেই। মনে হয় সে সত্যিই সিংহ শিকার বা অন্য কোন কাজে ওদিকে যাচ্ছে। যদি আমাদের সাথে তার দেখা হয়, তাহলে পরস্পর পরস্পরের কাজে অসুবিধা সৃষ্টি না করলেই হল।' এরপর আর কোন কথা না বলে খেতে শুরু করলেন হেরম্যান। সুদীপ্তর কিন্তু হেরম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি মনে হল, মুখে যাই বলুন না কেন, সুদীপ্তর কথাটা পুরোপুরি তিনি উড়িয়ে দিতে পারছেন না!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তদের খাওয়া শেষ হল। হেরম্যান পরদিনের যাত্রা সম্পর্কিত কিছু টুকিটাকি কথা সেরে নিলেন। পরদিন খুব ভোরে উঠতে হবে। তাই এরপর রাত আর না বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল তারা।

সে দিন ভোরে সূর্য ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুরু হল। প্রথমে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল তাঙ্গানিকার পাড়ে, তারপর আগের দিনের মতই হ্রদের তীর ঘেঁসে এগোতে থাকল। এ পথে সকাল থেকেই নানা প্রাণী চোখে পড়তে লাগল সুদীপ্তদের। কখনও জেব্রার দল চরে বেড়াচ্ছে মাঠে, কখনও জিরাফ লম্বা গলা তুলে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে গাছের মাথা থেকে, আবার কখনও বা ইম্পালা নামের ছোট হরিণের ঝাঁক দৌড়ে পালাচ্ছে মানুষ দেখে। এছাড়া তাঙ্গানিকার জলে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে জলহস্তির দাপাদাপি। চলতে চলতে সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এখানে হাতি নেই?'

টোগো জানালো, 'না, এদিকে হাতি তেমন একটা দেখা যায় না। বুরুন্ডিতে হাতি খুব বেশী নেই। হাতির স্বর্গরাজ্য হল কিনিয়া আর তাঞ্জেনিয়া। সেখানে হাতি এত বেশী যে মাঝে মাঝে সরকার থেকে হাতি মারা হয়। শিকারীদের পারমিটও দেওয়া হয়।'

টোগোর কথা শোনার পর হেরম্যান হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ঐ আফ্রিকান্ডার তো শুনলাম গ্রেট রিফ্‌টে সিংহ শিকারে যাচ্ছে। ঐ অঞ্চলে সিংহদের কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে নাকি?'

টোগো বলল, 'না, তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই। লোকটা যে এত কষ্ট করে ওখানে সিংহ শিকারে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। উপত্যকায় সিংহ শিকার বেশ অসুবিধাজনক। সিংহ শিকারের আদর্শ জায়গা হল, উগান্ডা আর কিনিয়া। সরকারতো এ বছর সেখানে সিংহ শিকারের জন্য পাশও দিচ্ছে। বুরুন্ডিরও কিছু লোক সাফারিতে গেছে সে দু-দেশে। উনিতো ওসব জায়গাতেই যেতে পারতেন!'

টোগোর উত্তর শুনে, কি যেন ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগলেন হেরম্যান।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদও ক্রমশ চড়ছে আগের দিনের মতই। তবে এদিকে বড় গাছ কিছুটা আছে। যতদূর সম্ভব তার ছায়াতেই সকলেই চলতে লাগল।

বেলা এগারোটা নাগাদ দূর থেকে কিসের যেন গুরু গম্ভীর ধ্বনি শুনতে পেল তারা। টোগো জানালো, 'আমরা রুজিজি নদীর মোহনার কাছে পৌঁছে গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তরা পৌঁছে গেল সেই জায়গাটাতে। গ্রেট রিফট উপত্যকা থেকে নেমে এসে রুজিজি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঙ্গানিকার জলে। যেখানে রুজিজি এসে মিশেছে প্রচন্ড শব্দ সেখানে। ঐ শব্দই কানে আসছিল দূর থেকে। রুজিজির জল হ্রদে পড়ে প্রথমে রেণু রেণু হয়ে ছিটকে উঠছে আকাশের দিকে, তারপর আবার নিচে নেমে পাক খেতে খেতে মিশে যাচ্ছে তাঙ্গানিকার সাথে। অপূর্ব দৃশ্য! একটু দূরে দাঁড়িয়ে জায়গাটা দেখল সুদীপ্তরা। মোহনার কাছেই এক জায়গাতে বেশ বড় একটা জলহস্তির দল দেখা গেল। অন্তত জনপঞ্চাশেক প্রাণী হবে। তাদের মধ্যে শাবকটাবকও আছে! সুদীপ্তদের দেখে তারা কিন্তু মোটেও পাত্তা দিল না যেন এই দুপেয়ে জীবগুলো নেহাতই মশামাছি! টোগো বলল, 'জল হস্তির মাংস খেয়েছেন কোন দিন? আমি খেয়েছি। ভারী তৈলাক্ত!'

অন্য কেউ কথাটা বললে ব্যাপারটা হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিত সুদীপ্তরা। কিন্তু টোগো এখানকার মানুষ। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানই তার পেশা। তার পক্ষে ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়।' সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ও মাংস কোথায় খেয়েছ তুমি?'

সে জবাব দিল, 'এই তাঙ্গানিকার তীরেই, তবে বুরুন্ডিতে নয়, তাঞ্জানিয়াতে এক আদিবাসী গ্রামে। বছর পাঁচেক আগে একটা দলের সাথে সেখানে সাফারিতে গেছিলাম আমি। একটা জলহস্তি মেরে গ্রাম শুদ্ধ লোক ভোজ খেল।'

সুদীপ্ত এবার কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'তুমি সিংহর মাংস কোন দিন খেয়েছ?'

সে জবাব দিল, 'না, আমি খাইনি। তবে 'মাসাই ল্যান্ডে' কোন কোন আদিবাসী খায় বলে শুনেছি। সিংহর যকৃত, হৃৎপিন্ড দিয়ে অবশ্য ওঝারা ঔষুধ তৈরি করে। ও খেলে নাকি সিংহর মত শক্তি হয়!'

হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন এ মহাদেশে বহু জনগোষ্ঠীর বাস। প্রায় এক হাজার কথ্য ভাষায় কথা বলে তারা। তাদের আচার আচরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনও ভিন্ন ভিন্ন। পিগমি, বুশমেন, হটেনটট, এই তিন আদিবাসী সম্প্রদায় হল প্রস্তর যুগের মানুষ। এদেশের খাদ্যাভাস যে বিচিত্র হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! গভীর বনে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাসের কথা না হয় বাদই দাও। আমি একবার জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকার এক ঝাঁ-চকচকে ফাইভস্টার হোটেলে খেতে গেছি। সেখানে 'রয়াল স্যুপ' বলে আমার টেবিলে কি হাজির করা হল জানো? একটা স্যুপ, আর তার মধ্যে ভাসছে এক বিঘত লম্বা একটা সিদ্ধ গিরগিটি!!! আমার পাশের টেবিলের এক দম্পতিকে দেখি সে জিনিসই তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে!'

'আপনি সে জিনিস খেলেন নাকি?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল সুদীপ্ত।

হেরম্যান তার কথা শুনে চলতে চলতে মাটির ওপর বেশ কয়েকবার থুথু ফেলে তার অভিব্যক্তি বুঝিয়ে দিলেন।

রুজিজি নদীর মোহনা থেকে নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলল তারা। তাঙ্গানিকা পড়ে রইল পিছনে। এদিকে বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের সংখ্যাই বেশী। ঘাসে ছাওয়া প্রান্তর আর চোখে পড়ছে না। পথের নিচের মাটি বেশ শক্ত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। রুজিজি কোথাও প্রশস্ত, আবার কোথাও সংকীর্ণ। এঁকে বেঁকে সে চলেছে সুদীপ্তদের ফেলে আসা পথের দিকে। রুজিজির পাড় বরাবর বেশ কিছুটা পথ এগোবার পর হঠাৎ নদীখাতে দূর থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ দেখতে পেল তারা। টোগোই দেখতে পেল প্রথমে। হেরম্যানের কাছে একটা বাইনোকুলার ছিল, সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ তাদের পর্যবেক্ষণ করার পর টোগো এগোল তাদের দিকে। মূল জলস্রোতের পাশেই তিরতির করে বয়ে চলা একটা উপখাতে গোড়ালি সমান জলে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিল, জনাসাতেক অর্ধউলঙ্গ লোক। সুদীপ্তরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেই লোকগুলো জল ছেড়ে উঠে এল তাদের কাছে। লোকগুলোর উচ্চতা মাঝারি, প্রায় নেড়া মাথা, সামান্য বস্ত্রখণ্ড পরা আছে দেহের নিম্নাংশে। রোদের তাতে পুড়ে যাওয়া কালো মুখে একটা সরলতার ভাব আছে। তবে দেখেই মনে হচ্ছে বেশ পরিশ্রমী।

টোগোই প্রথম তাদের সাথে কথাবার্তা শুরু করল। তাদের পরিচয় জানার পর সে সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে বলল, 'ওরা নদীর ওপারের 'জাইরে'র অর্থাৎ 'গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর' বাসিন্দা। 'বান্টু' জনগোষ্ঠীর লোক। ওরা এদিকে

এসেছে নদীখাতে হীরে খুঁজতে। গ্রেটরিফট উপত্যকার কাছেও ছিল ক'দিন। তারপর সিংহর ভয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে। ও দিকে সিংহর নাকি খুব উৎপাত। এদের একজন সঙ্গীকে নাকি সিংহ টেনেও নিয়ে গেছে।'

হীরের কথা শুনে সুদীপ্ত অবাক হয়ে বলল, 'হীরে! হীরেও পাওয়া যায় নাকি এখানে?'

টোগো বলল, 'রুজিজির এই যে জলপ্রবাহ তার সাথে মিশেছে বহু ছোট ছোট নদীর জলধারা। গ্রেট রিফটের বহু ভূ-গর্ভস্থ গুহার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ঐ সব নাম না জানা নদী। তাদের জলধারা অনেক সময় সেই অজানা-গোপন পর্বতকন্দর থেকে বয়ে আনে হীরকখণ্ড। তবে খুব বড় হীরে অবশ্য পাওয়া যায় না। পর্বত কন্দরে লুকানো খনি থেকে এতটা পথ আসতে জল আর পাথরের ঘর্ষনে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। যা পাওয়া যায়, তা আসলে হল হিরের কুচি। আপনি দেখবেন? দাঁড়ান তাহলে বলি এদের! এই বলে সে সম্ভবত তাদের কথাটা বলতেই, তাদের একজন এগোল কিছুদূরে একটা গাছের দিকে। সেই গাছের আড়ালে লোকগুলোর বাসস্থান, কাপড়ের তৈরি একটা তাঁবু এবার চোখে পড়ল সুদীপ্তর।

লোকটার তাঁবুর দিকে এগোবার পর হেরম্যান টোগোকে বললেন, 'ওরা তো গ্রেট রিফটের ওদিকে গেছিল বলছে। দেখো ওদের কাছে ওদিকের অন্য কোন খবর আছে নাকি?'

টোগো আবার কথা বলতে শুরু করল তাদের সাথে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবুর দিক থেকে ফিরে এল সেই লোকটা। তারপর সুদীপ্তদের সামনে এসে একটা ছোট্ট চামড়ার থলি থেকে হাতের তেলোতে ঢালল এক মুঠো পাথর। কিন্তু সে পাথরে কোন দ্যুতি নেই, গোল মরিচের দানার চেয়ে একটু বড় কালচে বর্ণের পাথর। একটা পাথর নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল, হেরম্যান আর সুদীপ্ত। পাথরটা লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়ে হেরম্যান বললেন, 'এগুলো সব আনকাট ডায়মন্ড। পালিশ করলেই ঝলমল করে উঠবে। তারপর কেপটাউন হয়ে চলে যাবে আমস্টারডামের বাজারে। হাজার ডলারে বিকবে এক একটা।'

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'এ লোকগুলোর তো তাহলে ভালই পয়সাকড়ি আছে। কিন্তু দেখেতো মনে হয় না!'

টোগো লোকগুলোর সাথে কথা বলতে বলতে সুদীপ্তর কথা কানে যেতেই, তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক তার উল্টো। এরা সত্যিই খুব গরিব। কাগজ কলমে ক্রীতদাস প্রথা আফ্রিকা থেকে উচ্ছেদ হলেও আসলে এরা মালিকের ক্রীতদাস। সেই তাদের পাঠিয়েছে এখানে। ফিরে গিয়ে তার হাতে হীরেগুলো জমা দিয়ে তার বিনিময় এরা হয়তো পাবে, সামান্য কয়েকবস্তা খাদ্য-শস্য, কিছু পুরানো পোশাক, ঘর ছাওয়ার খড় এই সব। আর যাকে সিংহ নিল, তারতো সবই গেল। জঙ্গলে কাজ করতে এলে কিছু হলে ক্ষতিপূরণের ব্যাপার-ট্যাপার এখানে নেই।' টোগোর কথা শুনে আর লোকগুলোকে দেখে বেশ খারাপ লাগল সুদীপ্তর।

বান্টুদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর টোগো হেরম্যানকে জানাল, 'এরা গিয়েছিল গ্রেটরিফট উপত্যকার ঠিক মুখ পর্যন্ত যেখানে আমরা আজ তাঁবু ফেলব। এখান থেকে আনুমানিক জায়গাটা আট দশ মাইল উত্তরে হবে। বেশ ঘন জঙ্গল যেখানে। রাতে খুব ঠান্ডা, আর সিংহর উপদ্রব ছাড়া, সে জায়গা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারছে না এরা। পাহাড় টপকে ও-পাশের উপত্যকাতে তারা যায়নি। তবে অন্য একটা খবর এরা বলছে। সেই আফ্রিকান্ডারের নেতৃত্বে যাওয়া দলটার সাথে নাকি কাল বিকালে এদের এখানে দেখা হয়েছিল। তারাও এদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছিল ও অঞ্চলের। আর সেই আফ্রিকান্ডার নাকি হুটুদের মতো, এদের কাছেও জিজ্ঞেস করেছে সবুজ বানরের কথা!' হেরম্যান শুনে শুধু মন্তব্য করলেন, 'আশ্চর্য্য!'

লোকগুলোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার চলতে শুরু করল সকলে। টোগো বলল, বিশ্রামের জন্য, আজ আর থামা যাবে না, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে হবে। সন্ধ্যা নামার আগেই নির্দিষ্ট স্থানে তাঁবু ফেলতে হবে। নইলে বিপদ আছে!' তার কথা শোনার পর সকলে দ্রুত পা চালাতে শুরু করল। মাইল দেড়েক চলার পর নীল দিগন্তে একটা অস্পষ্ট কালো রেখা চোখে পড়ল সুদীপ্তদের। মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে টোগো বলল, 'ঐ হল, 'গ্রেট রিফ্‌ট।' ওখানেই আমরা যাব।'

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'ও দিকে এর আগে কোন পর্যন্ত তুমি গেছ?'

টোগো জবাব দিল, 'গ্রেট ৱিফটে, আমি আগে দু-বার গেছি। কিন্তু আপনি যেখানে যেতে চাইছেন সেই ওপাশের উপত্যকাতে যাইনি কোন দিন। পাহাড়ের মাথা থেকে গভীর বনে ঘেরা জায়গাটা দেখেছি শুধু।'

সুদীপ্তদের যাত্রা পথে পায়ের নিচের মাটি ক্রমশ রুক্ষ হতে শুরু করল। আবার কমে আসতে লাগল বড় বড় গাছের সংখ্যা, তার পরিবর্তে তাদের বেষ্টন করতে লাগল বিরাট বিরাট কাঁটা ঝোপের বন। তাদের ভিতর বিরাজ করছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দিগন্তের কালো রেখাটা ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। সুদীপ্তদের চলার সাথে তাল মিলিয়ে সূর্য্যও ক্রমশ ধীরে ধীরে পশ্চিমে এগোতে লাগল। জঙ্গলের ভিতর থেকে আসা পাখির ডাকগুলোও মিলিয়ে গেল এক সময়। শুধু জেগে রইল রুজিজির গম্ভীর নিনাদ। শুধু চলা আর চলা। সে চলার যেন আর বিরাম নেই।

চলতে চলতে সুদীপ্তরা তখন গ্রেট রিফটের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পাহাড়ী উপত্যকার গিরিশিরাগুলো তখন নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট দৃশ্যমান। সূর্য্যের আলো নরম কিন্তু সন্ধ্যা নামতে প্রায় ঘন্টা দুই দেরি। নির্ধারিত সময় অনুপাতে বেশ একটু দ্রুতই পথ অতিক্রম করেছে তারা। ঠিক এই সময় চলতে চলতে টোগো পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আঙুল তুলে ইশারায় কাছে একটা ঝোপের দিকে দেখাল। আস্কারিয়া সঙ্গে সঙ্গে কোন অজানা বিপদের আশঙ্কাতে সুদীপ্তদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাগ করল সেই ঝোপের দিকে। কয়েক মুহূর্ত যেদিকে তাকিয়ে থাকার পর একজন কুলি সেই ঝোপটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতের বর্শাটা দিয়ে ঝোপটা একটু ফাঁক করতেই তার আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল বিরাট হরিণ জাতীয় একটা প্রাণীর দেহ। তার কালো অঙ্গ লাল হয়ে গেছে রক্তে। চারপাশেও ছড়িয়ে আছে চাপচাপ রক্ত। প্রাণীটার দেহের পিছনের অংশ থেকে বেশ কয়েক পাউন্ড মাংস কে যেন খুবলে নিয়েছে। টোগো প্রাণীটাকে দেখে সুদীপ্তদের উদ্দেশ্যে প্রথমে বলল, 'এটা হল কুডু জাতীয় হরিণ। এ দেশে এই হরিণ খুব সামান্যই পাওয়া যায়। এদের আসল দেশ হল অ্যাঙ্গোলা। সেখানকার 'গ্রেট কুডু' বিখ্যাত প্রাণী!'

এরপর একটু নিচু হয়ে মৃত প্রাণীটার ক্ষত স্থানটা ভালো করে দেখে টোগো বলল, 'সিংহর কাজ! বান্টু উপজাতীয় লোকগুলো মিথ্যা বলেনি। এ তল্লাটে সিংহ আছে। খুব সাবধানে পথ চলতে হবে আমাদের।'

প্রাণীটাকে দেখে আর টোগোর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল আস্কারি আর কুলির দল। সুদীপ্ত আর হেরম্যানকে ঘিরে একটা বৃত্ত রচনা করল তারা। তুতসি কুলিরা তাদের বর্শার ফলাগুলোকে বাগিয়ে ধরল ঝোপের দিকে। আফ্রিকানদের বর্শার ফলাগুলো বেশ অদ্ভুত ধরমের হয়। লাঠির মাথায় অনেকটা বেয়নেটের মতো দেখতে ফুট তিনেক লম্বা ইস্পাতের ফলা। তার দু-পাশে ধার। অনায়াসে তাদের তরোয়ালের ফলার মতো ব্যবহার করা যায়, রাইফেল আর বর্শা ফলকের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আবৃত হয়ে তারা এগিয়ে চলল সামনের দিকে। ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল গ্রেট রিফ্‌ট।

সারা দিনের পথশ্রমের পর অবশেষে তারা সন্ধ্যা নামার কিছু আগে এসে উপস্থিত হল গ্রেট রিফটের পাদদেশে। ছোট বড় পর্বত শ্রেণী সেখানে ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে হারিয়ে গেছে উত্তর দিগন্তে। হেরম্যান বললেন, 'এই পর্বতশ্রেণী উত্তরে রোয়ান্ডা সীমান্ত অতিক্রম করে উগান্ডার ওপাশে এগিয়েছে। রুজিজি আর এই পর্বত মালার ওপাশটা হল জাইরে বা গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। জাইরের অন্তর্গত, আফ্রিকা মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গ 'মাউন্ট স্টানলি'র উচ্চতা ৫১১০ মিটার। মাউন্ট স্ট্যানলি কিন্তু এই গ্রেট রিফটেরই অন্তর্গত।'

দিনান্তের সূর্যরশ্মির লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতশৃঙ্গের মাথায়। তার পাদদেশে বয়ে চলা রুজিজি নদী, আফ্রিকার অরণ্য প্রদেশের গহীন জঙ্গল, সভ্য পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন এ এক অচেনা পৃথিবী! সুদীপ্ত আর হেরম্যান বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখতে লাগল অস্তাচলগামী সূর্য্যালোকে রাঙানো প্রকৃতিকে। টোগো তাড়া লাগল, 'আমাদের কিন্তু এখন দাঁড়ালে হবে না। চটপট জায়গা বেছে তাঁবু ফেলতে হবে। অগ্নিকুণ্ডও জ্বালাতে হবে। এ জায়গা কিন্তু ভালো নয়।'

অতঃপর আর দাঁড়িয়ে না থেকে তাঁবু ফেলার জন্য স্থান নির্বাচন করা হল। জায়গাটা পাথুরে দেওয়াল আর জঙ্গলের মাঝে এক চিলতে ফাঁকা জমি। দুজন কুলি লেগে গেল তাঁবু খাটানোর কাজে। হেরম্যান, সুদীপ্ত আর টোগোও হাত লাগাল তাতে। আর অন্য দু-জন কুলি আস্কারিদের প্রহরাতে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে এক জায়গাতে জমা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো তাঁবু খাটিয়ে ফেলল তারা। ছোট তাঁবুতে থাকবে হেরম্যান, সুদীপ্ত আর টোগো। বড়টাতে থাকবে কুলিরা, আর দুজন আস্কারি। আস্কারিরা নিজেদের মধ্যে সময় ভাগ করে নিয়ে দুজন করে একসাথে তাঁবু পাহারা দেবে। তাঁবু দুটোর গা ঘেঁষে থাকবে দুটো ছোট আর একটা বড় অগ্নিকুন্ড, তাঁবু খাটানো আর কাঠ সংগ্রহর পর কুলির দল রান্নার প্রস্তুতি শুরু করল। হেরম্যান, সুদীপ্তকে নিয়ে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে অন্ধকার নেমে এল। আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে আসতে লাগল ঝিঁঝিঁ পোকার নিরবচ্ছিন্ন ঐকতান। তাঁবুর ভিতর হাত পা ছড়িয়ে বসে সেই কলতান শুনতে লাগল সুদীপ্তরা। অন্ধকার গাঢ় হতেই ধীরে ধীরে ঠান্ডা নামতে শুরু করল উপত্যকার বুকে।

(ক্রমশ)

*ছবি ঃ সুদীপ্ত দত্ত*

# আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সরণি

## আশীষ লাহিড়ী

১৮৬১ সালটি বাঙালিদের কাছে পুণ্য বছর। ঐ সালেই জন্মেছিলেন তিন বাঙালি দিক্‌পাল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) আর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। এঁরা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। এ নিয়ে বেশ একটা মজার—একই সঙ্গে দুঃখের—গল্প আছে। ১৯৪১ সাল। তিনজনেরই আশি বছর বয়স। রবীন্দ্রনাথের শরীর তখন ভেঙে পড়েছে, কিন্তু মস্তিষ্ক রয়েছে সজাগ। এদিকে তাঁর চিকিৎসক নীলরতন সরকারের হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হল। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। এমনি সময় চিররুগ্ন প্রফুল্লচন্দ্রও একদিন হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর বললেন, 'আমি, রবি আর নীলরতন একই সঙ্গে পৃথিবীতে এসেছিলাম। রবির শরীরটা গেলেও মাথা আছে। নীলরতনের শরীরটা থাকলেও মাথাটা গেছে। আর আমার শরীর বলতে তো কোনোদিনই কিছু ছিল না, এবার মাথাটাও বুঝি গেল!'

এরকমই ছিলেন এই মনীষীরা। জীবনের দুঃখযন্ত্রণাকে কী করে রসিকতা দিয়ে সইয়ে নিতে হয়, তা জানতেন। ১৮৬১ সালের এই তিন মহাজাতকের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে নিয়ে আজ একটু আলোচনা করব।

যশোর-খুলনার এই মানুষটি যখন এডিন্‌বরায় বা লন্ডনে পড়তে বা ডক্টরেট করতে গেছেন, কিংবা বিশ্বসভায় সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছেন, তখন বাধ্য হয়েই তাঁকে ধড়াচূড়া পরতে হত। কিন্তু বাকি সময় তিনি যেভাবে জীবন কাটাতেন, যেভাবে কথা বলতেন, যে পোশাক পরতেন, তার থেকে সরল সাদাসিধে আর কিছু হতে পারে না। প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিং বলে যেকথাটা ইংরেজিতে চালু আছে, তার একেবারে নিখাদ প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। সাদাসিধে পোশাক ও জীবনযাত্রার জন্য গান্ধিজি খুবই প্রসিদ্ধ; সেই গান্ধিজী স্বয়ং তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখে। এত বড়ো একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, অথচ থাকেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের ওপরে একলা একটা ঘরে, সেটাই তাঁর বেডরুম-কাম-ডাইনিং-কাম-লিভিং রুম, পরেন ইস্তিরিবিহীন শার্ট কিংবা ফতুয়া আর খাটো ধুতি, নিজের জামাকাপড় নিজে কাচেন, নিজের জুতো নিজে পালিশ করেন, পড়াশোনা করেন অতি সাধারণ একটা কাঠের টেবিলচেয়ারে, জলখাবার খান নিজের তৈরি চিনির সিরাপ দিয়ে মাখা মুড়ি, একটাই কাপড়ের থান কিনে তা থেকে নিজের জন্য আর কলেজের বেয়ারার জন্য সারা বছরের পোশাক বানান, অধিকাংশ সময়েই চুলটুল আঁচড়ানো থাকে না। কে যে বেয়ারা, আর কে যে 'সার' প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ত।

এ নিয়ে কত যে গল্প আছে। একবার একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক 'স্যার পি সি রায়ের' সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। গিয়ে দেখেন ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো করে পরে দাড়িওয়ালা এক দপ্তরি উবু হয়ে বসে বই বাঁধাচ্ছে। তিনি বললেন, 'ওহে, স্যার পি.সি. রায়কে একটু খবর দাও তো! মিস্টার অমুক দেখা করতে এসেছেন।' দপ্তরিটি বলল, 'আজ্ঞে আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।' বলে সে ভেতরে চলে গেল। এক মিনিট পরে আঠা-মাখা হাতটাত ধুয়ে এসে বলল, 'বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি।' ভদ্রলোকের কীরকম একটা সন্দেহ হল। 'সে কী, তুমি, মানে আপনি...?' 'হ্যাঁ, আমারই নাম প্রফুল্লচন্দ্র রায়।' ভদ্রলোকটির তখন ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি অবস্থা!

অথচ এই ফতুয়া আর খাটো ধুতি-পরা মানুষটি শুধু যে রসায়নেরই দিক্‌পাল ছিলেন তা নয়। বাংলা, ইংরেজি,

ফরাসি, জার্মান, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা বেশ ভালোরকম জানতেন। ইতিহাস জানতেন খুব ভালো। শেক্সপিয়ারের অনেক নাটক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। শেক্সপিয়ারের ওপর ইংরাজিতে বেশ কয়েকখানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রসায়নের ক্লাসে মধুসূদন দত্তের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। উদ্ধৃতিটা কার, বলতে না পারলে ছাত্রদের বকাঝকা করতেন। বলতেন, আসলে আমার তো সাহিত্যজগতের লোক হবারই কথা, নেহাৎ ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি রসায়নের দুনিয়ায়। এ নিয়ে বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কপট রাগারাগিও চলত। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলতেন, আপনার পাল্লায় পড়ে আমার কত ভালো ভালো ছাত্র বিজ্ঞান ছেড়ে সাহিত্যের পথে চলে গেল। কেন আপনি এভাবে লোক ভাঙাচ্ছেন? উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আর আপনার পাল্লায় পড়ে কত ওস্তাদ লেখক যে সাহিত্য ছেড়ে বিজ্ঞানের পথে চলে গেল, তার বেলা? আপনি নিজেও তো তাদেরই দলে। নেহাৎ আপনার বয়স হয়ে গেছে তাই, নইলে আপনার হাতেও টেস্ট টিউবের বদলে কলম ধরিয়ে দিতাম!

টাকা যা রোজগার করতেন তার প্রায় সবটাই দান করে দিতেন। দানের বহর দেখে খোদ গান্ধিজি থ হয়ে গিয়েছিলেন। কোথায় কোন ছাত্রের মাইনে বাকি পড়ছে, কে বই কিনতে পারছে না, কার সংসারের অবস্থা ভালো না, কার ঠিকমতো খাওয়া জুটছে না, কার অসুখ করেছে, ওষুধপথ্য দরকার, কে ব্যবসা করতে চায় কিন্তু মূলধন নেই, কোথায় বন্যা হয়েছে, এখন ত্রাণ পাঠাতে হবে—সব খবর রাখতেন এই বিজ্ঞানী।

কেউ হয়তো তাঁকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। চিরকালের পেটরোগা মানুষটি কিছুই প্রায় খেতে পারতেন না। তা বলে অতগুলো ভালো ভালো খাবার নষ্ট হবে? নিমন্ত্রণকর্তা বা কর্ত্রীকে বলে দিলেন, খাবারগুলো যেন পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়। কাল সকালে ছাত্ররা আসবে, ওরা অনেকদিন ভালোমন্দ খায়নি! এই ছাত্র-অন্ত প্রাণ বিজ্ঞানীর ভালোবাসা প্রকাশের ঢঙটাও ছিল বিচিত্র। কেউ হয়তো এসে জানাল, স্যার, ইংল্যান্ডের অমুক জার্নালে আমার পেপারটা নিয়ে খুব প্রশংসা বেরিয়েছে। অমনি পিঠে পড়ল গুম করে কিল। কী কী প্রশংসা বেরিয়েছে, ভালো করে পড়ে ছাত্রকে বললেন, এদিকে আয়। সে বেচারি ভয়ে ভয়ে কাছে এল। এবার একটা নয়, আনন্দের চোটে স্রোতের মতো গুমগুম করে কিল বর্ষণ হতে লাগল পিঠে। তারপরই পুঁটলি থেকে খাবার বের করে আনন্দভোজন! ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে কার সঙ্গে না ঝগড়া করেছেন তিনি—এমনকি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও।

১৮৮৮ সালে এডিন্‌বরা থেকে ডি এস্‌-সি করে কলকাতায় ফিরে সাহেব-প্রভুদের কাছে অনেক লাঞ্ছনা সয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নের সহকারী লেকচারার পদে যোগ দেন তিনি। 'মজার' ব্যাপার এই যে, জ্ঞানে ও যোগ্যতায় খাটো হলেও নিছক গায়ের চামড়াটা সাদা বলে অনেক সাহেব তাঁর ওপরওলা হয়েছিলেন! পরাধীনতার জ্বালা কাকে বলে, হাড়ে হাড়ে টের পেতেন প্রফুল্লচন্দ্র। তারই মধ্যে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে ছাত্রদের বিজ্ঞান শেখাতে লাগলেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির অতি করুণ দশা। গবেষণা দূরের কথা, দৈনন্দিন পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর পক্ষেও তা অনুপযুক্ত। এ নিয়েও 'মজার' গল্প আছে। কলেজের অধ্যক্ষ টনি (Tawney) সাহেবকে একদিন ল্যাবরেটরিতে ডেকে নিয়ে আসা হল। ল্যাবরেটরি ঘরটা তখন ঘন, ঝাঁঝালো, দুর্গন্ধময় ধোঁয়ায় ভর্তি, কেন না নল দিয়ে ঘর থেকে গ্যাস বের করে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। টনি সাহেবের আবার হাঁপানি ছিল। ফলে যা হবার, তাই হল। দু-মিনিটের মধ্যে সাহেব পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। শিক্ষা-দপ্তরে চিঠি লিখলেন, এতগুলো ছাত্রের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজানোর অধিকার কারো নেই। তখন ঠিক হল, নতুন ল্যাবরেটরি বানানো হবে।

কিন্তু বানাব বললেই তো আর বানানো যায় না। ল্যাবরেটরি ভবনের পরিকল্পনা করবে কে? ছক কই? এ কাজের কোনো অভিজ্ঞতাই তো এদেশে কারো নেই। তখন এগিয়ে এলেন প্রফুল্লচন্দ্র। বললেন, এই দ্যাখো, পরে দরকার হতে পারে ভেবে এডিন্‌বরায় পড়বার সময় আমি সেখানকার রসায়ন ল্যাবরেটরি ভবনের একখানা ছক সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। সেই নির্মাণছক এবার কাজে লেগে গেল। তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠল ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক রসায়ন ল্যাবরেটরি। একেবারে আক্ষরিক অর্থে ভারতে আধুনিক রসায়নচর্চার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

১৯০৯ সালের অবিভক্ত বাংলায় ম্যাট্রিক পাশ করেছিল একঝাঁক কিশোর যারা পরে বিজ্ঞানের দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, মানিকলাল দে, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সরকার। এঁরা প্রত্যেকেই বি এস্‌সি পড়তে আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। নীলরতন ধর আর রসিকলাল দত্ত এঁদের চেয়ে দু-তিন বছরের সিনিয়র। এঁরা সকলেই

ছিলেন আচার্য রায়ের ছাত্র। ছাত্র মানে শুধু ক্লাসের ছাত্র নয়, ক্লাসের বাইরেরও ছাত্র। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা ময়দানে বসত তাঁর 'ময়দান ক্লাব'। সেখানে বয়েসের কোনো বাছবিচার ছিল না। দেশেবিদেশের রাজনীতি, যুদ্ধ ও শান্তি, ব্যবসা, বাণিজ্য, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি দুনিয়ার যত বিষয় নিয়ে খোলা মনে আলোচনা হত। আড্ডায় সবাই মাটিতে বসতেন, কেবল সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নাম দিয়েছিলেন স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল (Standing Counsel)!

রাজাবাজারে সায়েন্স কলেজ তৈরি হল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে ১৯১৬ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে রসায়নের অধ্যাপক হয়ে এলেন। কলেজের টাকাপয়সার তখন খুব টানাটানি। নিজে সামান্য টাকা রেখে মাইনের সব টাকাই দিয়ে দিতেন তিনি। প্রতিষ্ঠানের একটা পয়সাও যদি বাঁচানো যায় তার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। কে কোথায় বার্নার বন্ধ করতে ভুলে গেছে, কোথায় জলের কল অকারণে খোলা রয়েছে, কোথায় শুধু শুধু পাখা ঘুরছে, কে কোথায় একটা ফিল্টার পেপার নষ্ট করেছে—সব কিছু খেয়াল থাকত তাঁর। এর জন্য দোষীদের সাজাও পেতে হত। এই অক্লান্ত পরিশ্রম—সাধনাই বলব—বিফলে যায়নি। অল্প দিনের মধ্যেই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের রসায়ন বিভাগ হয়ে ওঠে জগৎপ্রসিদ্ধ। প্রিয়দারঞ্জন রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞান রায় (এই তিন জ্ঞানকে তিনি সস্নেহে একসঙ্গে 'জ্ঞানত্রয়' বলে ডাকতেন!), পুলিনবিহারী সরকার, গোপাল চক্রবর্তী এবং আরো অনেককে ঘিরে গড়ে ওঠে বিশ্ববিখ্যাত 'ক্যালকাটা স্কুল অব কেমিস্ট্রি'।

এই এতরকম কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে ছিল একটাই ভাবনা—দেশ। সাহেবরা দুষ্টু, তারা আমাদের ধরে ঠ্যাঙায়, তারা আমাদের দেশ কেড়ে নিয়েছে, এইসব কান্নাকাটি পছন্দ করতেন না তিনি। তার বদলে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে, শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য আর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠে, গ্রামগুলোর চেহারা বদলে দিয়ে, মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে এসে, দেশের মানুষের মনকে সামাজিক আর ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে তুলে কি করে দেশ গড়া যায়, সেই আসল লড়াইটা তিনি লড়তে চেয়েছিলেন। তারই জন্য তৈরি করেছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো স্বদেশি প্রতিষ্ঠান, তারই জন্য সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদপ্রথা আর বিজ্ঞান-বিরোধী ভাবনাচিন্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, তারই জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখে প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতবর্ষ মানেই শুধু ধর্মের দেশ নয়, ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেরও দেশ বটে। ভারত কেবল শঙ্করাচার্যের দেশই নয়, ভাস্করাচার্যের দেশও বটে। কিন্তু দুঃখের কথা, কেবলই ধর্ম-ধর্ম করে মেতে থেকে নিজেদের সেই পরিচয় আমরা নিজেরাই ভুলে গেছি। ১৯২৪ সালে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হওয়ায় লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি এক অভিনন্দনবার্তা পাঠায়। তার উত্তরে আচার্য রায় যেকথা বলেন, তাঁর অন্তরের কামনাটি তার মধ্যে দিয়ে অবিকল প্রকাশিত হয়েছিল—

চল্লিশ বছরেরও আগে যখন আমি এডিন্‌বরার ছাত্র, তখন যেন স্বপ্ন দেখেছিলাম যে ঈশ্বরের কৃপায় এমন একদিন আসবে যখন আধুনিক ভারত এই বিশ্বের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারে তার নিজস্ব অবদান রাখতে পারবে; আমি সৌভাগ্যবান, সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

জীবনের শেষদিকে আর পড়ানো কিংবা গবেষণার পথ দেখানোর কাজ বড়ো একটা করতে পারতেন না। ততদিনে তাঁর ছাত্ররাই, এমনকি ছাত্রের ছাত্ররাও, সারা ভারত জুড়ে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী শান্তিস্বরূপ ভাটনগর সরাসরি আচার্য রায়ের ছাত্র ছিলেন না, ছিলেন তাঁর ছাত্রের ছাত্র। রসিকতা করে, সগর্বে তিনি বলতেন, আমি হলাম আচার্যের grandpupil!

অজৈব রসায়নের নানা ক্ষেত্রে আচার্য রায়ের কাজ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু শুধু একজন রসায়নবিদ বলে নয়, তিনি আমাদের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন একজন কাছের মানুষ হিসেবে। বিজ্ঞানকে দেশের সাধারণ মানুষের সরণিতে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সরণিতে পা ফেলার সময় প্রতিদিন যেন সে কথাটা আমরা স্মরণ করি।

---

তথ্যসূত্র : অন্বেষা পত্রিকা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৫

# লজ্জা

রজতশুভ্র মজুমদার

বেড়াল নয়তো, ওরই বোনপো
জ্বলছে দুটো চোখ
সুপুরিবন ঘিরে তখন
হাজার খানেক লোক
ছুঁড়ছে পাথর, দেশ কোথা তোর
কে তোর মাতা পিতা?
অত্যাচারে গাছের আড়ে
পথ ভোলা ঐ চিতা
সেঁধিয়ে আছে, পিঠের কাছে
লক্ষ্যভেদের আগে
ঘুমপাড়ানি অস্ত্রখানি
বিচিত্র তাকবাগে
উঁচিয়ে তুলে ঈষৎ দুলে
যেই না বনের লোক
ট্রিগার টেপে, অমনি ক্ষেপে
বাঘবাবাজি চোখ
পাকিয়ে শেষে বাইরে এসে
হালুম বলে ডাকে
পুলিশ তখন চোরের মতন
পেছন থেকে তাকে...

তারপরে আর কী বা বলার
রইল বলো বাকি
এমন পাপী খুন খারাপির
লজ্জাতে মুখ ঢাকি।

(নেপথ্যে : বীরভূম অরণ্যের এক চিতা জনপদে হাজির হয়েছিল। বনবিভাগের লোকেরা তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেবার জন্য ঘুমপাড়ানি ওষুধ গুলি করেছিল। কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত গুলি করে মারে পুলিশ।)

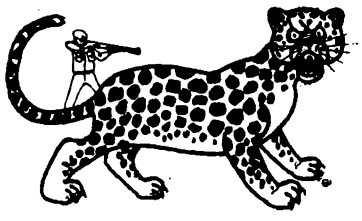

# রাত দুপুরে

দেবাশিস্ বসু

রাত দুপুরে হাত-পা ছুঁড়ে
কে কাঁদে রোজ নাকি সুরে
ধরতে যদি পারি তাকে
রাখবো লোহার খাঁচায় পুরে!

কে কাঁদে রোজ চাঁদের বুড়ি
বয়স খুবই কি থুত্থুড়ি?
কাঁদছে কেন, চুরি গেছে
গন্ডা কয়েক পাথর-নুড়ি?

# এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

শৈলশেখর মিত্র

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর—
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির
সেইখানেতে ঘর।
আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল
সবাই নিশাচর—
তাই কি সেথায় হুতুম চেঁচায়
বিকট গলার স্বর।

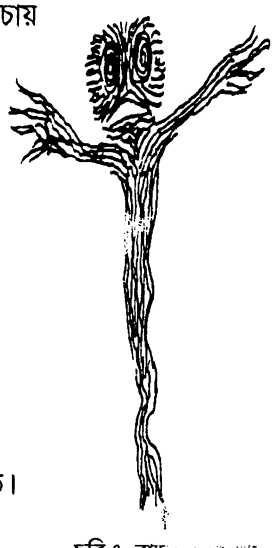

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর—
পেত্নিরাতে করবে বিয়ে
মামদো হবে বর।
শুকশারিরা দেখতে যাবে
পেরিয়ে তেপান্তর
আমার ছড়া মুড়িয়ে দিল
কালবোশেখীর ঝড়।

ছবি : রাজা মজুমদার

# টেররিস্টের ডায়রি

## দীপঙ্কর বিশ্বাস

জন্মাষ্টমীর দিন, রবিবার সকাল সাতটার সময় ধড়মড়িয়ে আমার আর সেজদার ঘরে ঢুকলো লোকাল থানার ও.সি. জগন্নাথ সুর। লোকে যাকে আড়ালে জগাসুর বলে ডাকে। আমি সবে উঠেছি, সেজদা সজোরে নাক ডাকিয়েই চলেছে, ছুটির দিনে এমন সময়ে উটকো ঝামেলা কার ভালো লাগে? আমার মেজাজটা একটু খিঁচড়েই গেল। আমি বললাম—"জগাদা—আপনি কি আমাদের অ্যারেস্ট করতে এসেছেন? সেজদা ওঠো—জগাদা তোমায় অ্যারেস্ট করতে এসেছেন।"

সেজদা আচমকা ঘুম ভেঙ্গে উঠেই পেল্লায় এক বিষম খেল, খালিপেটে। "কে কে কে কো কো কো কি কি কি।" তারপর জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে হাঁফাতে লাগল।

জগাসুর এক সারি হারমোনিয়ামের রিডের মতন সাদা কালো দাঁত বার করে হাসিতে ফেটে পড়ল। "বেশ রসিক হয়েছ তো তুমি, তা—অজয় কোথায়?"

প্রশ্নটা শুনে আমার মেজাজটা আরো বেশী বিগড়ে গেল। মেজদা না হয় পড়াশোনায় ভালো, স্কলারশিপ পায়, বুদ্ধিও হয়তো আমাদের চেয়ে বেশী, কিন্তু আমরা কি কেউই নই? রহস্যোদ্‌ঘাটনে আমরা কি কম সাহায্য করি? আমি বললাম "মেজদা যেখানে থাকার সেখানেই আছে। মেজদা কি এই ভোরে রাঁচী ছুটবে?"

আমার কথায় জগাসুর আবার একটু হেসে মশারি সরিয়ে আমাদের তক্তাপোষে বসে পড়ল। "আরে সাংঘাতিক কান্ড ঘটে গেছে গতকাল।"

"কী কান্ড ঘটে গেছে জগাদা?" জগাসুরের বিকট গলা শুনে মেজদা নেমে এসেছে আমাদের ঘরে।

"আরে আমাদের এই এলাকায় কাল এক টেররিস্ট ধরা পড়েছে।"

"সেকি জগাদা—আমাদের এই গুদোমপাড়ার মফস্বলে টেররিস্ট? হয় সে বেটা পাগল নয়তো আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে।"

"আরে বাবা না। আমরা একেবারে সুনিশ্চিত। লোকটা টেররিস্ট না হয়ে যায় না।"

"কি করে এত সুনিশ্চিত হলেন? লোকটা কি আমি টেররিস্ট, আমি টেররিস্ট বলে গান ধরেছিল?"

"আরে এ কোনও কথাই মানতে চায় না। তবে শোন। ওর কাছে ছিল দুটো অটোমেটিক রিভলভার, আর ডি এক্স, জিলেটিন স্টিক, ডেটনেটর আর তিন তিনটে মোবাইল ফোন ছিল।

আমি না বলে পারলাম না।—"জগাদা তাহলে তো আপনার খাওয়ানো উচিত। কাগজে নাম বেরোবে, টি.ভি. ইন্টারভিউ নেবে, ক'দিন পরে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে প্রাইজ নেবেন, আর কপাল ভালো থাকলে টেররিস্টের হাতে শহীদও হতে পারেন। এ পাড়ায় আপনার মর্মর মূর্তি বসবে।"

শ্লেষটা জগাসুরের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। "তা মন্দ বলনি—খাইয়ে দেবখন।"

"আচ্ছা আপনি টেররিস্ট ধরেছেন, আপনি মেডেল পাবেন, আপনি শহীদ হবেন, তা আমাদের ভূমিকাটা তো আমি বুঝতে পারছি না। আজকাল তো আপনি খুব ব্যস্ত। প্রয়োজন ছাড়া আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন না। তা অসুবিধেটা কোথায়?"

"তুমি রাগ করছ অজয় কিন্তু সত্যিই বড় ব্যস্ত আছি। পাড়ায় চোর ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব বড্ড বেড়েছে। তা চা খাওয়া হবে না? তুমি ধরেছ ঠিক। এই টেররিস্ট নিয়ে অসুবিধে কিছু আছে, যেখানে তোমাকে দরকার।"

জগাসুর টাকা বার করে দিল। আমি ছুট্টে গিয়ে সিঙাড়া আর চা নিয়ে এলাম।

জগাসুর বলে চলল—"আমার কনস্টেবল বকুরামটা ফচ্‌কে হলে কি হয় ওর বুদ্ধি খুব। দু'দিন আগে আমাকে এসে বলল, 'স্যার, আমি সেই wanted টেররিস্ট বদ্রীদাস ওরফে ফজল আলিকে আমাদের বাজারে দেখেছি। ওর মাথায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার আছে।' আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু বকুরাম মোবাইল ক্যামেরায় ফজল আলি বা বদ্রীদাসের নিখুঁত ছবি তুলে আনল। ফজল আলির চেহারা পেশীবহুল। চুল, দাড়ি, গোঁফ সব কামানো।

আমরা wanted টেররিস্টের ছবি, সঙ্গে বদ্রীদাসের Scull বা করোটির মাপ মেলালাম। মিলে গেল। বদ্রীদাস চুল দাড়ি কামিয়েছে হুলিয়া পরিবর্তনের জন্য, কিন্তু ওর চ্যাপ্টা নাক, মোটা ঠোঁট আর চওড়া কপাল ওকে পরিস্কার চিনিয়ে দিচ্ছে। আমি আমার দু'তিন জন ইনফরমার লাগিয়ে দিলাম বদ্রীদাস সম্বন্ধে আরো খবর সংগ্রহ করতে। তারা কেউ পার্টটাইম পকেটমার কেউ ফুলটাইম ইনফরমার। খবর যা পেলাম, তা হল, বদ্রীদাস সাদা পাজামা আর লম্বা পাঞ্জাবী পরে। পাজামায় অনেকগুলো পকেট, তাতে নাকি অস্ত্র ঠাসা। আমরা সুকৌশলে গতকাল ভোরবেলা ওকে অ্যারেস্ট করেছি।"

"তাহলে তো মিটেই গেছে। পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার ঠেকায় কে?"

"মুশকিল হয়ছে কী—কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রচুর মারধোর, টর্চার করেও লোকটার মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ বার করা যায়নি। প্রথমেই জানা দরকার ও হঠাৎ আমাদের এই মফস্বলে কেন এসেছে? ও কী এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য এসেছে না কোনও নাশকতা করবে বলে এসেছে? ও যে হোটেলে ছিল তারা অবশ্য বলেছে যে ও মোটে দুদিন এসেছে।"

মেজদা একটু চিন্তিত মুখে বলল, "দেখুন জগাদা ও যদি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাইত তাহলে অত অস্ত্রশস্ত্র আনত না।"

জগাসুর বলে চলল, "ওর পকেট থেকে তিন তিনটে মোবাইল পেয়েছি আর একটা ছোট ডাইরি পেয়েছি। কিন্তু এর সম্বন্ধে কোনও তথ্য বার করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ তিনটে মোবাইলের কোনওটাতেই কোনও নম্বর স্টোর করা নেই। আর ডাইরিটাতে শুধুই কিছু নাম আর হিজিবিজি ছবি।"

"মোবাইলের সিমকার্ডগুলোর মালিকের খোঁজ করেছিলেন? টেলিফোন কোম্পানিতে?"

"হ্যাঁ। সবকটাই ভুয়ো।"

"মোবাইলগুলো দেখি।"

মেজদা তিনটে মোবাইল নিয়ে উল্টে পাল্টে বোতাম টিপে টিপে দেখল। "ঠিক বলেছেন। কোনও নম্বর সেভড্ নেই। ডাইরিটা দেখি। বদ্রীদাসের কোনও ফোন আসেনি?"

"না। যারা ওকে অ্যারেস্ট করেছে তাদের ধারণা ও অ্যারেস্টের কথা শুনেই ইংরিজিতে কাউকে একটা জানিয়ে দিয়েছে যে ও ধরা পড়ছে। তাই হয়তো ওর ফোন আসেনি। ওর স্যাঙাতদের খবর পেলে তবেই আমরা ওর উদ্দেশ্যটা ঠিক ঠিক জানতে পারব।"

মেজদা ছোট ডাইরিটা নিয়ে এক মনে উল্টোল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলল "আপাতদৃষ্টিতে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ইজিপ্সিয়ান স্ক্রিপ্ট Hieroglyphyics এর চেয়েও বেশী দুর্বোধ্য। জগাদা—আপনার ধারণায় এইসব হিজিবিজির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এমন তথ্য যার থেকে বদ্রীদাসের সঙ্গীদের হদিস মিলবে।"

"ঠিকই ধরেছ। আর সেই হদিস থেকে এই টেররিস্টের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। আমরা থানার অনেকেই বহু সময় দিয়ে এইসব হিজিবিজির মানে বোঝার চেষ্টা করেছি কিন্তু এর কোনও মানে আমাদের কাছে পরিস্কার হয়নি। এই দেখ প্রথম পাতায় শুধু কতগুলো নম্বর আর নামের লিস্ট—কাজল, দীপক, মনজিত, মজলুল....তারপর একটা পাতায় বড় বড় করে লেখা Stirroret, তারপরের বেশ কটা পাতা পুরো হিজিবিজি আর তারপরে আট-ন পাতা এই অদ্ভুত সব হিজিবিজি ডিজাইন।"

সেজদা এতক্ষণ শোনার পর আর থাকতে পারল না—"লোকটা মনে হয় পাগল, না হলে ডাইরিতে কেউ এই সব ল্-লেখে!"

"না অমু—আমার কিন্তু মনে হয় জগাদার কথার তাৎপর্য আছে—পানু কী বলিস?"

আমি সচরাচর মেজদার কথার অন্যথা করি না "আমি তোমার সঙ্গে একমত, ওই হিজিবিজির ভেতর গোপন তথ্য থাকতেই পারে।"

জগাসুর একটু চিন্তিত মুখে কনুই চুলকোল "অজয় তুমি ডাইরিটা রাখো। খুব তাড়াতাড়ি কোনও সমাধান সূত্র যদি বার না করা যায় তাহলে কোনও কাজের কাজ হবে না। টেররিস্টরা নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে পালাবে। ওরা বদ্রীদাসকে ছাড়াতে দল বেঁধে থানা আক্রমণও করতে পারে। আমি তোমাকে ফোন করে খবর নেব কোনও তথ্য পাওয়া গেল কিনা।" জগাসুর বিদায় নিল।

আমি, মেজদা আর সেজদা ডাইরিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বারবার উল্টে পাল্টে ডাইরির পাতাগুলো একরকম মুখস্থ হয়ে গেল, কিন্তু মাথামুন্ড কিছুই বোঝা গেল না। আমরা জলখাবারের সময় থেকে দুপুরের খাওয়া পর্য্যন্ত ডাইরি নিয়ে পড়ে রইলাম। তারপর মেজদা ডাইরি আর মোবাইল নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সন্ধেবেলা আমাদের ঘরে যথারীতি আমরা ছিলাম, খুব খোশমেজাজে ঢুকলো অরুণমামা। "আমি অজয়কে অন্য একটা ব্যাপারে ফোন করেছিলাম, তা অজয় আমাকে টেররিস্টের ডাইরির কথা বলল—চলেই এলাম। যদি কিছু মানে বার করা যায়। তোদের সঙ্গেও একটু কথা হবে, বেশ কদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই।"

অরুণমামা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডাইরিটা দেখতে লাগল। "আচ্ছা টেলিফোন কোম্পানিগুলোর কম্পিউটারে রেকর্ড নেই? এই মোবাইলগুলোর থেকে শেষ কোন কোন নম্বরে ফোন করা হয়েছিল?"

"সে খোঁজ জগাদা করেছিল—কিন্তু টেলিফোন কোম্পানিগুলো বলেছে, আগে থেকে বিশেষভাবে ইনফর্ম না করলে অমন রেকর্ড রাখা হয় না।"

আমি শুধোলাম "আচ্ছা অরুণমামা—টেররিস্টদের আমাদের এখানে কী কাজ থাকতে পারে?"

"সেটাই তো সকলের প্রশ্ন। জগন্নাথবাবু ঠিকই বলেছে, যে ওর স্যাঙাতদের খবর না পেলে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করা গেলে.....। আচ্ছা? জগন্নাথবাবুকে একবার আসার জন্য অনুরোধ করা যায়?" অরুণমামা ডাইরির পাতায় মনোনিবেশ করল। অরুণমামার পেছন থেকে হুমড়ি খেয়ে, আমি, ঢাকনাদা আর সেজদাও ডাইরিটা নিরীক্ষণ করছিলাম। ঢাকনাদা হঠাৎ বলে উঠলো "এটা গুপ্তধনের ছক মনে হচ্ছে। পরের পর পাতায় পথনির্দেশ।"

আমি বললাম, "ঢাকনাদা গুপ্তধন খোঁজার জন্য অত বিস্ফোরক আর গুলিবন্দুক লাগবে কেন?"

"লাগতেই পারে। কত সময়ে গুপ্তধন পাহাড়ের ভেতর লুকিয়ে থাকে—তাছাড়া—গুপ্তধন নিয়ে পালানোর সময় দস্যুর আক্রমণ হতেই পারে। তখন.....।"

সকলে হেসে উঠলো। সেজদা এমন সুযোগ ছাড়লো না। "ঢ্ ঢাকনাটা আস্ত ব্ বোকা।"

অরুণামামা বলল, "ফাজলামী থামা। ব্যাপারটা সিরিয়াসলি না ভাবলে কোনরকম কূলকিনারা করা যাবে না। সাত পাতার থেকে পনের পাতার ছবির একটি নক্সা নিশ্চয়ই সকলের মনে এতক্ষণে বসে গেছে। যে যার নিজের মত করে এই ন পাতার থেকে কোনও একটা সঙ্গত মানে উদ্ধারের চেষ্টা কর। কথায় বলে দুটো ব্রেন চারগুণ কাজ করে। সকলে মাথা খাটালে নির্ঘাৎ সলিউশন পাওয়া যাবে।"

মেজদা বলল, "গণেশ তোর ড্রয়িং-এর হাত খুব পরিস্কার, তুই, সব পাতার ছবি একটা পাতায় ক্রমান্বয়ে

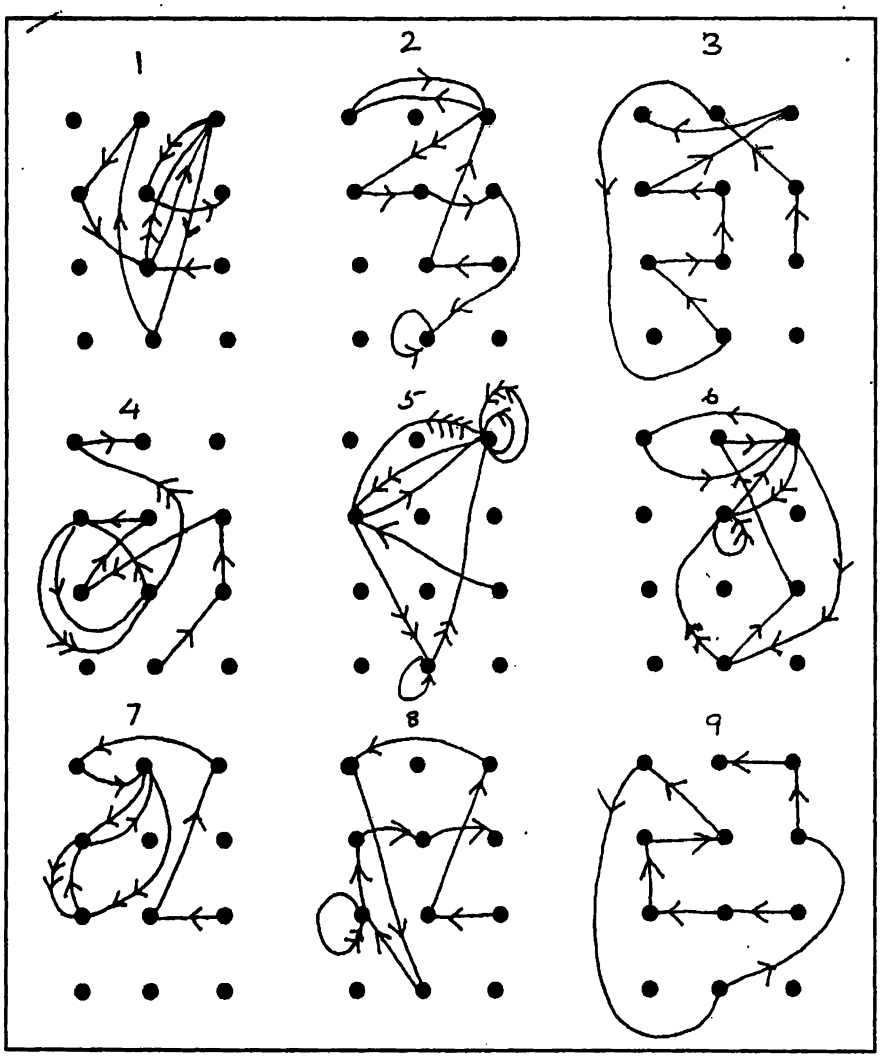

এঁকে ফেল তো। নম্বর দিয়ে দিবি।"

গণেশ বলল, "প্রথম দিকে কতগুলো নাম, আর কতগুলো পাতায় ভীষণ হিজিবিজি। ওগুলোকে বাদ দিয়ে বাকি ছবিগুলো এঁকে ফেলছি পাশাপাশি একটা কাগজে।"

মেজদা ঠিকই বলেছে। গণেশের আঁকার হাত খুব পরিস্কার, আঁকেও খুব ঝটপট। মিনিট দশেকের ভেতর আমাদের চোখের ওপর গণেশ ডাইরির পাতাগুলোর পটাপট ছবি এঁকে ফেলল। অরুণমামা আর মেজদা দু'জনে ডাইরির পাতার ছবির সঙ্গে ডাইরি মিলিয়ে সামান্য যা ভুলচুক ছিল সেগুলো শুধরে দিল। মেজদা আমাকে বলল "পানু তুই দৌড়ে যা। এই ছবিটার দশটা জেরক্স কপি করিয়ে এনে সকলকে একখানা করে ধরিয়ে দে। সক্কলে একসঙ্গে চিন্তা করুক ছবিগুলোর মানে।"

******

আমরা যে যার ছবিতে মনোনিবেশ করলাম। কেউ চিৎ হয়ে শুলো, কেউ উপুড় হয়ে, কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আরো নিরিবিলির খোঁজে, কেউ পায়চারি করতে লাগল। আমি আর ছকু পা মুড়ে মেঝেতে বসে পড়লাম।

ঢাকনাটা প্রায় আধঘণ্টা পরে স্তব্ধতা ভাঙলো। "আমার মনে হয় এটা বক্স মেকিং-এর মতন নিছক একটা খেলা। মনোরঞ্জনের জন্য। অবশ্য অবসর বিনোদনের জন্যও বলা চলে।"

মেজদা খ্যাঁক করে উঠলো "এই জন্যেই তুই গালাগাল খাস।"

"তুই বলনা এগুলোর মানে কী?" ঢাকনাদাও কম যায় না। মেজদা গুম মেরে গেল।

আমি গণেশকে বেশ জোরে বললাম "গণেশ বারোটা ফুটকির শেষ লাইনের দুটো ফুটকি কিন্তু কোনও ছবিতেই ব্যবহার করা হয়নি।"

অরুণমামা বলল, "আমিও খেয়াল করেছি সেটা। ওই ফুটকিগুলো না থাকলেও হয়ত চলত।"

মেজদা বলল "বেশীর ভাগ ছবিতে নটা লাইন দিয়ে ফুটকিগুলো জোড়া।"

সেজদা সায় দিল, "মাত্র দুটোতে দশটা লাইন।"

গণেশ শুধোল "এই নটা আর দশটা লাইনের কী মানে হতে পারে?"

ছকু শুধোল "এই তীর চিহ্নগুলোর কী মানে?"

ঢাকনাদার মেজাজটা খিঁচড়েই ছিল "মানে খোঁজার জন্যেই তো সক্কলে কাগজ হাতে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। অত মানে মানে করে ডিস্টার্ব করিস না। নিজে ভাব।"

জগাসুর খুব চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকলো। "কী? কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া গেল?"

"তেমন বলার মতন কিছু না।"

সেজদার মাথা মাঝে মধ্যেই বেশ ভালো কাজ করে। সেজদা বলল, "আচ্ছা এই বারোটা ফুটকি দিয়ে আমাদের এলাকার বারোটা ইম্পর্টেন্ট জায়গাকে চিহ্নিত করছে না? এই তীরওলা লাইনগুলো ক্রমান্বয়ে....।"

সেজদার মুখের কথা কেড়ে নিল গণেশ "আমারও সেই রকমই মনে হচ্ছে। দেখ—বেশীর ভাগ লাইনগুলোর শুরু হয়েছে তৃতীয় সারির ডানদিকের ফুটকি থেকে। মনে হয় এই ফুটকিটা রেলস্টেশন বোঝাচ্ছে। রেলস্টেশন থেকে বিভিন্ন রাস্তা ধরে ওরা এখানকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নাশকতা চালাবে, যেগুলো অন্য ফুটকিতে দেখানো।"

সেজদা বলল, "আর এই শেষ লাইনের মাঝের ফুটকিটা মনে হচ্ছে হাইওয়ের বাস স্টেশন। এখান দিয়েও কিছু টেররিস্ট এলাকায় ঢুকতে পারে।"

অরুণমামা একটু চিন্তিত গম্ভীর গলায় বলল, "অমু তোর কথা মতন এইগুলো হল আক্রমণ আর নাশকতার বিভিন্ন ছক। শেষ পর্যন্ত যে ছকটা সাব্যস্ত হবে সেটা সকলকে জানিয়ে দিয়ে কাজ শুরু করা হবে।"

মেজদা বলল, "তাহলে এই তৃতীয় লাইনের মাঝের ফুটকিটাকে থানা বলে ধরে নিতে হবে, কারণ অনেকগুলো ছকে স্টেশন থেকে এইখানেই প্রথম তীরওলা লাইন এসেছে। টেররিস্টরা প্রথমেই থানা আক্রমণ করে পুলিশ ফোর্সকে বিভ্রান্ত আর কমজোরি করে দেয়।"

জগাসুরের মুখে চিন্তার রেখা দেখা গেল। "নাঃ নাঃ। টেররিস্টরা প্রথমেই থানা আক্রমণ করে একথা ঠিক না। ওরা রেলস্টেশন, ব্রিজ, জলের ট্যাঙ্ক, প্রয়োজনীয় সৌধ, টেলিফোন টাওয়ার, এইসব আগে ওড়ায়।"

"আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনি ওদের সঙ্গীকে আটকে রেখেছেন, ওরা প্রথমেই তাকে ছাড়াবে না!"

"তা ভয়ের একটু আছে বইকি। আমার পুলিশ বাহিনী কম না। তারপর RAF আছে। কিন্তু টেররিস্ট AK-47 নিয়ে ঘোরে। মিনিটে একশো রাউন্ড ফায়ার করতে পারে। মাইন, বোমা, গ্রেনেড সব থাকে ওদের কাছে। কী দরকার যে ওদের এই সব মফস্বলে আসার কে জানে!!"

"এত ভয় পাচ্ছেন যখন তখন কি লোকটাকে ছেড়ে দেবেন?"

"No, never। আমি শেষ পর্যন্ত বীরের মত যুদ্ধ করব, আর পরে তোমরা বোলো 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে.....।"

"কবি মাইকেলের লাইন।"

"আমরা কিন্তু আমাদের আপাত সমস্যার থেকে সরে

যাচ্ছি—আচ্ছা জগাদা আগামী দু-চার দিনের ভেতর এখানে কোনও বড়ো সড়ো V.I.P.-র আসার কথা আছে?"

"তোমাদের তো জানার কথা না। আমাদের ঈশ্বরী নদীর ওপর যে নতুন ব্রিজটা হল সেটার উদ্বোধন পরশুদিন। উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অর্ণব মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। ওঁর এত ছোট ব্যাপারে আসার কথা না"—একটু এদিক ওদিক তাকালো জগাসুর—"এ কথাটা পাঁচকান যেন না হয়। অর্থমন্ত্রীর নিজের মাসীর বাড়ি এই গঙ্গাপুরে। উনি গুদোমপাড়ায় ব্রিজ উদ্বোধন করে, তারপর গঙ্গাপুরে মাসীর বাড়িতে অনেকক্ষণ কাটাবেন।"

ছকু হঠাৎ উত্তেজিত হল "পরশুদিনই তো তোমাদের মদনমোহন তলায় ঝুলনের বিরাট মেলা। কম করে দুহাজার লোক আসবে। তোমরা ভুলেই গেছ।"

"তোমার আর তোমার বন্ধুদের মনে থাকবেই, কারণ অগাধ পকেট মারার সুযোগ।" ছকু জগাসুরের দিকে আড়চোখে ইশারা করে ঠোঁটে আঙুল ঠেকালো। আমি থেমে গেলাম।

অরুণমামা একটা বিরাট "হুঁ" ছাড়লো।

মেজদা বলল "যা শুনলাম তাতে টেররিস্টদের আসার কথা। ওরা চায় V.I.P. মেরে, ভীড়ের ভেতর বোমা ফাটিয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করতে।"

অরুণমামা বলল, "বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে জনজীবন স্তব্ধ করে দিতে।"

জগাসুর বেশ উত্তেজিত হল, "ওই ডাইরির মানে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতেই হবে। আমাদের অন্য কোনও সূত্র নেই টেররিস্টদের trace করার। হাতে একটা মাত্র দিন।"

******

রাতে, বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ছবিগুলো ক্রমান্বয়ে আক্রমণের ছক বলে আমি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিইনি। ওই যুক্তি অবশ্য শেষ পর্যন্ত টেকেনি। কিন্তু সমাধানটা কী? আমি ক্রমাগত পাশ ফিরছিলাম উপুড় হচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম। পাশে শুয়ে সেজদা একমনে নাক ডাকিয়ে চলেছে। হঠাৎ চোখ খুলে আমাকে বলল, "কীরে ছারপোকা কামড়াচ্ছে?" আমি নেশাচ্ছন্নের মতো ভেবে চলেছি। আঁকাবাঁকা লাইন আর ফুটকিগুলোকে মনে হচ্ছে সাপ আর সাপের গর্ত। সাপগুলো সব একসঙ্গে গর্ত থেকে বেরিয়ে আমাকে তাড়া করেছে। আমি প্রাণপণ ছুটছি কিছুর একটা খোঁজে। সেটা মিললেই সব সাপ নেতিয়ে পড়বে।

রাত যখন তিনটে—তখন হঠাৎই আমার সব শিরায় টান পড়ল। শিরদাঁড়ার ভেতর ভেতর দিয়ে একটা উল্লাসের স্রোত বয়ে গেল। আমি এতজোরে লাফিয়ে উঠলাম যে খাটের ছত্রি খুলে সেজদার ঘাড়ে পড়ল। সেজদা "ঘ্যাঁও" করে চোখ খুলে, ছত্রি ঠেলে দিয়ে পাশ ফিরে শুল। আমি আলো জ্বালালাম। টেনে বার করলাম ডাইরির নক্সাটা। উত্তেজনায় আমার বুক ধক্ ধক্ করছে তা টের পেলাম। ঠিকই ভেবেছি। আবার দেখলাম নক্সাটা—হ্যাঁ। ঠিকই ভেবেছি। সাংঘাতিক আবিস্কার। আমি দৌড়লাম মেজদার ঘরে। মেজদা একমিনিটে দরজা খুলে আলো জ্বাললো।

আমি মেজদাকে বললাম এগুলো মোবাইল নাম্বারের ছক। এই দেখ। এই ফুটকিগুলোর মোবাইলের কী প্যাড বোঝাচ্ছে। ওপরে বাঁদিকে থেকে এক, দুই, তিন.....। আমাদের বেশীর ভাগ মোবাইলের নাম্বার নয় দিয়ে শুরু, তাই দেখ—এই তৃতীয় লাইনের ডান দিকে ফুটকি, নয় থেকে বেশীর ভাগ নক্সার শুরু। মোট নটা লাইন ক্রমান্বয়ে মোবাইলের দশ সংখ্যার নম্বরটাকে ফুটিয়ে তুলেছে। আর এই দেখ—এই কটা নম্বর অন্য প্রভিন্সের। এগুলো শূন্য দিয়ে শুরু। তারপর নয়। সব মিলিয়ে এগারোটা সংখ্যা। দশটা করে লাইন দিয়ে জোড়া।

আমার কথা শুনে মেজদা ভীষণ উত্তেজিত হল। "পানু—মনে হচ্ছে তুই ঠিকই বলছিস। কিন্তু লাইনগুলোর ক্রমপর্যায় বা sequence কীভাবে বোঝা যাবে?"

"সেটা এখনও ভেবে উঠতে পারিনি। চলো ভাবা যাক।" আমি আর মেজদা, মেজদার ঘরে রাত তিনটে দশের সময় আলো জ্বেলে ভাবতে বসলাম। দু'জনের হাতে দুটো নক্সা। একবার চিন্তার খুঁটটা পেয়ে গেলে চিন্তা করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। অনেকটা সুতোর জটের মতন। খুঁট পেয়ে গেলে বাকিটা খোলা যায়।

মেজদা মিনিট দশেক পরে বলল—"হুঁ আরো খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। এই তিন নম্বর নক্সাটার জটিলতা কম।"

"কম বলছ কেন?"

"এটাতো নটা লাইনের কোনওটাতেই একটার বেশী তীরর চিহ্ন নেই।"

"মানে মোবাইল নাম্বারটা সরাসরি একটানা বেরিয়ে আসছে।"

"হুঁ। নাম্বার হল 9620785431।"

"মেজদা, ডাইরির প্রথমদিকে তিন নম্বরে মনজিতের নাম আছে। একটা কাজ করো না। তোমার কাছে তো টেররিস্ট বদ্রীদাসের মোবাইলগুলো আছে। একটার থেকে মনজিতকে একটা ফোন করে দেখি আমাদের চিন্তাধারা ঠিক আছে কিনা।

"ঠিক বলেছিস। আমাদের টেলিফোন ও নাও তুলতে পার। কিন্তু কোন ভাষায় কথা বলব? ওদের কোড ওয়ার্ড

থাকে। মেজদা এই প্রথম পাতার যে লেখা Stirrorest এইটাই মনে হয় পাসওয়ার্ড। চলো দুর্গা বলে চেষ্টা করি।"

মেজদা বেশ দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বদ্রীদাসের একটা মোবাইল হাতে নিয়ে স্থির হয়ে বসল। মনে হল চিন্তা করছে, ফোন করে কী বলবে। তারপর ঠান্ডা মাথায় মোবাইলের বোতাম টিপে একটু অপেক্ষা করল। বলল "মনজিত। বদ্রী। Stirroret...."।

ফোনটা কেটে গেল। তারপর আর পাওয়া গেল না। যার ফোন, সে সুইচ অফ করে দিল। মেজদা একটু চুপ করে থেকে বলল "মনে হচ্ছে ঠিক লোককেই ফোন করেছিলাম, কিন্তু পদ্ধতিগত ভুলের জন্য বা নামটা বদ্রী বলার জন্য সুইচ অফ করে দিল।"

"হঠাৎ সুইচ অফ করল কেন? আগে তো সুইচ অন ছিল।"

"দেখ এই টেররিস্টরা খুবই informed। ওরা জানে যে পুলিশ একবার ওদের ফোন নম্বর পেলে, আর ফোন সুইচ্‌ড্ অন থাকলে, সহজেই ওদের নির্ভুল হদিস পেয়ে যাবে।"

"সেটা, ফোন সুইচ্‌ড্ অফ থাকলে কখনোই সম্ভব না। ওরা আমাদের পুলিশ ভাবছে।"

"হ্যাঁ। আর এই জন্যেই টেলিফোন নাম্বার নিয়ে এত লুকোচুরি।"

"একে আর চেষ্টা করে লাভ নেই। মেজদা ও আর সুইচ অন করবে না চট করে।"

মেজদা নক্সাগুলোর ওপর নজর বোলাতে লাগলো। "এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। এই ন নম্বর ছবিটা দেখ, এটাও কম জটিল। 9874510632। প্রকাশের নম্বর।"

"মেজদা আমাকে ওর আরেকটা ফোন দাও আমি কথা বলি।" ফোনটা ডায়াল করে আমি চুপ করে রইলাম। কারণ মোবাইলের কলার আইডির নাম্বার থেকেই ওরা বুঝবে কে করেছে। ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল "ফজল? Have you escaped?"

"Yes" বলেই ফোনটা কেটে দিলাম।

নিশুতি রাতে, মেজদা সবকথাই শুনতে পেয়েছিল। ফোন শেষ হতেই Eureka বলে লাফিয়ে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরল।

আমিও ভীষণ উত্তেজিত। মেজদা আর অরুণমামাকে টেক্কা মেরে আমি এতো জটিল ধাঁধার সমাধান করেছি। মেজদাকে বললাম "ধাঁধার বাকি অংশটা সেরে ফেলি।" মেজদা বলল—"দাঁড়া একটু কফি করে আনি।"

ভোর সাড়ে চারটেয় সময় আমি আর মেজদা কফির কাপ আর কাগজ নিয়ে ফের গবেষণায় বসলাম।

হঠাৎ মোবাইল ফোনটাতে ফোন এল। আমি সুইচ অফ করে দিলাম। মেজদা ডাইরির প্রথম পাতা আর নাম্বার দেখে বলল "প্রকাশই ফোন করেছে। নাম্বার আমরা ঠিকই বার করেছি। ও জানে ফজল এখন মুক্ত। তাই ফোন করেছে।"

আমি আর মেজদা কফি খেতে খেতে ভেবেই চললাম। প্রথম নম্বর দুটো সহজ ছিল, কিন্তু অনেকগুলো নম্বরই খুব জটিল। মাথা মুন্ড কিছুই করা যাচ্ছে না। আমি মেজদাকে বললাম "মেজদা—চার নম্বর ছবিটাকে দেখ। এটার শুরু জিরোর থেকে। এখানে চার আর আট এর ভেতর একদিকে দুটো লাইন। একটাতে একটা তীর চিহ্ন, অন্যটাতে দুটো। মনে হচ্ছে দুটো সংখ্যার ভেতর একটার বেশী লাইন থাকলে, তখন আগে পরে বোঝাতে একটা আর দুটো তীর চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

"ঠিক বলছিস না। ওই ছবিতে আট থেকে এক পর্যন্ত একটাই লাইন কিন্তু তাতেও ডবল তীর চিহ্ন।"

"ওঃ। আর ভাবা যাচ্ছে না—মাথা ঝনঝন করছে। পাশের পাঁচ নম্বর ছবিটা দেখ! ভীষণ জটিল আর কনফিউসিং।"

"হ্যাঁ। জিরোর থেকে একটা লাইন বেরিয়ে আবার জিরোতে ঢুকেছে। আর তিন নম্বর ফুটকির দুটো লাইন, ঘুরে এসে তিন নম্বরেই ঢুকেছে একটাতে একটা তীর; অন্যটাতে তিনটে। সেখান থেকেই একটা লাইন চার নম্বরে গেছে তাতে চারটে তীর।" মেজদার কপালে চিন্তার ভাঁজ।

পেন্সিলের পেছন না চিবোলে আমি চিন্তা করতে পারি না। হঠাৎ শিস পৌঁছে আমি চমকে উঠলাম। বুঝলাম কত মন দিয়ে ভাবছি। কিন্তু প্রহেলিকা ছেদ করা যাচ্ছে না।

আরো প্রায় আধঘন্টা আমরা ক্রমান্বয়ে ভেবে চললাম। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। পূবের আকাশে বেশ জোরালো আলো। হঠাৎ উত্তেজিত মেজদা লাফিয়ে উঠলো। "হয়ে গেছে রে পানু—পেয়ে গেছি — পেয়ে গেছি!!!" মেজদাকে সচরাচর এত উত্তেজিত হতে দেখি না। "পুরো সমাধান—পেয়ে গেছ মেজদা?"

"হ্যাঁ। পাক্কা। তীর চিহ্নগুলোর মানে বোঝ। তাহলেই পুরোটা বোঝা যাবে। একটা ফুটকি থেকে, প্রথম যে লাইনটা বেরিয়েছে সেটায় একটা তীর। দুনম্বর যে লাইনটা বেরিয়েছে তাতে দুটো তীর। সেইভাবেই তৃতীয়, চতুর্থ লাইন একই ফুটকি থেকে বেরোলে তাতে তিনটে এবং চারটে তীর। পঞ্চম ছবিটা দেখ। এখানে একই ফুটকি থেকে তীরওলা

লাইন বেরিয়ে সেখানেই আবার ফিরেছে। তার মানে সেই সংখ্যাটা পরপর দুবার। এই ছবিরই তিন-এ দেখ দুটো লাইন তিন নম্বরেই ফিরেছে। একটায় একটা তীর, আর একটায় তিনটে তীর। মানে তিন সংখ্যাটা মোবাইল নম্বরে দুবার দুবার করে চারবার আছে। খেয়াল কর তিন নম্বর থেকে আরো দুটো লাইন বেরিয়েছে। দুটোই চার-এ গেছে একটায় দুটো তীর অন্যটায় চারটে তীর। কতগুলো তীর সেটা লাইনগুলোর পর্যায়ক্রম বোঝাচ্ছে, যেমন ধর পঞ্চম ছবিতে, নয় থেকে চার হয়ে তিন এ, লাইন গেল একটা করে তীর মাথায়। দুটো তিন এর পর দুটো তীর মাথায় লাইন গেল চার এ। চারের থেকে প্রথম লাইন বেরোল একটা তীর মাথায় আবার গেল তিন এ সেখান থেকে দুটো তিন হয়ে চারটে তীর মাথায় গিয়ে পৌঁছল চার এ। অর্থাৎ পাঁচ নম্বর ছবির ফোন নম্বর হল 943 3400334।"

কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে আমার প্রায় কুড়ি সেকেন্ড সময় লাগলো। আমি লাফিয়ে উঠে মেজদাকে জড়িয়ে ধরলাম "মেজদা তুমি একটা জিনিয়াস।"

মেজদা হেসে বলল "আমি না, আজকের জিনিয়াস তুই। আসল ক্লুটা তুইই বার করেছিস। কিন্তু পরস্পরের পিঠ না চুলকে দরকারি কাজটা সেরে ফেলা যাক। চার নম্বর ছবির ফোন নম্বর 09675484812", আমরা সব ফোন নাম্বারগুলো decipher করে লিখে ফেললাম।

"মেজদা — এখন কী করণীয়"। মেজদা বলল "আমরা এখন একটা ভীষণ সঙ্কটময় মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে। বেঠিক একটা পদক্ষেপ, টেররিস্টদের সচেতন করে দেবে যে আমরা ওদের নাম্বার decipher করে ওদের সন্ধানের চেষ্টায় আ[illegible]ই সব ফোনের সুইচ অফ করে দেবে। আমরা বা পুলিশ আর কোনও হদিসই করতে পারবো না।"

"তাহলে?"

একটু ভাবলো মেজদা। "আমার মনে হয় পরবর্তি পদক্ষেপের আগে অরুণমামার সঙ্গে একটু আলোচনা করা ভালো। অরুণমামা প্রফেসর মানুষ, ওঁর বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে বহুল পরিচিতি। তাছাড়া অভিজ্ঞতাও প্রচুর।"

******

সাত সকালে আমাদের ঘরে ঢুকলো অরুণমামা, একরকম চোখ কচলাতে কচলাতে। আমাদের কথাবার্তা শুনে, আর ডাইরির ছবির সঙ্গে আমাদের লিখে রাখা ফোন নম্বর মিলিয়ে এই বয়সেও একরকম নেচে উঠল। "দারুণ। Simply great। সত্যিই দারুণ দিয়েছিস।"

মেজদা বলল "পরের পদক্ষেপটা।"

অরুণমামা একটা সিগারেট ধরালো। "ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। জগন্নাথবাবুকেও ডাক। সকলে একটু আলোচনা করা দরকার।"

সকাল সাতটার সময় প্রচুর আলোচনার পর সাব্যস্ত হল যে আমরা একবার করে ফোন করে দেখে নেব। আটটা ফোন অন আছে কিনা। মনজিতের ফোন সুইচ্‌ড্‌ অফই রয়েছে। কিন্তু বাকি নম্বরগুলো দেখা গেল অন আছে। অরুণমামা বলল দেখি ডাইরির এই প্রথম পাতায় যে Stirroret লেখা, এটা কিন্তু ফজলের পাসওয়ার্ড। এটা Terrorist কথাটার অ্যালফাবেটগুলো অন্যভাবে সাজানো। এটা প্রয়োগ করে হয়তো টেররিস্টদের সঙ্গে কথা বলা যাবে কিন্তু এটুক এদিক ওদিক হলে...এই চেষ্টাটা না করাই ভালো।"

জগাসুর বলল, "এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় পুরো লালবাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। ওরা আজ দুপুরেই আসবে ফোর্স নিয়ে, বদ্রীদাস ওরফে ফজলকে নিয়ে যেতে।"

"সে ঠিক আছে—কিন্তু আমাদের নাকের ওপর নাশকতা হলে আমরা ঠেকাবো না! আমাদের এলাকা সম্বন্ধে আমাদেরও দায়িত্ব আছে।"

অরুণমামা বলল "আমি গতরাতে ইন্টারনেটে টেররিস্টদের গতিবিধি সম্বন্ধে পড়লাম। ওরা সাধারণ রিমোট কন্ট্রোল বোমা ব্যবহার করে এই সব ক্ষেত্রে। মানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বোমাটাকে ফাটানো হয়। বোমাটা সাইকেল, মোটর সাইকেল বা গাড়িতে রাখা থাকে।"

"মোবাইল দিয়ে কী করে বোমা ফাটায়?"

"সংক্ষেপে বললে—তোর যখন ফোন আসে তখন একটা সুইচ অন হয় যেটা Ringtoneটা বাজায়। ওই সুইচ দিয়ে অনায়াসে বোমা ফাটানো সম্ভব। আত্মঘাতি মানব বোমা যদি হয় সেখানে বোমা গায়ের সঙ্গে থাকে। সেটা রিমোট কন্ট্রোলে বা নিজে বোতাম টিপে ফাটায়। তবে আত্মঘাতি মানববোমার খরচ, সব মিলিয়ে প্রচুর। বিশেষ ক্ষেত্রেই শুধু ব্যবহার হয়।"

আমি শুধোলাম "আচ্ছা অরুণমামা একটা মোবাইল ফোনের অবস্থা পুলিশ বা টেলিফোন কোম্পানি কতো নির্ভুলভাবে বলতে পারে?"

"দাঁড়া সমরকে ফোন করি। সমর এখন BSNL-এর চিফ্‌ জেনারেল ম্যানেজার।"

ফোনে কথা শেষ করল অরুণমামা। "সমর বলছে Global Positioning Satellite GPS ব্যবহার করলেও পাঁচশো মিটার বাই পাঁচশো মিটারের কমে মোবাইলকে

লোকেট করা সম্ভব না।"

"সে তো বেশ বড়ো জায়গা—তার ভেতর কতো মোবাইল.....।"

"সেটাই তো সমস্যা!"

"দেখ পুলিশের কাজ পুলিশ করবে। আমরা কী করব সেটা আমাদের চিন্তা।"

জগাসুর বলল "সেটাই ঠিক। আমি এগোই। বদ্রীকে নিতে লালবাজার থেকে লোক আসবে।"

অরুণমামা একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু পায়চারি করল। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বলল—"আমার এক বন্ধু আছে রাজাবাজার সাইন্স কলেজে, তার নাম জ্ঞানবিকাশ রায়। জ্ঞান খুব, advanced mobile jammer এর ওপর গবেষণা করে।"

আমাদের অবুঝ মুখগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে অরুণমামা কাঁধ ঝাঁকালো "একটু খুলে বলা দরকার। মোবাইল ফোন যে বেতার তরঙ্গে কাজ করে অর্থাৎ ৮০০ থেকে ১৮০০ মেগাহার্টজ, এই jammer সেই তরঙ্গ পরিসর জুড়ে ভীষণ জোরালো electromagnetic noise চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। তার ফলে মোবাইল ফোনগুলো একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে। আরেকটু প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর তোরা একটা পুজো প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখছিস। অজু আর অমু কথা বলছিল। হঠাৎ প্রচন্ড জোরে ঢাক বেজে উঠলো। মানে শব্দের noise তৈরি হল। তখন কি আর ওরা পরস্পরের কথা শুনতে পাবে?"

"একদম পাবে না।"

"ঠিক সেইরকমই jammer এর noise এ মোবাইল কাজ করতে পারবে না। দাঁড়া আমি এক্ষুনি জ্ঞানকে ফোন করছি। দেখি ও আমাদের একটা jammer ধার দেবে কিনা।"

ফোন ছাড়ল অরুণমামা। "হ্যাঁ। জ্ঞান, রাজি আছে। আমাদের একটা জোরালো zso jammer ধার দেবে। Jammerটা গাড়ির ব্যাটারি থেকে চলবে। ওটা সর্বশক্তিতে চালালে, এক কিলোমিটার রেডিয়াসের একটা বৃত্তের ভেতর, কোনও মোবাইল বা অন্য রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে নাশকতা সম্ভব হবে না। জ্যামারটার ওজন দশ কিলোর মতন।"

অরুণমামা একটু চা আনতে দিল। চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করল। "তোরা বয়সে অনেক ছোট। একটা কথা আগে ভাগে বলি রাখি। এই টেররিস্টরা ভীষণ বেপরোয়া। ওদের সঙ্গে কেউ কোনরকম বিরুদ্ধতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাবে না। খেয়াল রেখো ওদের কাছে আধুনিক সব মারণাস্ত্র থাকে। ব্যাপার সাংঘাতিক দাঁড়াবে।"

সন্ধেবেলা ছকু এসে হাঁফাতে লাগল। "সব দেখে এলাম গো পানুদা—ইয়া বড় মঞ্চ বানিয়েছে ৭৯ নম্বর জাতীয় সড়কের একটু ইদিকে যেখান থেকে নতুন পুল শুরু হয়েছে গো ঈশ্বরী নদীর ওপর। বাবা! পুলিশ আর পুলিশের কুকুর গিজগিজ করছে। সব শুঁকে শুঁকে দেখছে।—"

আমি বললাম "আমিও অনেক জানি ছকু। কাল অর্থমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে মাইন ডিটেক্টর গাড়ি থাকবে। যা রাস্তায় আর আশপাশে পোঁতা ল্যান্ডমাইন খুঁজে বার করবে। নতুন ব্রিজের উদ্বোধন হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

******

পরের দিন, কথামত, দুপুর দুটোয় বাড়ি ফিরে দেখি অরুণমামার গাড়ির পেছনের সিটে একটা বেশ বড় স্যুটকেসের মতন বাক্স! মেজদা, সেজদা আর অরুণমামা গাড়ির বনেট খুলে, বাক্সর থেকে বেরোনো দুটো মোটা তার, গাড়ির ব্যাটারিতে লাগাচ্ছে। অরুণমামা "জ্যামারের কাজ দেখ।" বলে জ্যামারটা চালু করে দিল। "অজু আমার মোবাইলে ফোন কর।"

মেজদা অনেক চেষ্টা করল। মোবাইল কাজ করল না। আমি বললাম "দারুণ ব্যাপার তো।"

অরুণমামা জ্যামারটার সুইচ অফ করে দিল। "আমি BSNL এর সমরকে দিয়ে টেররিস্টদের মোবাইলগুলোর অবস্থান ট্র্যাক করেছি। সব কটা টেররিস্ট আমাদের এখানে দু-নম্বর টেলিফোন টাওয়ারের কাছে ছড়িয়ে আছে। কী সাংঘাতিক ঘটনা যে আজ ঘটতে পারে তা ভাবলেও গা শিউরে উঠছে।"

******

অর্থমন্ত্রী আসবেন বিকেল সাড়ে চারটেয়। নতুন সেতুর উদ্বোধন বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। পাঁচফুট উঁচু মঞ্চটা আনুমানিক তেরো ফিট বাই দশ ফিট। ফুলের মালা দিয়ে খুব সুন্দর সাজানো। মঞ্চের সামনে অল্প দূরত্বে বিরাট প্যান্ডেল। কম করে তিনশ চেয়ার, তারপরে দাঁড়ানোর জায়গা।

আমরা পৌনে চারটের সময় মঞ্চের সামনে পৌঁছোলাম। অরুণমামার গাড়িটা প্যান্ডেলের থেকে কুড়ি গজ দূরে পার্ক করল। গাড়ির থেকে জ্যামারটাকে বার করে আমরা মাটিতে প্লাস্টিকের ওপর নামালাম। অরুণমামার মতে গাড়িতে ওটা থাকলে electromagnetic shielding হবে। এখান থেকে মঞ্চের ওপরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ঠিক সাড়ে চারটের সময় বিরাট কনভয় আর পুলিশ

বাহিনী নিয়ে ৭৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এলেন অর্থমন্ত্রী। আমরা পরিস্কার দেখতে পেলাম। অর্থমন্ত্রীর বডিগার্ড, পুলিশ আর কুকুর ভালো করে মঞ্চটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করে নিল।

অর্থমন্ত্রী নিজেই বেশ জনপ্রিয়। তাছাড়া সকলে জানে ওঁর জন্যই ঈশ্বরী নদীর ব্রিজটার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। তাই স্বল্প সময়ে মানুষে মানুষে প্যান্ডেল উপচে পড়ল। কম করে হাজার লোক ভিড় করল এসে।

অর্থমন্ত্রী মঞ্চে উঠলেন বডিগার্ড নিয়ে। অর্থমন্ত্রীকে সঙ্গ দিলেন এলাকার কিছু রাজনৈতিক নেতা। অরুণমামা জ্যামার চালিয়ে দিল। আমরা দেখলাম সব মোবাইল অকেজো হয়ে পড়ল। উদ্বোধনী সঙ্গীত শেষ হবার পর অর্থমন্ত্রী কাঠের উঁচু মাইক রাখার জায়গায় গিয়ে মাইকে তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। মূলতঃ বলে চললেন তাঁর পার্টির গুণের কথা। মানুষের প্রতি বদান্যতার কথা।

চারদিকে পুলিশ আর পুলিশ। আমরা খেয়াল করলাম আরো দুজন পুলিশ অফিসার একটা লাল বাইকে চড়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে এসে মন্থর গতিতে মঞ্চের পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎই পেছনের আরোহী একটা মাঝারি মাপের কিট্ ব্যাগ উঁচু করে সজোরে ছুঁড়ে দিল মঞ্চের দিকে। সেটা মঞ্চের সামনের দিকে গিয়ে পড়ল।

মুহূর্তে তুমুল হট্টগোল বেঁধে গেল। অর্থমন্ত্রীর রক্ষী দুজন তাঁর সামনে ঢালের মতন দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম মোটর বাইকের পেছনের পুলিশ একটা মোবাইল উঁচু করে বার বার বোতাম টিপছে। প্রায় দশ সেকেন্ড কোনও ফল না হওয়াতে পেছনের লোকটা পেছন ফিরে বসল। একটা AK-47 জাতীয় লাইট মেশিনগান বার করল মোটরবাইকের ডাব্বা থেকে। তারপর শূন্যে বেশ ক'রাউন্ড গুলি চালালো। ততক্ষণে সকলে সাংঘাতিক ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। মুহূর্তে বেশ ক'জন

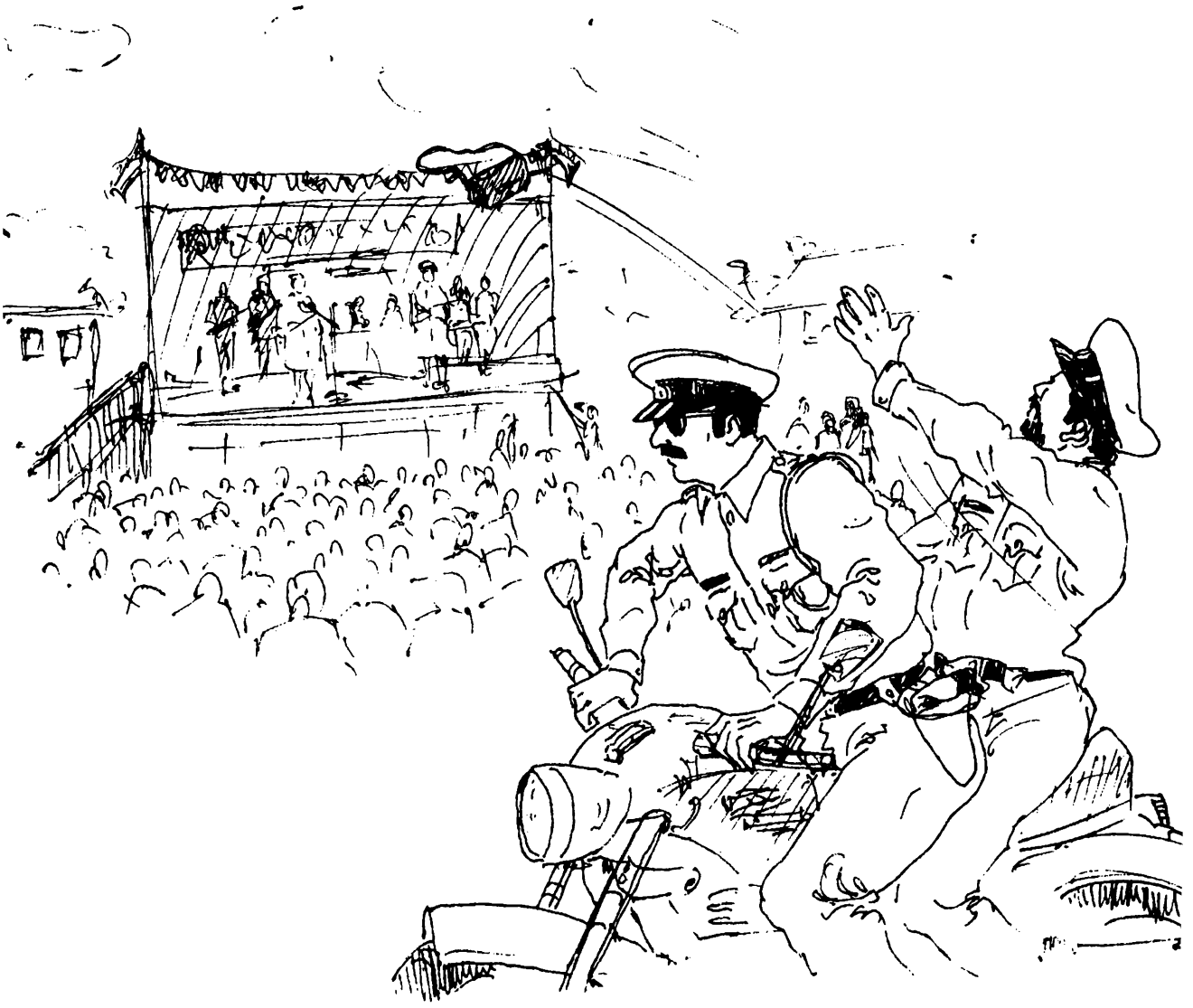

কনস্টেবল আর সাধারণ নাগরিক ছুটে গেল ওদের ধরতে। AK-47 এর মুখ নামল। কয়েক ঝলক আগুন চলকে বেরোল। মোটরবাইক ঝড়ের গতিতে ৭৯ নম্বর জাতীয় সড়কে উঠলো। পেছনে ছুটলো দুটো পুলিশ জিপ ওদের উদ্দেশ্যে গুলি করতে করতে।

টেররিস্টরা চলে যাবার পর কিছুক্ষণ আমরা স্থানুর মতন বসে রইলাম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। আমরা বহুরকম থ্রিলার সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু চোখের ওপর এই ঘটনাবলী আমাদের পুরো স্ট্যাচু বানিয়ে দিয়েছে। মেজদা অরুণমামার জোরালো Zoomওলা ক্যামকর্ডারে পুরো ঘটনাবলী রেকর্ড করেছে।

আমাদের সংবিত ফিরতেই আমরা দৌড় লাগালাম মঞ্চের দিকে। অর্থমন্ত্রী মঞ্চে, চেয়ারে বসে। তাঁকে ঘিরে বডিগার্ড আর পুলিশ। বম্ব স্কোয়াডের লোকেরা এর মধ্যেই ব্যাগটাকে লাঠির আগায় নিয়ে পুকুরে চুবিয়েছে। ডেটনেটারটা আলাদা করে দিয়েছে। ওরা জানিয়েছে টেরস্টিটদের ছোঁড়া ব্যাগে আনুমানিক দু'কিলোর আর ডি এক্স বোমা আছে। যা মঞ্চের লোকেদের তো বটেই, আশপাশের আরো পঞ্চাশজনকে মারতই। টেররিস্টদের গুলিতে দু'জন পুলিশকর্মী আর তিনজন এলাকার মানুষ জখম হয়েছেন কিন্তু কারোরই প্রাণ সংশয় হয়নি। সমবেত জনতা আসন্ন বিপদে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। জগাসুর মাইকের সামনে দাঁড়ালো।

"বন্ধুগণ আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা এমন আধুনিক যন্ত্র বসিয়েছি, যা টেররিস্টের বোমাকে স্তব্ধ করেছে। অর্থমন্ত্রী আর আপনাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই যন্ত্র থাকাকালীন এখানে টেররিস্টদের নাশকতা চলবে না, কোনও বোমা ফাটবে না। এই কাজ করেছেন অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অজয় রায় ও তাঁদের দলবল। আপনারা নিজের জায়গায় ফিরে আসুন। আমাদের অনুষ্ঠান চলবে।"

হঠাৎ সমবেত জনতা ক্ষেপে উঠলো আনন্দে। টেররিস্টদের হারিয়ে তারাই যেন অর্থমন্ত্রীকে নবজীবন দিয়েছে। স্লোগানে স্লোগানে ভরে উঠলো চারদিকে "অর্থমন্ত্রী যুগ যুগ জিও।"

আমরা অরুণমামার কাছে ফিরলাম। জ্যামার একটানা চলছে। ভাষণ শেষ হল। উদ্বোধন শেষ হল। হঠাৎ দৌড়ে এল জগাসুর। "চলুন অর্থমন্ত্রী আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবেন।"

অরুণমামা বলল, "আপনার সঙ্গের কনস্টেবলকে এখানে দাঁড়াতে বলুন।" জগাসুর আমাদের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, "এঁদের বুদ্ধির জোরেই আজ আপনি প্রাণে বাঁচলেন স্যার। এঁদের বুদ্ধির জোরেই বোমা স্তব্ধ হয়ে গেছে।"

অর্থমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা ভরা গলায়, আমাদের দিল্লী এলে ওঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করার কথা বললেন। জনতা আমাদের কাঁধে তুলে নাচতে লাগলো। রাত্তিরের মুখে আমরা আমাদের ঘরে ভীষণ উত্তেজনা মাখা পর্যালোচনা করছিলাম, গোটা ঘটনাবলীর। হঠাৎ একগাল হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলো জগাসুর, "সামনের রবিবার আমার বাড়িতে আপনাদের সবার নেমন্তন্ন।"

"কারণটা জানতে পারি?"

লজ্জায় বিহ্বল হয়ে পড়ল জগাসুর "একটু আগেই T.V.-র লোক আমার ইন্টারভিউ নিয়ে গেছে। আমার একটা প্রমোশন হবে।"

*ছবি ঃ রাহুল মজুমদার*

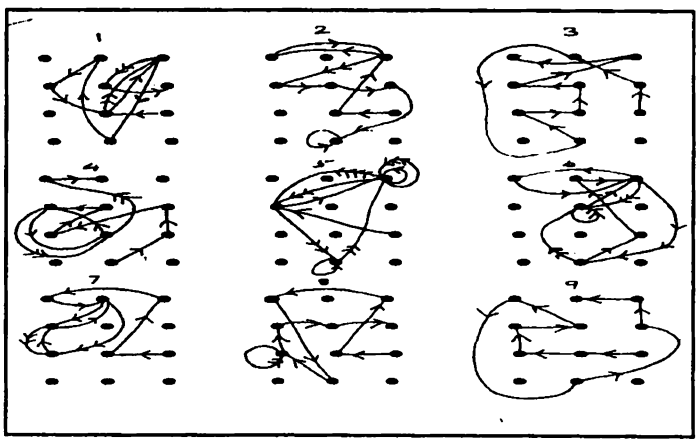

# নির্জন দ্বীপের রহস্য

## অনিন্দ্য অধিকারী

আমার জেলফোনটায় মাঝরাতে যে এনকোডেড মেসেজটা এল সেটাকে অটো সিন্থেসাইজারে ডি-কোড করে তো আমার আক্কেলগুড়ুম। মেসেজটা এসেছে ৬৮° লঙ্গিচ্যুড আর ১৮° ল্যাটিচ্যুডের কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে, আমার জেলফোন যে জায়গাটাকে বলছে আরব সাগরের মধ্যবর্তী কোন দ্বীপ অর্থাৎ আইল্যাণ্ড। আমি এই মাঝরাতে গুগুল সার্চ ইঞ্জিনেও জায়গাটার কোন হদিস পেলাম না। এই গুগুলটা এত ব্যাকডেটেড একটা সাইট! আমার নিজস্ব সাইটটা আধ্বেক বানানো অবস্থায় পড়ে আছে। অ্যাতো কাজের চাপ পড়েছে যে সাইটটা শেষ করতে পারছি না। পারলে আর গুগুল ইয়াহু-র দরকার পড়ত না। মেসেজটা তোমাদের দেখাচ্ছি, তার আগে এই জেলফোনের রহস্যটা খুলে বলি। এই ফোনটায় একটা স্লটে দু'ফোঁটা জল ঢেলে দিলে ফোনটা ঠিক তিনশো পঁয়ষট্টি দিন চলে। নো চার্জিং। নো রি-চার্জিং। বিলকুল ফ্রিতে ফোনটা ব্যবহার করা যায়। জাপান আমেরিকা চীন তিনটে দেশ থেকেই পেটেন্ট চেয়ে গভর্ণমেন্ট মেল পাঠিয়েছিল। ওবামা তো নিজে ফোন করেছিল। আমি স্ট্রেইট না বলে দিয়েছি। আরে ব্যাটা ওবামা, তোরা ফোনের পেটেন্ট নিয়ে করবি কী! জেল কোথায় পাবি? ওটা তো বিলকুল ইনডিয়ান জিনিস। চাঁপাকলা, বেল, থোড়, হেলেঞ্চা শাক এই রকম সাতাশটা জিনিস মিশিয়ে আমি সাত বছর গবেষণা করে জেলটা তৈরী করেছি।

ওবামা বললেই দিয়ে দোব! এবার তোমরা মেসেজটা দেখ।

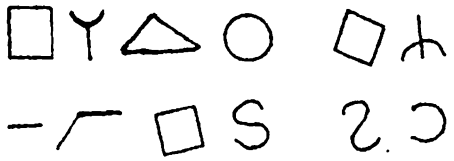

আমার অটো সিন্থেসাইজার এটাকে ডি-কোড করে যা জানিয়েছে তার জন্যই আমি আর আমার ভেলকি মুম্বাই যাওয়ার ফ্লাইটে উঠে বসেছি। এমনিতে প্লেনে কুকুর নিয়ে যাওয়ার অনেক হাঙ্গাম। কিন্তু ভেলকি দুনিয়ার সবচেয়ে ছোট কুকুর। এমনকি একটা টুনটুনির চেয়েও ছোট। অ্যাতো ছোট যে মুঠোয় চেপে পকেটে ভরে রাখলে মনে হয় একটা রুমাল রেখেছি ভাঁজ করে। জেলফোনের মত ভেলকি-ও আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আরেক ভেলকি। আমি যখন যেখানে যাই ভেলকি তখন সেখানে আমার সঙ্গেই থাকে। ভেলকি যে কতবার আমাকে কত গভীর সমস্যা থেকে বাঁচিয়েছে সে সব কথা তোমাদের পরে বলব। এখন এই প্লেনে ভেলকি আমার ট্রাউজারের পকেটে ঘুমোচ্ছে। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি আমার অটো সিন্থেসাইজার আর জেল ফোনটা-ও আমার সঙ্গেই আছে।

মুম্বাই-এ নেমে আমার পুরনো পরিচিত রুস্তমজীকে ফোন করলাম একটা হাইড্রোফয়েল ভাড়া নেওয়ার জন্য। এই হাইড্রোফয়েল জলে ডাঙায় সমান চলে, যা আমার লেটেস্ট অভিযানটায় খুব দরকারে লাগবে। ঐ রকম এনকোডেড মেসেজ আমার জেলফোনে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরো কয়েকবার এসেছে যা আমার হৃদস্পন্দনের গতি দ্রুততর করেছে। ঠিক ঐ সময়ে ৬৮° লঙ্গিচ্যুড আর ১৮° ল্যাটিচ্যুডের মাঝামাঝি দ্বীপটায় পৌঁছতে পারলে ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হবে। মেসেজটা যিনি পাঠাচ্ছেন সেই ডঃ কেজরিওয়াল আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। নিরুদ্দেশ হওয়ার বারো ঘন্টা আগেও তিনি আমার পৈতৃক টালার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে চা আর ডালমুট খেতে খেতে ওনার কিছু সাসপিশান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তার পরদিন থেকেই ওনার আর খোঁজ নেই। এই অ্যাতো বছর পর আমার জেলফোনে ওনার মেসেজ এল। তাও এনকোডেড। আমার জেলফোন নাম্বারটাও এনকোডেড অর্থাৎ টপ সিক্রেট। যাই হোক রুস্তমজী আমাকে একটা হাইড্রোফয়েল যোগাড় করে দিয়েছেন। আমিই চালাব। ভাড়াটাও একটু বেশী-ই পড়ল। তা আর কী করা যাবে। আমি একমাসের জন্যই ভাড়া নিয়ে নিয়েছি। আজ সন্ধেবেলা একটা অদ্ভুত কান্ড করল ভেলকি। এখন অব্দি আসা সব কটা মেসেজ নিয়ে যখন আমি ফাইনালি অটো সিন্থেসাইজারে বসেছি, ভেলকি আমার ল্যাপটপের ঢাকনাটার ওপর বসেছিল। হঠাৎ অ্যাটাচড্ মাইক্রো প্রিন্টারটার দিকে তাকিয়ে 'ভু উ উ ক ভু উ উ ক' করে ডাকতে লাগল। ও ডাক শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্টারটা থেকে কাগজ বেরোতে লাগল। এই কাগজটা আমারই বানানো, অনেকটা শালপাতা আর

ভুর্জপত্রের মত, এটায় কিছু লেখা থাকলে তা খালি চোখে পড়া যায় না। সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে হিটিং চেম্বারে এটাকে রাখলে তবে লেখা ফুটে ওঠে। এটার একটা হোম মেড ভার্সান তোমরাও বানাতে পার। সাদা কাগজে চিনি গোলা জল দিয়ে কিছু লিখে শুকিয়ে নাও। তারপর সেই সাদা কাগজটা কোন ফ্রেমের ওপর ধরলে দেখবে যেটা লিখেছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছিল না সেট ফুটে উঠেছে। যাইহোক আমার স্পেশাল পেপারটা হিটিং চেম্বার থেকে বের করে যে কোডেড মেসেজটা ফুটে উঠল সেটাকে যতবার অটো সিন্থেসাইজারে দিলাম ততবার মেসিনটা হ্যাং করে গেল। এমন তো কখনো হয় না! মেসেজটাও অদ্ভুত। আমি বহু রকমের কোডেড মেসেজ নিয়ে ঘেঁটেছি, এইরকম কোড কখনো দেখিনি। আর আমার অটো সিন্থে সাইজারটা হ্যাং করে যাচ্ছে মানে তো ওটা ও রিড করতে পারছে না। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। ডঃ কেজরিওয়াল পাঠাননি এটা নিশ্চিত। কে পাঠাল? কি জানাতে চাইল? উত্তরটা না জেনে অশান্ত লাগছে মনটাও। যাইহোক, কাল সকালে আমাদের জার্ণি স্টার্ট হবে। ভেলকির শরীরটা চাঙ্গা রাখবার জন্যে আজ শুধু বাসকপাতা আর ফার্ণের একটা পেস্ট ওকে খাইয়েছি। ওর সুস্থ থাকাটা খুব জরুরী।

হাইড্রোফয়েলটা চালাতে চালাতে শরীর মন দুই-ই জুড়িয়ে গেল। আরব সাগরের নীল টলটলে জল কেটে হাইড্রোফয়েলটা ছুটছে নির্দিষ্ট অভিমুখে। আমার রিস্ট ওয়াচ একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করে। এই রিস্টওয়াচের ভরসাতেই আমার হাইড্রোফয়েল চালানো। সবসময় লঙ্গিচ্যুড ল্যাটিচ্যুড মেনশন করে যাচ্ছে ঘড়িটা। অ্যাতো জল দেখে ভেলকির অ্যাতো আনন্দ হয়েছে যে ও হাইড্রোফয়েলের ব্রিমটায় উঠে সামারসল্ট খাচ্ছে। এবার ওটার কান মূলতে হবে। বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, একটা গুরুতর কাজে যাচ্ছি, সেটা তো জানে ও। কাল রাতে আমি ওকে একঘন্টা ধরে বুঝিয়েছি এই অভিযানের গুরুত্ব। আর এখন কি না ও ডিগবাজি খাচ্ছে! হাইড্রোফয়েল চালাতে চালাতে আমি ভেলকি বলে ধমক দিতেই ও সুড় সুড় করে ব্রিম থেকে নেমে এসে কাঠবিড়ালির মত আমার ট্রাউজার বেয়ে পকেটে ঢুকে গেল। আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওকে আদর করে দিলাম।

যে দিকেই তাকাই শুধু জল। হঠাৎ-ই পকেট থেকে মুখ বের করে ভেলকি ভুক্ ভুক্ করে ডাকতে লাগল। ওর একত্রিশ রকমের আওয়াজে জেলফোনে রের্কড করে আমি সিন্থেসাইজারে ডিকোড করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে ভুক্ ভুক্ করার অর্থ ও কিছু দেখেছে। এবার আমারো চোখে পড়ল। সবুজ গাছে ছাওয়া অনেকগুলো দ্বীপ। মুম্বাই উপকূল তিনঘন্টা আগে ফেলে এসেছি। আমার রিস্টওয়াচের সঙ্গে লাগানো কম্পাস বলছে আমরা নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি এসে গেছি। আমার বুকের মধ্যে উত্তেজনায় ঢাক পিটছে। জেলফোনটাও ৬৮° লঙ্গিচ্যুড আর ১৮° ল্যাটিচ্যুড দেখাচ্ছে। এই ফোন সব জায়গায় সমানভাবে ব্যবহার করা যায়। কোন টাওয়ার ফাওয়ার পাওয়ার ঝামেলা নেই। আমি হাইড্রোফয়েলটা দ্বীপগুলোর দিকে চালিয়ে দিলাম।

আমি সুন্দরবনে হনুমানের ওপর গবেষণা করার জন্য অনেকদিন কাটিয়েছি। আরব সাগরের এই দ্বীপগুলো অতুলনীয়। ঘন সবুজ নারকেল গাছে দ্বীপগুলো ঢাকা। সবচেয়ে অদ্ভুত এই দ্বীপগুলোর সবুজ হনুমান। গাছের পাতায় এমন মিশে রয়েছে, আলাদা করা যায় না। আর সমুদ্রে রয়েছে বেগুনি তিমি। ছোট ছোট। এগুলোকে তিমি না বলে মিমি বলা ভালো। লম্বায় এক হাত-ও হবে না। এই তিমি বা মিমিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা আলট্রা ভায়োলেট রে-তেও ক্যামেরায় ধরা পড়ে না। এক ধরণের ইনভিজিবল্ প্রাণী এগুলো। আমি দেখতে পাচ্ছি কারণ আমার চোখে স্পেশাল গগল্‌স্‌টা আঁটা আছে তা দিয়ে আমি জলের তলাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এখানে আরব সাগরের তলায় একটা পাল তোলা জাহাজ ডুবে আছে যেটার গায়ে পর্তুগালের নাম লেখা। তার মানে পাঁচশো বছর আগে যখন ভাস্কো দ্য গামা এ দেশে এসেছিল তখনই জাহাজটা ডুবে যায়। ঐ জাহাজের খোল-ই এই ইনভিজিবল মিমিগুলোর আস্তানা। কী আশ্চর্য! অ্যাতো যে ডিসকভারী টারী চ্যানেল রয়েছে, ওরা এই মিমিগুলোর সন্ধানই জানে না। আমার হাইড্রোফয়েলের আওয়াজে মিমিগুলো স্যাট স্যাট করে ডাঙ্গা থেকে জলে নেমে গেল। আর আমি হাইড্রোফয়েলটাকে তুলে দিলাম ডাঙ্গায়। কয়েকটা সবুজ হনুমান গাছ থেকে নেমে অবাক চোখে আমাকে দেখতে লাগল। হনুমানগুলোকে দেখে ভেলকির এত আনন্দ হল যে ও তির তির করে ওর ল্যাজটা নাড়াতে লাগল আমার কাঁধে চেপে।

যত এই দ্বীপগুলোর কাছে এগিয়েছি, আমার জেলফোনে এনকোডেড মেসেজ তত বেশী এসেছে। হাইড্রোফয়েল চালাতে চালাতে ওগুলো আর ডিকোড করতে পারিনি। এবার ডাঙ্গায় একটা নারকেল গাছের

তলায় আমার অটো সিন্থেসাইজারে সাজিয়ে বসে ওগুলো ডি-কোড করতে লাগলাম। করতে করতেই নিশ্চিত হলাম ঠিক জায়গাতেই এসেছি। এই আশপাশে কোন একটা দ্বীপ থেকেই মেসেজগুলো এসেছে। কোথাও কোন মানুষের সাড়া শব্দ নেই। শুধু কাছেই কোন জায়গা থেকে ঝির ঝির করে ঝরনার আওয়াজ আসছে। তার মানে এই নারকেল গাছগুলোর আড়ালে পাহাড় বা টিলা জাতীয় কিছু আছে। এতক্ষণ হাইড্রোফয়েল চালিয়ে খিদে খিদে পাচ্ছিল। সাইডব্যাগে মাল্টিভিটামিন বিস্কুট আর সঙ্গের ফ্লাস্কে চাঁপাফুলের মধু ছিল। বিস্কুট মধু দিয়ে খেয়ে সমুদ্রের জলে মুখ ধুতে লাগলাম। যাচ্চলে। এ আবার কী! সমুদ্রের জল তো লোনা হয়। এখানে আরব সাগরের জল আমাদের টালার বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিল। অদ্ভুত তো। ভেলকিও চুক্ চুক্ করে খানিকটা জল খেয়ে আনন্দে কান নাড়াতে লাগল টিক টিক করে। তবে আমি জানি এবারের জার্ণিতে অনেক অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। সমুদ্রের মিঠে জল তার মধ্যে একটা নিশ্চয়ই। মুখ হাত ধুয়ে ভেলকিকে কাঁধে নিয়ে রুকস্যাকের মধ্যে যন্ত্রপাতি ভরে পকেটে জেলফোন নিয়ে গামবুট পরে জঙ্গলের দিকে হাঁটা দিলাম। যে মেসেজগুলো এসেছিল তার একটাকে ডি-কোড করে ঝরনার কথা পেয়েছিলাম। কিন্তু ঝরনার কাছে গিয়ে দেখলাম, এটা সেই ঝরনা নয়। কারণ মেসেজে ছিল ঝরনার পাশে একটা প্রাচীন বাওবাব গাছ থাকবে। এখানে কোন বাওবাব গাছ নেই। ঝরনার পাশে পাথরের ওপর বসে জেলফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। এখানে কোডেড মেসেজ খুব ঘন ঘন আসছে। এই মেসেজগুলো ডিকোড করতে করতে ক্যারেকটারগুলোর সঙ্গে আমার একটা চেনা জানা হয়ে গেছে। অটো সিন্থেসাইজার ছাড়াই বুঝতে পারছি কেজরিওয়াল সাহেব এস. ও. এস পাঠাচ্ছেন। তোমরা এস. ও. এস জান তো? দূর সমুদ্রে যখন কোন জাহাজ বিপদে পড়ে তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন এস. ও. এস পাঠায় যার পুরো কথা হল সেভ আওয়ার সোলস্।

বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হল না ভাগ্যিস। হাইড্রোফয়েল নিয়ে গোটা দু'তিনটে দ্বীপে ঢুঁ মারতেই পেয়ে গেলাম সেই ঝরনা যার ধারে সেই বাওবাব গাছ। উত্তেজনায় আমার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেছে। ভেলকিও দেখছি লেজ খাড়া টাড়া করে একদম রেডি। ছোট্ট টিলাটার মাথায় হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠলাম। যাইহোক বয়েস তো একটা ফ্যাক্টর বটেই। ওরে বাবা এ কী! টিলাটার মাথায় একটা বিশাল গহ্বর। ঝরনাটার জল সেই গর্তের ভেতর থেকে তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ে গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই রকম ঝরনা তো কোথাও দেখিনি। ভেলকিকে কাঁধে নিয়ে গর্তের গা বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম। গর্তের চারপাশ ভর্তি ঝোপঝাড়। এখানে ওখানে সবুজ হনুমানের হুপহাপ। বিশাল ডানাওয়ালা একটা বাদুড়ের মত পাখি গর্তের মাথায় চক্রাকারে ঘুরছে। তোমরা টেরোডাকটাইলের ছবি দেখেছো? অনেকটা সেই রকম। পাখিগুলো নিশ্চয় এই গর্তের তলায় থাকে কারণ, যত নিচে নামছি ততই দেখছি সংখ্যায় বাড়ছে এইগুলো। একটা তো প্রায় ভেলকিকে খামচা মেরে গেল। ভেলকি রেগেছে বুঝতে পারছি কারণ রাগলে ও গরগর করে। গর্তটার কি শেষ নেই? ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম আকাশটা ছোট্ট হয়ে গেছে। নিচে সূর্যের আলো ঢোকার কোন প্রশ্নই নেই। আমার স্পেশাল গগল্স্টার জন্য সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। জেলফোন এখন আর থামছেই না। মেসেজ এসেই যাচ্ছে। যাকে বলে নন-স্টপ। সন্দেহ নেই কেজরিওয়াল সাহেবের খুব কাছাকাছি এসে গেছি। এমন সময় চোখে পড়ল একটা টানেল। সাত পাঁচ না ভেবে ঢুকে পড়লাম টানেলটায়। আর কী আশ্চর্য, জীবনে বিস্মিত হওয়ার এমন সুযোগও ঘটে!

একটা তকতকে শহর। এক তলা, দোতলা মাটির বাড়ি। সুন্দর দেওয়াল ঘেরা চওড়া রাস্তা। গাড়ি নেই। ঘোড়া নেই। ধোঁয়া নেই। ধুলো নেই। চীৎকার নেই। চেঁচামেচি নেই। সবই কী অদ্ভুত প্রশান্ত। মানুষের পোশাক আশাকের কোন বাহার নেই। সবাই সাধারণ। সবাই সমান। কোথাও যেন কোন তফাৎ নেই। আমি যে একটা বিদেশী মানুষ, কই আমার দিকে তো কেউ তেড়ে এল না, শুধু সবাই ভীড় করে এসে দাঁড়াল আমায় ঘিরে। মুখে তাদের অদ্ভুত ভাষা। চোখের দৃষ্টিতে ভয় মেশানো কৌতূহল। আমায় দেখে কী বুঝল কে জানে। ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরল। তারপর সবাই আমায় আর ভেলকিকে নিয়ে চলল মিছিল করে। আমার জেলফোন এখন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কেজরিওয়াল কি বুঝে গেছেন আমি এসে গেছি! দু তিনশো মানুষের মিছিল একটা গোলাকার বাড়িতে আমায় নিয়ে এল। এদের ভাষা আমি বুঝছি না। আমিও এদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি না। কিন্তু কি মজা জান তো। মনের ভাষা আর চোখের ভাষার কোন দেশ বিদেশ হয় না। তোমরা যখন আরো বড় হবে তখন বুঝবে বিশ্বাস ভালবাসার ভাষা সব দেশে সব কালে এক। সেই গোল মতন বাড়িটার মধ্যে একটা গোল মাঠ। আর সেই মাঠ

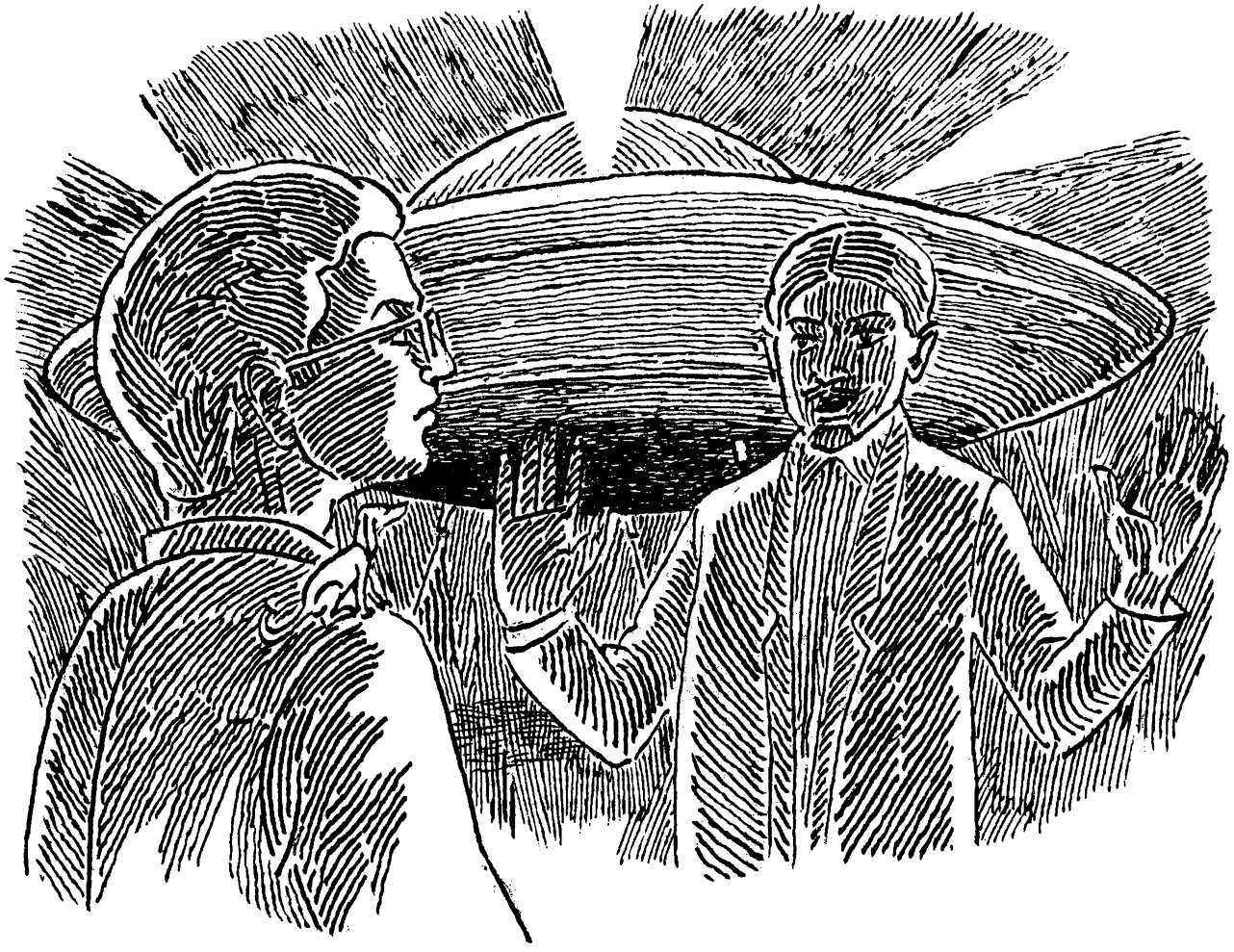

জুড়ে কি দাঁড়িয়ে আছে জান? তোমরা যাকে ইউ. এফ. ও বল, সেই ইউ. এফ. ও। আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট্। গোল ডিস্কের মত যার নীচ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। সেই দু'তিনশো মানুষের মিছিল আমায় নিয়ে দাঁড় করালো সেই ডিস্কের সামনে। আস্তে আস্তে একটা লুকনো দরজা খুলে গেল। আর সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর ইতিহাস প্রেমী ডঃ ইন্দ্রনাথ কেজরিওয়াল। নেমে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমায়।

ভেলকি আমার কাঁধ থেকে নেমে অবাক চোখে ইউ. এফ. ওটা দেখছিল। ডঃ কেজরিওয়াল আমার কাঁধে হাত দিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় ঐ মানুষগুলোকে কিছু বলছিলেন। মানুষগুলো উত্তরে কিছু বলল। আমি এ ভাষার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝছিলাম না। ডঃ কেজরিওয়াল আমায় বললেন, 'কিছু বুঝলেন না তো? আমি এদের ভাষাই এনকোড করে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম আপনাদের বিজ্ঞান কতটা এগিয়েছে বোঝার জন্য।'

'কিন্তু সেই মেসেজটা তো আপনি পাঠাননি।'

'আমিই পাঠিয়েছিলাম। এরা এদের টেক-রুম থেকে মেসেজটা সেন্ড করেছিল আমারই নির্দেশে।'

বুঝলাম কেন আমার অটো-সিন্থেসাইজার হ্যাং করে যাচ্ছিল। এরা কারা! এরা তো এই পৃথিবীর মানুষদের মতই দেখতে। অথচ রয়েছে মাটির নীচে! ডঃ কেজরিওয়াল আমায় বললেন,

'এরা আপনাকে এদের এই শহরে স্বাগত জানাচ্ছে। পাঁচ হাজার বছর ধরে এরা এই শহরে বাস করছে। কিন্তু আর বেশীক্ষণ করবে না। এই অসভ্য পৃথিবীতে থাকতে থাকতে এরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমি এদের নিয়ে যাব এখান থেকে। তার আগে চলুন। এদের শহরটা ঘুরে ফিরে দেখুন আমার সঙ্গে। তারপর ফিরে গিয়ে এদের কথা আপনাদের সুসভ্য মানুষদের জানাবেন। পণ্ডিত হিসেবে বিশ্বে আপনার মর্যাদা দুর্লভ। আপনার বক্তব্য কেউ অবিশ্বাস করবে না।'

'এরা কারা ডঃ কেজরিওয়াল? আপনি যে এনকোডেড

মেসেজগুলো আমায় পাঠিয়েছিলেন তাতে এদের কথা বলেছিলেন বটে কিন্তু এদের পরিচয় ডিসক্লোজ করেননি।'

'ইচ্ছে করেই করিনি। আপনি বিশ্বাস করতেন না। এখন চলুন শহরটা দেখা যাক। বিশেষ করে এদের টেক-রুমটা।'

ডঃ কেজরিওয়ালের নির্দেশে ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল। ভেলকিকে ডাকলাম। ভেলকি সুড়সুড় করে আমার কাঁধে উঠে এল। অসম্ভব কৌতূহল হচ্ছিল আমার। পকেট থেকে জেলফোন বের করে পটাপট ইউএফওটার কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। আমার জেলফোনটার মেমরি কার্ডটা কুড়ি জিবির। ভয় নেই। অসংখ্য ছবি তুলতে পারব।

পথ চলতে চলতে ডঃ কেজরিওয়াল বলতে লাগলেন, 'আপনি তো জানেন আমি তিনবার তিব্বতে গেছি। সেখানকার এক প্রাচীন মনাস্টারিতে পাওয়া কিছু পুঁথিপত্র ঘেঁটে আমি এদের বিষয়ে জানতে পারি। আপনি তো বিজ্ঞানের পাশাপাশি বেদ চর্চাও করেছেন ঋক বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ইন্দ্রের কীর্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি ভরদ্বাজ বলেছেন যে, চয়মানের পুত্র অভাবতীর প্রতি দয়া করে ইন্দ্র বরশিখের ছেলেদের হত্যা করেছিলেন, হরিয়ূপীয়ার পূর্ব দিকে অবস্থিত বুচীবানের বংশধরদের তিনি বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত বরশিখের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়েছিলেন।'

'এই হরিয়ুপীয়াকেই আমরা হরপ্পা বলে জানি।'

'হ্যাঁ যেটা জানি না, ইন্দ্র বুচীবানের সব বংশধরকে হত্যা করতে পারেননি। ইন্দ্রের আক্রমণ থেকে কিছু বুচীবান আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। তারাই পালিয়ে এই দ্বীপে। ইন্দ্র এদের তাড়া করে এসে এ পাহাড়ের মাথায় বাজ ফেলেছিলেন। আপনি আসার সময়ে যে গর্ত বেয়ে নেমে এলেন সেই গর্তটা হয়েছিল ইন্দ্রের বাজের আঘাতে।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এই যে, দু'তিনশো মানুষ, এরা সবাই সেই সিন্ধুযুগের? আপনার এই দাবীর অর্থ বোঝেন? পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে।'

'সে তো হবেই।। আর আমি কিছু বলছি না। তিব্বত মনাস্টারিতে প্রাচীন পুঁথিপত্র-ই সব কথা বলছে। আর বলছে মাটির তলায় টিকে থাকা এই সুসভ্য নগর সভ্যতা। যা আপনি নিজের চোখে দেখছেন। এই যে, আমরা টেক-রুমে এসে গেছি।'

ডঃ কেজরিওয়ালের সঙ্গে টেক-রুমে ঢুকে আমি হাঁ হয়ে গেলাম। আমি আমেরিকার নাসায় কাজ করে আসা বৈজ্ঞানিক। বছরে তিনবার আমায় ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে লেকচার দিতে যেতে হয়। এই পোষ্ট মর্ডান টেক-রুম কোন প্রাচীন সভ্যতার মানুষ বানিয়েছে তা ভাবাই যায় না। বিশাল বিশাল সুপার কমপিউটার কৃষি নিয়ে গবেষণা করছে ঊনিশ কুড়ি জন ঝকঝকে তরুণী। আমার মনে পড়ল, প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার মেয়েরাই চাষবাসের কাজ করত। কৃষি মেয়েদেরই আবিষ্কার। এই পাঁচ হাজার বছর বাদেও মেয়েরাই কৃষি নিয়ে গবেষণা করছে। ডঃ কেজরিওয়াল আমার হতভম্ব ভাব কাটাবার জন্য বললেন, খাদ্যই মানুষের একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস ডঃ মুখার্জি। সব কিছু ছাড়া চলে, খাদ্য ছাড়া চলে না। এই প্রাচীন সভ্যতা সেই সার কথা জানত। সেই প্রাচীন শিক্ষাই এরা এখনও বহন করে চলেছে। এদের জীবনযাত্রা আবর্তিত হচ্ছে এই খাদ্য উৎপাদনকে ঘিরে। সব শিক্ষা, সব গবেষণাই এই উদ্দেশ্যে। আপনাদের আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে এদের সবচেয়ে বড় তফাৎ এইখানেই। আপনারা আরাম বিরামের বন্দোবস্ত করতে পারেন। আর পারেন অ্যাটমিক বম্ব বানাতে। আপনাদের পৃথিবীতে এখনও মানুষ না খেয়ে মরে। কিসের জন্য অহংকার করেন আপনারা? এত যে ডেভলপমেন্ট, আপনারা সব মানুষের মুখে খাবারটুকুও তুলে দিতে পারেন না, অথচ শিক্ষা সভ্যতার গর্ব করেন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত ডঃ মুখার্জি। উচিত এই প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য এদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া।'

আমি কি বলব বুঝে উঠতে পারলাম না। ডঃ কেজরিওয়ালের সব বক্তব্যই সত্যি। আমাদের বিজ্ঞানীদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমিও যে ভাবি না তা নয়। ইথিওপিয়া হোক কিংবা আমাদের দেশের কোন ফুটপাথ—নিরন্ন হাড় জিরজিরে শিশু দেখে আমারই চোখ জলে ভরে আসে, কিন্তু আমি ডঃ কেজরিওয়ালকে বলতে পারলাম না আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তিমানুষ বড় একা বড় অসহায়। প্রাচীন যৌথ সমাজ ভেঙ্গে যে একলা চলার রীতি তৈরী হয়েছে তাতে মানুষের ধ্বংস সাধনের পথই তৈরী হচ্ছে। সব বুঝেও এক বিরাট ব্যবস্থার শিকার আমরা।

ডঃ কেজরিওয়াল আমার মুখ দেখে কি বুঝলেন কে জানে, নরম স্বরে বললেন, 'ভাববেন না এই মানুষগুলোর আপনাদের ওপর কোন অভিযোগ আছে। এরা এদের সব কথাই লিখে গিয়েছিল। শুধু আপনারই পড়ে উঠতে পারলেন না সেই লিপি এখনও।'

'আপনি পেরেছেন ডঃ কেজরিওয়াল?'

'পেরেছি বৈকি। এদের সব লিপির পাঠোদ্ধার করেছি আমি। মানুষ নিজের অন্ন সমস্যা মেটাতে পারে তার স্পষ্ট নির্দেশ আছে লিপিগুলোতে।'

'তা হলে পৃথিবীর মানুষকে জানাচ্ছেন না কেন ডঃ কেজরিওয়াল? আপনি তো চব্বিশ বছর আগে দেখে এসেছিলেন মানুষের দুরবস্থা। আজ এত বছরে সেই দুরবস্থা বেড়েছে বৈ কমেনি।'

'পৃথিবীর মানুষ নিজেদের পাপের ফল ভোগ করছে ডঃ মুখার্জি। মানুষ নিজেই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ নিজে থেকে খুঁজে পাবে। যদি না পায় ধ্বংস হবে। এরা কাউকে সাহায্য করতে যাবে না যেচে। এখন চলুন। কিছু খাওয়া যাক।

মাল্টিভিটামিন বিস্কুটের কার্যকারিতা তিন ঘন্টা। প্রায় পাঁচ ঘন্টা হতে চলল পেটে কিছু পড়েনি। ভেলকিরও খিদে পেয়েছিল। ডঃ কেজরিওয়ালের সঙ্গে লাঞ্চ-রুমে এলাম। উনি পকেট থেকে ক্যালকুলেটারের মত একটা যন্ত্র বের করে বোতাম টিপে অর্ডার প্লেস করে দিলেন। প্রতিটা টেবিলের সঙ্গে একটা কনভেয়ার বেল্ট লাগানো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধোঁয়া-ওঠা ডিস হাজির। উনি গোল রুটির মত দুটো আমার প্লেটে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'ঘাস শুকিয়ে ক্রাশ করে একটা স্পেশাল ট্রিটমেন্টে এই রুটি তৈরী হয় ডঃ মুখার্জি। খেয়ে দেখুন। আপনাদের গমের রুটির চেয়ে টেন টাইমস্ সুস্বাদু মুখে দিতেই মনে হল অমৃত খাচ্ছি। ভেলকিকেও দিয়েছি একটা টুকরো। ভেলকিও খেয়ে কান নাড়াতে লাগল। মানে আরো দাও। একটা ফ্রাই-এর মত আইটেম ছিল। ডঃ কেজরিওয়াল বললেন, 'বাদাম গাছের ছাল গোলাপের রসে ডুবিয়ে সফট করে ডুবন্ত তেলে ভাজা হয় এটা।'

যা বুঝতে পারছি, এরা নানারকম খাদ্য নিয়ে গবেষণা করে খাদ্যটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। খানিক খাওয়া দাওয়া করে পেট ভরে গেল। শেষ আইটেম ছিল ধানের সরবৎ। আমি হলফ করে বলতে পারি, এই এক গ্লাস সরবৎ খেলেই মানুষ আর কিছু খেতে চাইবে না, এত সুস্বাদু।

খাওয়া দাওয়া আর এন্তার ছবি তুলে ডঃ কেজরিওয়ালের সঙ্গে ইউ. এফ. ও-তে ফিরলাম। এটার ব্যাপার জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ভেলকি এখন আমাদের সঙ্গে নেই। ও শহরটা খানিক ঘুরে ফিরে দেখতে গেছে। ভালোই করেছে। আমরা দুজনে দুটো ফ্লোটিং চেয়ারে বসেছিলাম। এ রকম ফ্লোটিং চেয়ার আমি কোথাও দেখিনি। এখানে এসে যা যা দেখছি তা আমার জেলফোন বা অটো সিন্থেসাইজার বা এ জাতীয় যত উদ্ভাবন করেছি, মায় ভেলকি পর্যন্ত সব তুচ্ছ মনে হচ্ছে। মানুষ তো এই সর্বোচ্চ উন্নতিরই স্বপ্ন দেখে। যেখানে প্রধান চাহিদা খাওয়া মিটিয়ে মানুষ সব আরাম বিরাম করবে। মানুষে মানুষে কোন ভেদ থাকবে না। মানুষ কাজ করবে শুধু নিজের জন্য নয় সমগ্র মানব সভ্যতার জন্য। নিজেকে বড় সামান্য মনে হচ্ছিল। আমি আমার আবিষ্কার দিয়ে সভ্যতার কোন উপকার করতে পারিনি। ডঃ কেজরিওয়াল বললেন, 'আমি আজই এদের নিয়ে চলে যাব এখান থেকে, এমন গ্রহে যেখানে এরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। মাটির তলায় লুকিয়ে থাকতে হবে না। এরা এদের জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে সভ্যতাকে উন্নত করতে পারবে। এরাও চাইছে না আর।' আমি না বলে পারলাম না, 'এই যে উন্নত শহর, এই টেক-রুম এই সব আধুনিক ব্যবস্থা ফেলে রেখে যাওয়াটা ঠিক হবে?'

ডঃ কেজরিওয়াল হাসলেন। 'আমি সেপ্টাটেট্রন গ্রহে যোগাযোগ করে এই ইউ. এফ. ওটা আনিয়েছি। আপনি অ্যাতোক্ষণ যা যা দেখলেন সব ডিসম্যান্টল করা যায়। এই ইউ.এফ.ওটা অ্যাতো বড় যে সব কিছু এর মধ্যে ঢুকে যাবে। এরা সেপ্টাটেট্রনে গিয়ে নতুন করে সভ্যতা সাজিয়ে বসবে সম্মানের সঙ্গে। আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকবে না এদের। আপনাকে তো ডেকে পাঠিয়েছি তো এদের কথা বাইরের পৃথিবীতে জানানোর জন্য। আপনি আপনার জেলফোনে সব রেকর্ড-ও করে নিয়েছেন। এখানে আপনার কাজ শেষ। এবার আপনি ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন।'

ডঃ কেজরিওয়াল ফ্লোটিং চেয়ারে ছেড়ে ওঠে পড়লেন। 'আমাদের-ও যাওয়ার সময় হয়ে এল।'

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

আমরা দু'জন ইউ.এফ.ও থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছি খোলা সবুজ মাঠের মাঝখানে। সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য। এদেশের পাঁচ হাজার বছর আগেকার সভ্যতার অবশিষ্ট কয়েকশো অধিবাসী মাঠের ঘাসে ঘাসে লুটোপুটি খাচ্ছে হাসছে কাঁদছে গড়াগড়ি দিচ্ছে। শেষবারের জন্য। ঘাস হয়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যেন। আর এদের মধ্যে তিড়িং বিড়িং করে নেচে বেড়াচ্ছে আমার আদরের ভেলকি।

*ছবি ঃ শিবশঙ্কর ভ...*

# লুপ্ত পাখিদের কথা

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত মহাসাগরের বুকে জাহাজে ভাসতে ভাসতে ১৫০৫ সালে মাদাগাস্কারের উপকূল থেকে শ পাঁচেক মাইল দূরে পর্তুগীজ অভিযাত্রী মাস্‌কারেনহাস (Mascarenhas) আবিষ্কার করলেন কয়েকটি দ্বীপ। মরিশাস, রিইউনিয়ন আর রড্রিগজ (Mauritius, Reunion, Rodriguez)। এখন অবশ্য এদের একত্রে অনেক সময় বলে মাসকারেনে দ্বীপপুঞ্জ (Mascarene Islands)। দেখতে দেখতে ওলন্দাজ, ইংরেজ আর ফরাসী জাহাজরাও আসতে লাগল, কারণ দ্বীপগুলিতে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় জল ছিল অভিযাত্রীদের জন্যে। প্রধান আকর্ষণ ছিল মোটাসোটা, উড়ান-হীন, প্রায় পাউন্ড পঞ্চাশেকের এক প্রজাতির পাখি, যেগুলোকে একটা

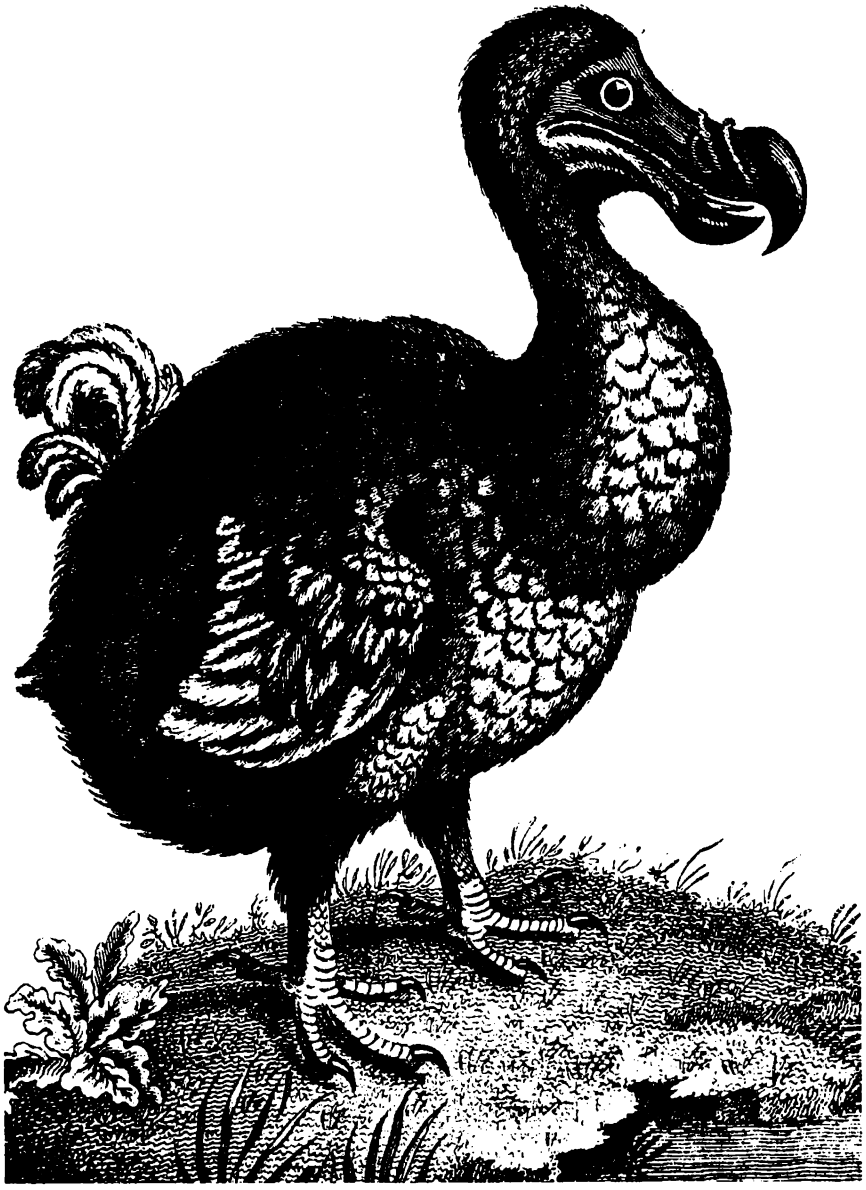

ডোডো পাখি

মুগুরের ঘা মেরেই মেরে ফেলা যেত, তারপর নুনে জরিয়ে পিপের মধ্যে ভরে অনেকদিন পর্যন্ত রাখা যেত। পর্তুগীজ নাবিকরা তাদের সম্ভবত ডুডোস (duodos) যার মানে হাবাগোবা, তাই বলত—কারণ তারা পালাবার কোন চেষ্টাই প্রায় করত না তেমন, বলতে গেলে বসে বসে মার খেত। তবে এ সব কথা পুরোপুরি আন্দাজ। কিন্তু যেটা আন্দাজ নয়, নিশ্চিত জানা যায় তা হল ওলন্দাজরা তাদের ডড-আরসে (dod-aarse) বলত। এই দুটোর কোনটা থেকেই 'ডোডো' নামের উৎপত্তি হয়েছে। ইংরেজিতে আমরা মজা করে বলে থাকি 'ডোডোর মত মৃত' (as dead as a dodo) কিন্তু এই দুর্ভাগা পাখি কেবলমাত্র মানুষের নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর লোভের শিকার হয়ে পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল।

মাসকারেনহাস প্রথম দেখতে পাবার পর মাত্র ১৭৪ বছরের মধ্যেই এই পাখি নিশ্চিহ্ন প্রজাতি হয়ে পড়ল। তারা হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তনের ফলে ঐ আকারে এসেছিল এবং আত্মরক্ষার বিশেষ কোন পদ্ধতি না থাকা সত্ত্বেও ঐ দ্বীপগুলিতে বহু সংখ্যায় বেঁচে ছিল তার প্রধান কারণ যে সেখানে বিশেষ কোন মাংসাশী হিংস্র প্রাণী ছিল না। মানুষ ঐ দ্বীপগুলিতে ইঁদুর, শূওর, বাঁদর—যারা প্রত্যেকেই ডোডোদের ডিম খায়, তাদের আমদানি করে বেচারাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করল। আজ ডোডোর স্মৃতি হিসাবে আমাদের সম্বল কেবলমাত্র কয়েক টুকরো হাড়, ডিমের খোসা আর তখনকার আঁকা কয়েকটা কাঁচা হাতের ছবি। ডোডো ছাড়াও মাসকারেন দ্বীপগুলিতে আরও একুশ রকম বিচিত্র প্রজাতির পাখি ধ্বংস হয়ে গেছে।

দ্বীপপুঞ্জে সচরাচর যে সব পাখিরা বসবাস করে তারা বিবর্তনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিতে ভাগ হয়ে যায়। পরিষ্কার তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল ডোডোরা। যাকে আমরা ডোডো বলি তারা কেবলমাত্র মরিশাসেই বাস করত। 'সাদা ডোডো' বা 'সলিটেয়ার' (Solitaire) খালি রিইউনিয়ন দ্বীপেই হত। আর প্রায় তাদেরই মত দেখতে কেবল ঠোঁটটা একটু ছোট সেই 'রড্রিগজ্ সলিটেয়ার' (Rodriguez Solitaire) ঐ নামের দ্বীপেই পাওয়া যেত এবং এই জাতের দু একটা হয়ত বা আঠারো শতকের মাঝামাঝি অবধি জীবিত ছিল।

উড়ান-হীন গ্রেট আউক-এরও (Great Auk) ডোডোর মত একই দশা হয়েছিল। ডোডোর মত সে-ও ছিল একটি খুব প্রাচীন পাখি। দক্ষিণ ইতালিতে পাওয়া জীবাশ্ম থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গ্রেট আউকরা প্রায় ৬০,০০০ বছর আগে বেঁচে ছিল। তারা আগাগোড়া উত্তর আতলান্তিক মহাসাগরের উপকূলে পাথুরে দ্বীপগুলিতে, একেবারে স্ক্যানডিনেভিয়া, স্পেন, গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকার পূর্ব পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক ছিল। বন্দুকধারী ইউরোপীয় নাবিকদের আগমনে তাদের অস্তিম লগ্ন এগিয়ে আসে কারণ ডোডোদের মত তারাও সুখাদ্য ছিল আর খুব সহজেই হত্যা করা যেত। গ্রেট আউকদের বিষয়ে ১৬৮৪ সালে প্রথম যে লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল—তারা রাজহাঁসের চেয়ে বড় আর তাদের ডিম অস্ট্রিচের ডিমের মত বিরাট। শেষ জোড়াটিকে মারা হয় ১৮৪৪ সালে আইসল্যান্ডের উপকূলে আর শেষ জীবিত পাখিটিকে দেখা যায় ১৮৫২ সালে নিউফাউন্ডল্যান্ডের তীরে।

অন্য কোন মহাদেশের চেয়ে বিগত দুশো বছরে উত্তর আমেরিকাতে বেশি প্রজাতির পাখি ধ্বংস হয়েছে। কেবল যে শিকার করে মেরে ফেলা হয় পাখিদের তা

*গ্রেট আউক পাখি*

নয়, তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান নষ্ট করে ফেলার দরুণও বহু প্রজাতি অবলুপ্ত হয়ে যায়। ট্রেনে যেতে যেতে একদা প্রচুর মাছরাঙা পাখি দেখা যেত। সে অনুপাতে এখন অনেক কম সংখ্যক দেখা যায়। গাছে গাছে বাবুই-এর বাসাও আর আগের মত ঝুলতে দেখা যায় না।

কলকাতার রাস্তায় এক সময়ে ছোট ছোট পাখি মাথা নিচু করে সুতোয় ঝুলিয়ে বিক্রি করতে দেখা যেত। ওরা প্রধানত তিতির বা বটের জাতীয় পাখি। ওদের মাংস খেতে খুব ভালো। এ রকমই আর এক ছোট পাখি স্নাইপ (Snipe) ইংরেজদের বিশেষ প্রিয় ছিল। পশু পাখি সংরক্ষণের জন্যে নানারকম আইন-কানুন পাশ করা হয়েছে। তবুও মানুষের অবিবেচনায়, লোভে, হিংস্রতায় প্রতিনিয়তই প্রাণীজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দ্বীপবাসী পাখীরা সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছে। নিউজিল্যান্ড, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারত মহাসাগরের বুকে দ্বীপগুলিতে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা লুপ্ত হয়ে গেছে। আর কোন মতেই তাদের ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে এখনও যারা বিপন্ন প্রজাতি হয়ে দু-চারটে বেঁচে আছে, তাদের বিশদ তালিকা করে, রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট হতে পারি আমরা।

পৃথিবীর অনেক দ্বীপেই বাইরে থেকে জন্তু-জানোয়ার নিয়ে গিয়ে ছাড়া হয়েছে মানুষের বিশেষ কোন সুবিধা চরিতার্থ করতে। পরে সেই সব আমদানি করা জন্তুরা যেমন, বেজি, বেড়াল, ইঁদুর, প্রভৃতি সেই দ্বীপের নিরীহ পাখিদের সব মেরে, খেয়ে ধ্বংস করে ফেলেছে। এ্যাসেনসন আইল্যাণ্ড, প্রশান্ত সাগরীয় এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপ সমূহে (Ascension Island, Pacific and Caribbean Islands) এ রকম হতে দেখা গেছে। বেশ কয়েক বছর আগে পারস্য উপসাগরের একটি তেলের জাহাজ ফুটো হয়ে গেলে সমুদ্রের জল তেলে দূষিত হয়ে উঠলে, ঐখানকার বহু সামুদ্রিক পাখি মারা পড়ে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে মোবাইলের শব্দ তরঙ্গে গাইয়ে পাখিদের একটানা গান গাওয়াও ব্যাহত হচ্ছে। তবে মোবাইল কোন পাখির মৃত্যুর কারণ হয়নি।

এ ছাড়া কীটনাশকের ভয়াবহ ভূমিকা তো আজকের দিনে কারুর আর অজানা নেই। কত শত প্রাণী, মাছ, পাখি, পতঙ্গ, এমন কী মানুষ নিজেও এই সব তীব্র বিষের শিকার হচ্ছে। এজনেই ডি.ডি.টি-র ব্যবহার বারণ হয়ে গেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও আমাদের এখানে তা বেআইনীভাবে বিক্রিও হয় ব্যবহারও হয় কারণ এই কীটনাশক অত্যন্ত সস্তা।

ইদানীং ভারতে শকুনও বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

স্বার্থান্বেষী, অর্থলোভী ব্যবসায়ীরাও বহু পশু-পাখি মেরে ফেলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে। নির্বিচারে গাছপালা কেটে মানুষের বাসস্থান তৈরীর ফলে পাখিদের বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

তবে ভরসার কথা এই যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন -- আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা (The International Union for the Conservation of Nature) এবং আন্তর্জাতিক পক্ষী সংরক্ষণ কাউন্সিল (The International Council for Bird Preservation) প্রাণীজগৎ রক্ষার জন্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। আরও একটি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড (World Wildlife Fund) বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষ যদি স্মরণ রাখে যে পৃথিবীতে সে একাই বেঁচে থাকার অধিকারী নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীদের অস্তিত্বও প্রয়োজনীয় তাহলেই অনবরত প্রাণীজগতের তথা প্রকৃতির ধ্বংস রোধ করা সম্ভব। মানুষ মহাকাশ অভিযানে বা পরমাণু পরীক্ষা নিরীক্ষায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার এক ভগ্নাংশ যদি পশু পাখি সংরক্ষণের জন্যে খরচ করত তাহলে কত প্রজাতিই না ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত, আর কত প্রজাতি হয়ত বিপন্ন হতই না।

---

বইমেলায় 'সন্দেশ'স্টলে সন্দেশীরা

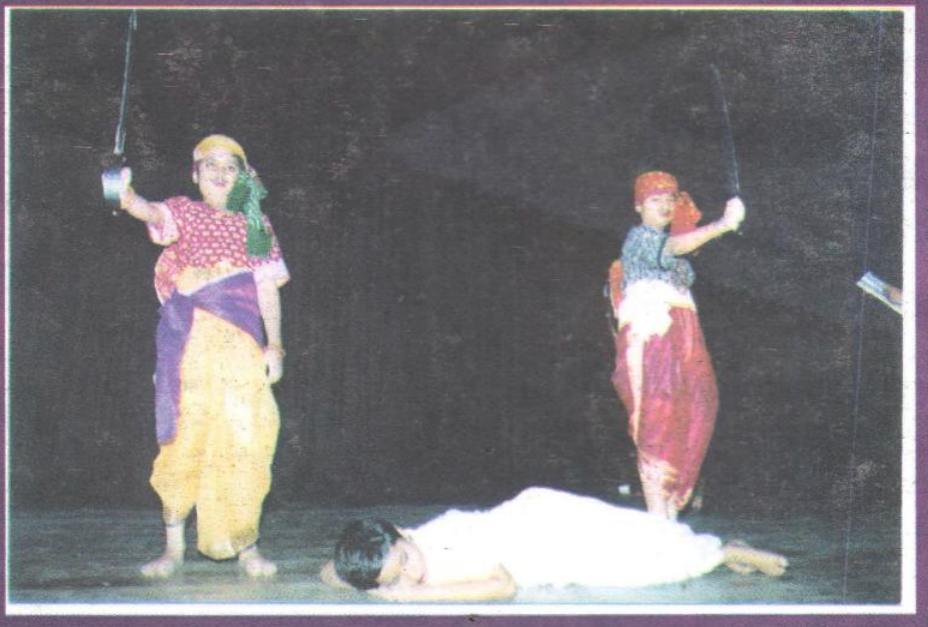

সন্দেশীদের নাটক

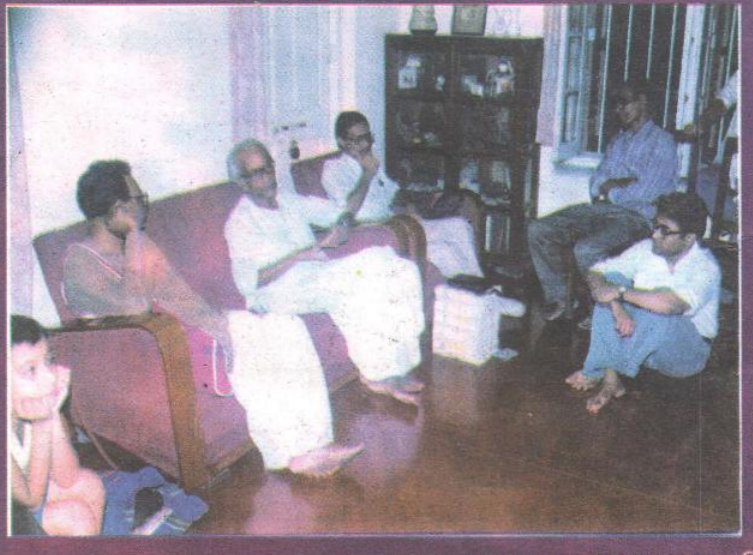

গুণীজনদের সান্নিধ্যে সন্দেশীরা